অনিঃশেষ
আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো
[৩]

অনিঃশেষ আলো ◊ ৩

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো

[৩]

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭২১১২২৫৬৪
e-mail: boighorbd@gmail.com; web: boighorbd.com

অনিঃশেষ আলো-৩
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রকাশক
এস এম আমিনুল ইসলাম
ব ই ঘ র

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৬

প্রচ্ছদ
শাকীর এহসানুল্লাহ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : জে এম প্রিন্টার্স
২২ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91933-5-7

ANISSHESH ALO : By Enayetullah Altamash
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** February 2016 © by the publisher

Price : 220 Taka only

ইসলামের মশাল হাতে আরব থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণযুগের মুসলমানরা। কুফরের আঁধার চিরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বাঁকে-বাঁকে। রোমের কায়সার, ইরানের কেসরা! সেকালের দুই পরাশক্তি। তাদের পানে চোখ তুলে তাকায় এমন সাধ্য নেই কোনো রাজা-বাদশার। আরবের 'বদ্দু'রা তো গণনার বাইরে। কিন্তু 'আরবের বদ্দু' মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন কেসরার দম্ভ। জয় করে নিলেন ইরানের মাটি ও মানুষের মন। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলো রোমের দাম্ভিক রাজা হেরাক্‌ল। জয় হলো ফিলিস্তিন ও শাম।

ইতিহাস বিস্ময়ে হতবাক! আট-দশ হাজার মুজাহিদ। একের পর এক দুর্গ-নগরী জয় করে চলল। পরাজিত হলো মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হেরাক্লিয়াসের লক্ষাধিক সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী। পরবর্তী যুদ্ধে তাঁরা নিজেদের প্রমাণ করেন আরও সাহসী, শক্তিশালী, দুর্দান্তরূপে। জয় হলো সমগ্র মিশর। ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আলো আর আলো, যেন শেষ নেই এই আলোর। কী করে সম্ভব হলো তা? ইতিহাসে কী উত্তর লেখা আছে এ প্রশ্নের? উপন্যাসের আদলে সেই ইতিহাসেরই সবিস্তার বিবরণ *অনিঃশেষ আলো।*

অনিঃশেষ আলো

এক

মদিনা থেকে সহযোগী বাহিনী এখনও আসেনি। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) দূতমারফত আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে যুদ্ধের অবস্থা এবং পরিবর্তিত প্রতিটি পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করতে থাকেন। তাঁর বেশ কজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দ্রুতগামী কঠিনপ্রাণ দূত ছিল।

মানচিত্রে মিশর ও মদিনার দূরত্ব দেখুন। অনেক পথ। সেযুগে ঘোড়ার পিঠে বসে এই দূরত্ব এক মাসে পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল, নাকি আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হতো নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু একজন দ্রুতগামী দূত অল্প কদিনেই এই পথ অতিক্রম করে ফেলত। এই পথ অতিক্রম করতে হতো সেসব অঞ্চল দিয়ে, যেগুলো ইসলামের সৈনিকরা সালতানাতে ইসলামিয়ায় যুক্ত করে নিয়েছিলেন। দূতরা সড়ক পথে লোহিত সাগরের কিনারে-কিনারে মদিনায় আসা-যাওয়া করছিল। পুরো পথে চৌকি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলোতে অতিশয় তাজাদম ঘোড়া প্রস্তুত থাকত। দূতরা ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে চৌকিতে রেখে নতুন ঘোড়া নিয়ে সফর অব্যাহত রাখত। কোথাও-কোথাও পানাহার বা একটুখানি জিরোনোর জন্য বিরতি নিত। কিন্তু কি দিন, কি রাত; তারা ঘোড়ার পিঠে বসে একনাগাড়ে পথ চলত। এভাবে সংবাদ ও বার্তা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাপনাকে সত্যিকার অর্থেই বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

* * *

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর দূত দিনকতক পর-পরই মদিনা পৌঁছে যেত এবং আমীরুল মুমিনীনকে মিশরের সর্বশেষ পরিস্থিতির সংবাদ পৌঁছাত। ইতিহাস বলছে, আমর ইবনে আস (রাযি.) প্রতিটি বার্তায়-ই জরুরি সাহায্যের কথা লিখতেন। কিন্তু কখনও কোনো বার্তায়-ই তিনি লিখেননি, যদি সাহায্য না পাই, তাহলে আমি অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে বাধ্য হব এবং এই সামরিক অভিযান থমকে যাবে। তাঁর প্রতিটি বার্তা-ই উৎসাহব্যঞ্জক হতো, যেন তাঁর কোনো প্রকার সমস্যা বা কোনো ধরনের হতাশা নেই।

কিন্তু তার অর্থ কখনোই এ নয় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) এ ধরনের আশাজাগানিয়া বার্তা দেখে জরুরি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করতেন না। তাঁর বেশিরভাগ মনোযোগ মিশরেরই উপর নিবদ্ধ ছিল। কারণ, আমর ইবনে আস (রাযি.) খুবই অল্প কজন সৈনিক নিয়ে এমন এক পরিস্থিতিতে মিশর-অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছেন, যখন আমীরুল মুমিনীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টাগণ এই অভিযানের বিরোধী। স্বয়ং তাঁরও মন এই অভিযানে সায় দিচ্ছিল না, যার ফলে আমর ইবনে আসকে এই অভিযানের অনুমতি দিতে তাঁকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল। তিনি নিশ্চয় ভেবে থাকবেন, মিশর-অভিযান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে সঙ্গী-সহচর ও উপদেষ্টাদের সামনে তাঁকে লজ্জিত হতে হবে। সবাই বলবে, নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি একটি বাহিনীকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

ইতিহাস বলছে, মিশর-অভিযানের সবচেয়ে ঘোর বিরোধী ছিলেন প্রবীণ ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবি হযরত ওছমান (রাযি.)। এই বিরোধিতায় তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গে মনকষাকষিতে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই তিনিই হযরত ওমর (রাযি.)কে চাপ দিচ্ছেন, মিশরে জরুরি সাহায্য পাঠানো হোক। কিন্তু তারপরও কী কারণ ছিল যে, সাহায্য পাঠাতে বিলম্ব হচ্ছিল? ঐতিহাসিকরা এ প্রশ্নের উত্তরে অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়েছেন এবং জবাবটা খুঁজে বের করতে অনেক চেষ্টা চালিয়েছেন। এভাবে কয়েকটা কারণ সামনে এসে ধরা দিয়েছে।

একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, সেকালের উপদেষ্টামণ্ডলি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ– পরামর্শের প্রয়োজন হলে হযরত ওমর (রাযি.) যাঁদের শরণাপন্ন হতেন– আমাদের এযুগের রাজনৈতির লিডারদের মতো ছিলেন না। তাঁদের কাছে আপন ব্যক্তিসত্তার কোনোই গুরুত্ব ছিল না। তাঁরা কথা বলতেন, কাজ করতেন ধর্ম ও জাতির লাভ-ক্ষতি সামনে রেখে। এমনটা কখনোই হতো না যে, তারা আমীরুল মুমিনীনের ভাবগতি জেনে নিতেন আর পরে তাঁর হাঁ-এ হাঁ মিলিয়ে দিতেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদের বিরোধিতাকে যথার্থ প্রমাণিত করতে দীন ও সালতানাতে ইসলামিয়ার স্বার্থপরিপন্থী অবস্থানে অনড় থাকতেন এমনটাও কখনও হতো না। তাঁরা নিজেদের রাষ্ট্রপ্রধানের অনুগত নয়– মহান আল্লাহর অনুগত মনে করতেন। প্রথমে হযরত ওছমান (রাযি.) সাহায্য পাঠানোর উপর জোর দিলেন। তারপর অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীরাও বলতে শুরু করলেন, আমর ইবনে আসকে এভাবে একা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। সবাই জানতেন, আমর ইবনে আস (রাযি.) খালিদ ইবনে অলীদ (রাযি.)-এর মতো ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার মতো সেনানায়ক। কাজেই এমন না হয় যে, তিনি গোটা বাহিনীর জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেন।

অবশেষে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) একদিন ফজর নামাযের সালাম ফিরিয়ে ঘোষণা দিলেন, সবাই বসুন; জরুরি কথা আছে। তিনি মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠানোর আলোচনা উত্থাপন করলেন। হযরত ওমর খুবই ক্রিয়াশীল ভঙ্গিতে এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কথা বলতেন। তিনি বললেন না, আজ বিরুদ্ধবাদীরাও সাহায্য পাঠানোর উপর জোর দিচ্ছে। শুধু এটুকু বললেন, আল্লাহ ভালো নিয়তের প্রতিদান খুবই ভালো দিয়ে থাকেন। তারপর তিনি মিশরে সাহায্য পাঠাতে বিলম্ব হওয়ার কয়েকটি কারণ বর্ণনা করলেন। এক হলো, ইরাক থেকে ইরানের কেসরাকে উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু তার অবস্থা সেই সিংহের মতো, যে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে আছে; কিন্তু এখনও মরেনি। আশঙ্কা ছিল, আহত সিংহ শেষবারের মতো অবশ্যই আক্রমণ চালাবে। এই ভয়ে ইরাকের রণাঙ্গন থেকে কোনো মুজাহিদ বের করে আনা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, গোটা শাম সালতানাতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে চলে এসেছে। কিন্তু মহামারি আমাদের বাহিনীর অর্ধেক সৈনিককে হজম করে ফেলেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেনানায়ককে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগসৃষ্ট এই অভাব পূরণ করা একান্ত আবশ্যক ছিল।

তারপর হযরত ওমর আরও একটি কারণ বর্ণনা করলেন। বললেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমর ইবনে আস আরিশ নগরী জয় করে ফেলেছেন। এখন সামনে অগ্রসর হলে বড়জোর ফরমা পর্যন্ত যাবেন। তারপর ওখানে সাহায্যের অপেক্ষা করে সামনের দিকে এগুবেন।

আমর ইবনে আস হযরত ওমরকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, বেদুইনদের একটা বাহিনী আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে, যার দ্বারা আমাদের রসদসমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন এই বাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধেও অংশ নেবে। এই সংবাদে হযরত ওমর আশ্বস্ত হয়েছিলেন, যাহোক জরুরি সাহায্যের প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে। সেদিন তিনি ও অন্য সবাই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করেন! কারও মনে এ আশা ছিলই না যে, বেদুইনরা এসে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে আর রসদ ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারপর ফরমাজয়ের সংবাদ এল। আমীরুল মুমিনীন বললেন, আমর ইবনে আস মদিনার সাহায্য ছাড়া আর সামনে এগুবেন না।

মসজিদে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেকে কিছু পরামর্শ দিলেন। বিষয়টি নিয়ে খানিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় চলল। অবশেষে সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

* * *

অল্প কদিন পরই ফরমা থেকে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর আরেকটি বার্তা এসে পৌঁছল। বিগত বার্তাগুলোতে তিনি শুধু বিজয়ের সংক্ষিপ্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। এবার তিনি বিস্তারিত লিখে পাঠালেন। এই বার্তায় তিনি নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ জানালেন। নিজেরা কতজন প্রাণ হারালেন, কতজন আহত হলেন, বেদুইন খ্রিস্টানরা কতজন মারা গেল সবই লিখলেন। ফরমার বিজয় বেশ কিছু জীবনের কুরবানি গ্রহণ করেছে। বেদুইনরা বেশি মারা গেছে এজন্য যে, একটি সুসংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। আমর ইবনে আস লিখলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি সহযোগী বাহিনী পেয়ে গেছি বটে; কিন্তু বেদুইনদের এই বাহিনীর সংখ্যা এত কমে গেছে যে, নতুন বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা প্রকটরূপে দেখা দিয়েছে। তিনি এও লিখলেন যে, আগামী কাল সকালে আমি বিলবিস অভিমুখে রওনা হচ্ছি।

এই সংবাদ আমীরুল মুমিনীনকে অস্থির করে তুলল। এত ক্ষুদ্র একটা বাহিনী দ্বারা বিলবিস অবরোধ করা কতখনি ঝুঁকিপূর্ণ তা তাঁর জানা ছিল। আমর ইবনে আস এত তড়িঘড়ি অগ্রযাত্রার যৌক্তিক কারণও উল্লেখ করেছেন। তা হলো, তিনি রোমানদের আত্মসংবরণ করার, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ দিতে রাজী নন এবং তাদের বুঝতে দিতে চাচ্ছেন না, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে।

হযরত ওমর (রাযি.) এই যুক্তি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন, রোমানদের কৌশল হলো, মুসলমানরা মিশরের আরও ভেতরে ঢুকে যাক। তখন আমরা তাদের ঘিরে ফেলব এবং পেছন থেকে রসদ ও সহযোগী বাহিনীর পথ বন্ধ করে দেব। কিন্তু দুশমনের কৌশল জেনে ফেলা-ই যথেষ্ট নয়–কৌশল ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যও নতুন চাল চালতে হয়। আমর ইবনে আস (রাযি.) দুশমনের চাল ও মনোভাব বুঝেই রওনা হচ্ছিলেন এবং যত কম সময়ে সম্ভব বিলবিস পৌঁছে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ছিল, তাঁর সঙ্গে যেকজন মুজাহিদ ছিলেন, তাঁরা কি বিলবিস জয় করার জন্য যথেষ্ট ছিলেন? ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আমর ইবনে আস-এর সঙ্গে যে-বাহিনীটি ছিল, তার সংখ্যা রোমানদের তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক সংখ্যাটা চার হাজার লিখেছেন। কেউ এর কিছু কম, কেউবা কিছু বেশি লিখেছেন। কিন্তু যে যা-ই লিখুন; বেদুইনদেরসহ বাহিনীটির মোট সংখ্যা পাঁচ হাজার কয়েকশোর বেশি ছিল না।

যোদ্ধাদের নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর মর্যাদা হযরত ওমর (রাযি.)-ই দিয়েছিলেন। তিনি-ই সৈনিকদের জন্য মাসিক বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি চালু করেছিলেন।

কিন্তু মিশরে সামরিক অভিযানের সময় পর্যন্ত এই বিপ্লব সাধিত হয়নি। তখনও মানুষ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাহিনীতে যোগ দিত। এবার যখন হযরত ওমর (রাযি.) তীব্রভাবে অনুভব করলেন, আমর ইবনে আস-এর জন্য সাহায্য পাঠাতেই হবে, তখন বাহিনী গঠনের জন্য তিনি সেই পন্থাটি-ই অবলম্বন করলেন, যেটি তখনও পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তিনি মসজিদে ঘোষণা দিলেন, মিশরের জন্য কমপক্ষে চার হাজার সৈন্য পাঠাতে হবে। যারা যেতে রাজী; সামনে চলে আসুন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল হাকাম অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, হযরত ওমর (রাযি.)-এর দৃষ্টি আগে থেকেই একজন সাহাবির উপর নিবদ্ধ ছিল, যাঁর নাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম। অনেক বড় যুদ্ধাভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত ভাই ছিলেন। ষোলো বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেছিলেন। হাবশার উভয় হিজরতে শামিল ছিলেন। মদিনা হিজরতের সময়ও তিনি নবীজির সঙ্গে ছিলেন। একটি মর্যাদা হযরত যুবাইর (রাযি.)-এরই অর্জিত হয়েছিল যে, প্রতিটি যুদ্ধে তিনি নবীজির সঙ্গে ছিলেন এবং জীবনের বাজি লাগিয়ে লড়াই করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধে প্রয়োজন দেখা দিল, খ্রিস্টানদের দুটা গোত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তারা কুরাইশের সঙ্গ দিচ্ছে কিনা। যদি দিয়ে থাকে, তাহলে তাদের সংখ্যা কত এবং কবে নাগাদ তারা রওনা হবে। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল, যার জন্য হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম নিজেকে পেশ করেছিলেন এবং শত্রুর মাঝে ঢুকে গিয়ে সঠিক খবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তারপর আরেকটি ক্ষেত্রেও নবীজি গোয়েন্দাগিরির আবশ্যকতা অনুভব করলেন এবং একজন স্বেচ্ছাসেবীর অনুসন্ধান করতে হলো। এটিও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। এর জন্যও যুবাইর ইবনুল আওয়াম নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর অঞ্চলে গিয়ে যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

ইতিহাসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– 'প্রত্যেক নবীর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর থাকে। আমার ঘনিষ্ঠ সহচর হলো যুবাইর ইবনুল আওয়াম।'

মক্কাজয়ের দিন মুজাহিদ বাহিনীতে তিনটি পতাকা ছিল, যার একটি ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর হাতে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ও আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন ও মূল্যায়ন করতেন। তাঁর মাঝে এমন কিছু গুণ ছিল যে, যার সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হতো, সে-ই তাঁর ভক্ত হয়ে

যেত। যে-বাহিনীর নেতৃত্ব তাঁর হাতে দেওয়া হতো, সেই বাহিনী তাঁর ইশারায় জীবন কুরবান করে দিত।

এক বর্ণনায় আছে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর দৃষ্টি তাঁর উপর ছিল। কিন্তু অপর এক বর্ণনায় একথাও আছে যে, আমর ইবনে আস (রাযি.) যে-সময় মিশর প্রবেশ করেছিলেন, তখনই যুবাইর (রাযি.) একাধিকবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে মিশরে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর বাহিনীতে পাঠানো হোক। ইতিহাসে একথা লেখা নেই যে, তাঁকে কেন পাঠানো হয়নি। ধারণা করা যেতে পারে, আমীরুল মুমিনীন তাঁকে রিজার্ভ রেখে থাকবেন যে, যদি পরিস্থিতি বেশি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে পাঠানো হবে।

যাহোক, হযরত ওমর (রাযি.) যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে ডেকে পাঠলেন।

'আবু আবদুল্লাহ!'– হযরত ওমর (রাযি.) তাঁকে আরেক নামে সম্বোধন করলেন– 'তুমি কি মিশরের নেতৃত্বের প্রত্যাশী?'

'না আমীরুল মুমিনীন!'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম উত্তর দিলেন– 'নেতৃত্বের না প্রয়োজন আছে, না প্রত্যাশা আছে। আপনি যদি আমাকে কোনো রণাঙ্গনে পাঠাতে চান, তাহলে আমি জিহাদ ও মুজাহিদীনে ইসলামের সাহায্যের জন্য যাব– কোনো লোভ নিয়ে নয়। আমি জানি, আপনি আমাকে মিশর পাঠাতে চাচ্ছেন। শুনেছি, মিশরের জন্য সহযোগী বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে। আমি যাব। যখন দেখব, আমর ইবনে আস মিশর জয় করে ফেলেছেন, তখন তাঁর কোনো কাজে আমি হস্তক্ষেপ করব না এবং তাঁকে নেতৃত্বের আসনে দেখে আমি প্রীত হব।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে দায়িত্ব দিলেন, তুমি মিশরের জন্য সহযোগী বাহিনী প্রস্তুত করো। যুবাইর (রাযি.) আগে থেকেই ব্যাকুল ছিলেন, যেন তাঁকে জিহাদের কোনো জিম্মাদারি অর্পণ করা হয়। তিনি সেদিনই কাজ শুরু করে দিলেন। এটি এক বা দুদিনে সম্পন্ন হওয়ার মতো কাজ ছিল না। কিন্তু যুবাইর (রাযি.) উঠে-পড়ে লেগে গেলেন এবং রাত-দিন এক করে ফেললেন। বাহিনীটি গঠন করতে তাঁর কদিন সময় লেগেছিল তা বলা মুশকিল। তবে এটি নিশ্চিত যে, তিনি যে-বাহিনীটি গঠন করেছিলেন, তার সংখ্যা ছিল চার হাজার।

বাহিনীটি হযরত ওমর (রাযি.)-এর সামনে পেশ করা হলো। হযরত ওমর চার হাজার লোকের একজন-একজন মুজাহিদকে দেখলেন। তারপর তাকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা-আলাদা সেনাপতি নিযুক্ত

করে দিলেন। প্রতিজন সেনাপতির অধীনে এক হাজার করে মুজাহিদ। তাঁদের একজন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.), একজন উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.), একজন হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ সুলামি এবং অপরজন হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা (রাযি.)। এই চারজনের সেনাপতিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর উপর।

মদিনার এই সহযোগী বাহিনীর সংখ্যার ব্যাপারে ইতিহাসে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়ে গেছে। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, সংখ্যাটা ছিল বারো হাজার। নির্ভরযোগ্য ও সতর্ক ইতিহাসবিদগণ– যাদের মাঝে বাটলারও একজন– সঠিক তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই ভুল বোঝাবুঝির রহস্য বর্ণনা করেছেন।

সমস্যাটা তৈরি হয়েছে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এ কয়েকটা শব্দ থেকে। সহযোগী বাহিনীর সঙ্গে তিনি লিখিত যে-বার্তাটি আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

'তোমার জন্য আমি চার হাজার মুজাহিদ পাঠিয়েছি। প্রতি এক হাজার মুজাদিদের জন্য একজন করে সালার নিযুক্ত করে দিয়েছি। এরা সবাই সুদক্ষ সৈনিক ও সুনিপুণ সেনানায়ক। আর চেতনায় এতই সমৃদ্ধ যে, মনে করো, এক-একজন এক-এক হাজার মুজাহিদের সমান। তুমি ধরে নিতে পার, আমি তোমার জন্য বারো হাজার নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ পাঠিয়েছি। আমার শতভাগ আশা আছে, শত্রুর সংখ্যা যতই বেশি হোক বারো হাজার জানবাজ মুজাহিদ পরাজিত হতে পারে না।'

এই লেখা থেকেই কিছু-কিছু ঐতিহাসিক বুঝে বসেছেন, মিশরের জন্য মদিনা থেকে প্রেরিত সহযোগী বাহিনীটির সংখ্যা বারো হাজার ছিল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যাটা ছিল চার হাজার। এই বাহিনী কতদিনে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল ইতিহাসে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। একজন দ্রুতগামী দূত যে-গতিতে পথ অতিক্রম করতে পারে, একটি বাহিনীর পক্ষে সেই গতিতে পথ চলা সম্ভব নয়।

ফজর নামাযের পর এই বাহিনী মদিনা থেকে রওনা হলে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর, হযরত ওছমান ইবনে আফফান, হযরত আলী ও প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয় সাহাবা তার সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর একজায়গায় দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের আল-বিদা জানিয়েছিলেন। সবাই হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। মহিলারা মদিনার প্রাচীরের উপর উঠে বাহিনীকে বিদায় জানাল এবং সাফল্যের জন্য দু'আ করল।

* * *

অবশেষে একদিন সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) সহযোগী বাহিনীর অপেক্ষা বাদ দিয়েই বাহিনীকে বিলবিস-অভিমুখে অগ্রযাত্রার আদেশ দিয়ে দিলেন। বাহিনী ফজর নামাযের পর রওনা হলো। দিনটি ছিল ৬৪০ খ্রিস্টসনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ।

তার আগের দিন আমর ইবনে আস মদিনায় আমীরুল মুমিনীনের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি তাঁর বিলবিস-অভিমুখে অগ্রযাত্রার সংবাদ ও অন্যান্য খবরাখবর লিখে শেষে লিখেছেন, মদিনার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এখন আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) একদিন আগে বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। এর আগেও তিনি একবার বক্তৃতা করেছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন ইসলাম ও ইসলামি সালতানাতের জন্য মিশর কতখনি গুরুপূর্ণ। মিশরকে তিনি নবী-রাসূলগণের ভূখণ্ড আখ্যায়িত করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা যেপথে মিশর জয় করতে যাচ্ছি, এটি পয়গম্বরদের পথ। এপথে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং পরে হযরত ইসমাঈল (আ.) গমন করেছিলেন। এপথে হযরত ঈসা ও হযরত মূসা (আ.)-এরও পদধূলি পড়েছিল। আমর ইবনে আস (রাযি.) এবার যে-ভাষণটি দিলেন, তাতে বললেন, এখন আমরা বিলবিস নামক যে-নগরীটা জয় করতে যাচ্ছি, সেটা ফরমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান এবং রোমানরা তাকে রক্ষা করতে নিঃশঙ্কচিত্তে জীবনের বাজি লাগাবে। কিন্তু আল্লাহর আদেশ হলো, যেকোনো মূল্যে আমরা একে পদানত করব।

আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীকে আবেগময় শব্দাবলি দ্বারা উত্তেজিত করেননি এবং তাদের সবুজ বাগানও দেখাননি। না এমন কোনো ধারণা দিয়েছেন যে, রোমানরা বিলবিসকে থালায় রেখে তোমাদের সামনে পরিবেশন করে দেবে। তিনি বাস্তবতা তুলে ধরেছেন এবং এই অভিযানে যতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, সবিস্তারে তার বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি বললেন, সংখ্যায় আমরা অনেক কম আর শত্রুর সামরিক শক্তি আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। আরও বললেন, আরিশ-ফরমা জয় করা আমাদের পক্ষে এজন্য সহজ হয়েছিল যে, রোমানরা আমাদের ধোঁকা দিয়ে আরও ভেতরে ঢোকাতে চেয়েছে। আমরা অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছি এবং এখন আরও সামনের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছি। ধরে নাও, বিলবিস আমাদের জন্য একটা ফাঁদ, রোমানরা যেখানে ফাঁসিয়ে আমাদের চিরতরে বেকার করে দিতে চাচ্ছে।

'ভুলে যেয়ো না, তোমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে'– 'সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'তোমরা আল্লাহর আদেশে আল্লাহর পথে যাচ্ছ। এটি আমাদের ঈমান। অপরদিকে আমাদের শত্রুরা আমাদের পরাজিত করে প্রমাণ করতে চাচ্ছে, আমাদের ঈমান ভুল এবং এটি কোনো মানুষের মনগড়া। কাফেরদের কাছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আমরা আল্লাহর দীনের অনুসারী এবং সেই দীন নিয়েই আমরা এখানে এসেছি। আল্লাহ আদেশ করেছেন, এই দীনকে যেন আমরা আল্লাহর প্রতিজন বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দেই। এটি আমাদের জন্য একটি ফরজ আমল। এই কর্তব্য পালনের জন্য আমাদেরকে সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করতে হবে। পাহাড়ের কলিজা ছিন্ন করতে হবে। দুর্গম বন-বিয়াবানকে পদতলে পিষ্ট করতে হবে।'

তারপর আমর ইবনে আস (রাযি.) সকল বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং জরুরি নির্দেশনা দিলেন। বাহিনীকে তাদের বণ্টন ও বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা দিলেন এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন এই বণ্টন-বিন্যাস কেন করা হলো।

অগ্রযাত্রার সময় বাহিনীর বণ্টন ও বিন্যাস ছিল এই–

সবার আগে অগ্রগামী ইউনিট। এই ইউনিটের সম্মুখে কয়েকজন মুজাহিদ স্থানীয় কৃষাণ ও দিনমজুরের বেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। এরা গোয়েন্দা ও তথ্যানুসন্ধানী। কয়েকটা ইউনিট অগ্রগামী বাহিনী থেকে দূরে পিছনে অবস্থান করছে। তাদের ডানে-বাঁয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে এক-একটা ইউনিট পথ চলছে এবং এক-দুটা ইউনিট পিছনে আসছে। মোটকথা, বাহিনী সশস্ত্র কাফেলার আদলে যাচ্ছে না।

এই বিন্যাসের তাৎপর্য কী?

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর ভালো করেই জানা ছিল, রোমান সেনাপতি তাঁকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে, যেখানে সে অগ্রযাত্রাকালে যেকোনো সময় বাহিনীর উপর ডান ও বাম কিংবা পেছন থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য দ্বারা আক্রমণ চালাতে পারে। গোয়েন্দারা তাকে আগেই অবহিত করে রেখেছিল, রোমানরা মুজাহিদদের প্রথমে সামনে টেনে এনে এবং পরে ঘেরাওয়ে নিয়ে কাবু করতে চাচ্ছে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) গতানুগতিক যুদ্ধ লড়ানোর মতো সেনাপতি ছিলেন না। তিনি দুশমনের চালাকি বুঝতেন এবং তাদের কৌশল ব্যর্থ করার বুদ্ধি

জানতেন। তিনি গুপ্তচরবৃত্তির এমন কার্যকর পন্থা তৈরি করে নিয়েছিলেন, যেন তাঁর গোয়েন্দারা দুশমনের পেটে ঢুকে সংবাদ বের করে নিয়ে আসত।

ফরমা থেকে বিলবিসের দূরত্ব যেমন দীর্ঘ, তেমনি দুর্গমও। দুর্গম এজন্য যে, এ অঞ্চলে এসে নীলনদ কয়েকটা শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। কোনো-কোনো শাখা তেমন চওড়া ছিল না এবং সাধারণ খালের মতোই ছিল। কিন্তু কোনো-কোনোটা ছিল নদীর মতো। পানির আধিক্যের কারণে অঞ্চলটায় জলাশয় ছিল এবং গাছগাছালির প্রাচুর্য ছিল। কোনো অঞ্চল পার্বত্য ও অসমতল ছিল। নীলের এই শাখাগুলো পার হওয়াও ছিল বড় একটা সমস্যা। সবচেয়ে বড় ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়টা ছিল, রোমান বাহিনী এই অঞ্চলে তাদের ঘেরাওয়ে নিয়ে নিতে পারত।

ইতিহাসে আছে, পথে বেশ বড়সড় একটা প্রাচীন পল্লি এল, যার নাম ছিল মাজদাল। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর গোয়েন্দারা তাতে প্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করল। কোথাও রোমান বাহিনীর একজন সৈনিকও চোখে পড়ল না। আমর ইবনে আস এই পল্লির কাছে এক জায়গায় ছাউনি ফেললেন এবং পল্লির নেতৃস্থানীয় লোকদের তলব করে এনে নিশ্চিত তথ্য নিলেন রোমান বাহিনীর কোনো সদস্য এই অঞ্চলে আছে কিনা এবং তারা যুদ্ধের ব্যাপারে নগরবাসীদের কোনো নির্দেশনা দিয়েছে কিনা।

জানা গেল, এই পল্লিতে কখনও ফৌজ আসেনি এবং কখনও ফৌজের পক্ষ থেকে তাদের কোনো নির্দেশনা বা আদেশ দেওয়া হয়নি। পল্লির মোড়লরা আমর ইবনে আসকে নিশ্চয়তা দিল, আমরা রোমান ফৌজের সরাসরি বিরোধিতা করতে পারব না বটে; কিন্তু কৌশলে তাদের সহযোগিতা এড়িয়ে যাব অবশ্যই।

আমার ইবনে আস নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, পল্লির কোনো মানুষ পল্লি থেকে বের হতে পারবে না এবং কাউকে বিলবিসের দিকে যেতে দেখা গেলে দূর থেকে আমরা তাকে তিরের নিশানা বানাব। রোমানরা যাতে সময়ের আগে এই অভিযানের খবর না পায়, তার জন্য তিনি এই ব্যবস্থাটা নিলেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) মাজদালের অধিপতিদের আরও বলে দিলেন, তোমরা এলাকার জনগণের মাঝে ঘোষণা করিয়ে দাও, এখানকার মানুষ যেন এখন থেকে এই অঞ্চলকে মুসলমানদের শাসনাধীন মনে করে। তাদের বলে দাও, তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরোপুরি আমরা পালন করব এবং আমাদের বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো নাগরিকের ঘরে প্রবেশ করবে না।

ইতিহাসে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এই অগ্রযাত্রার পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষিত আছে। সেই বিবরণে চোখ বোলালে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর সেই সৈনিকগুলো সঠিক অর্থেই আল্লাহতে নিবেদিত ছিলেন। তাঁরা গুটিকতক লোক বিশাল শক্তিধর শত্রুর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের তরবারির আঘাতে কর্তিত হতে দেখেছেন। কিন্তু তাঁদের মাঝে একজনও এমন ছিলেন না, যাঁর চেহারায় ভয়ের কোনো ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

মাজদাল থেকে আরও কিছু দূরে এলে আরেকটা লোকালয় পাওয়া গেল, যার নাম কানতারা। গুপ্তচররা সবার আগেই এই পল্লিতে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের একজন ফিরে এসে বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটকে জানাল, এই এলাকায় রোমান বাহিনীর কিছু সৈন্য রয়েছে, যারা সংখ্যায় এত কম নয় যে, আমাদের দেখে পালিয়ে যাবে।

অগ্রগামী ইউনিটের সেনাপতি সিপাহসালারকে তথ্যটা অবহিত করে নিজে আপন ইউনিটের সৈনিকদের নিয়ে লোকালয়টা ঘেরাওয়ে নিয়ে নিতে চলে গেলেন।

সংবাদ পেয়ে আমর ইবনে আস মধ্যখানের একটি ইউনিটকে সামনে পাঠিয়ে দিলেন। এটা কোনো দুর্গবন্ধ নগরী নয়।

রোমান বাহিনী লোকালয় থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। মুজাহিদরা তাদের উপর আক্রমণ চালাল। রোমানরা কতিপয় প্রাণ হারাল আর অবশিষ্টরা আত্মরক্ষার নিমিত্ত লোকালয়ে ঢুকে পড়ল। মুজাহিদরা লোকালয়ে প্রবেশ করে খুঁজে-খুঁজে তাদের সবাইকে খতম করে দিল। ইতিহাসে একে সাধারণ সংঘাত আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা একে সাধারণ বলব না। কারণ, আমর ইবনে আস (রাযি.) সহযোগী বাহিনী ব্যতিরেকে ও পর্যন্ত গিয়ে অনেক বড় ঝুঁকি বরণ করে নিয়েছিলেন। বাহিনীর সেনাসংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। আর ধরে নিতে পারেন, তিনি একটা সিংহের চোয়ালের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণ এ কারণেই আমীরুল মুমিনীনকে বোঝাতেন, আমর ইবনে আসকে আপনি মিশর-অভিযানের অনুমতি দিবেন না। কেননা, ইনি নিশ্চিত ধ্বংসেরও ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়ে থাকেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন; বরং তারও সম্মুখে চলে গিয়েছিলেন, যেখান থেকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা ছিলই না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি এমন একজন সিপাহসালার ছিলেন, যিনি ঝুঁকি বরণ করে নিতেন। কিন্তু নিতেন প্রতিটি দিক ভালোমতো ভেবে-চিন্তে, মেপে-জোখে। এই যে এখন তিনি বিলবিসের দিকে অগ্রযাত্রা করছেন, এখনও তাঁর দৃষ্টি শুধু বিলবিসের উপর কিংবা তাঁর ভাবনা বিলবিস অবরোধই নয়। তিনি বরং আরও

অনেকগুলো বিষয় মাথায় রেখে অভিযানটা পরিচালনা করছেন, যার কিছু তাঁর অধীন সালারদের আগেই অবহিত করে রেখেছেন আর বাকিগুলো সময়মতো বলে দিচ্ছেন।

'সামনের তুলনায় দৃষ্টি পিছনের দিকে বেশি রাখতে হবে'– আমর ইবনে আস বিলবিস-অভিযানে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সালারদের বলেছিলেন– 'রোমানরা এত কম-আক্কেল নয় যে, এক নগরীতে অবরুদ্ধ হয়েই লড়তে থাকবে। তারা পেছন থেকে আক্রমণের চেষ্টা চালাবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বিলবিসের বাহিনী আমাদের মোকাবেলা সেভাবে করবে না, যেভাবে ফরমায় করেছিল।'

এমনি আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে আমর ইবনে আস (রাযি.) অগ্রযাত্রার আদেশ দিলেন এবং সেদিন সন্ধ্যায়ই বিলবিস পৌঁছে গেলেন। তারপর রাতারাতি নগরীটা অবরোধ করে ফেললেন। তিনি যখন নগরীর চারধারে অবরোধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন প্রতিজন সালার ও কমান্ডারকে বলে যাচ্ছিলেন, ভুলে যেয়ো না, তোমাদের এবারকার মোকাবেলা হবে রোমের চরম ধূর্ত ও চতুর সেনাপতি আতরাবুনের সঙ্গে।

* * *

আমর ইবনে আস (রাযি.)কে তাঁর গোয়েন্দারা আগেই তথ্য প্রদান করেছিল, আতরাবুন বিলবিসে নেই। ওখানে দুজন সেনাপতি ছিল, যাদের একজন নুশির পিতা, যে কিনা পরাজয় বরণ করে ফরমা থেকে পালিয়ে এসেছিল। আমর ইবনে আস তাঁর সালারদের বলে দিয়েছিলেন, এবার তোমাদের আগের চেয়ে আরও বেশি চৌকস হতে হবে।

সে-সময় মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিস ও সেনাপতি আতরাবুন অন্য কোথাও ছিলেন। কিন্তু কোথায় ছিলেন ইতিহাসে তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এলফার্ড বাটলার লিখেছেন, মুকাওকিস ও আতরাবুন যখন সংবাদ পেলেন, মুসলমানরা বিলবিস অবরোধ করে ফেলেছে, তখন তারা হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন এবং একজন অপরজনের মুখপানে তাকাতে লাগলেন। সে-সময় ঘটনাক্রমে তারা দুজন একসঙ্গে বসে সেই পরিকল্পনাটি নিয়ে কথা বলছিলেন, যেটি তারা মুসলমানদের ঘিরে মারার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, দুজনের কারুরই ধারণা ছিল না, মুসলমানরা এত দ্রুত এমন দুর্গম ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফেলবে।

'আমরা এখনও প্রস্তুত নই'– মুকাওকিস বললেন– 'আমাদেরকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে আমরা সময় পেয়ে যাই এবং মুসলমানদের বিলবিসের বাইরেই ব্যস্ত রাখতে পারি।'

'আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত'– আতরাবুন বলল– 'এখন আর আমরা এই ঝুঁকি বরণ করে নিতে পারি না যে, মুসলমানরা বিলবিসও দখল করে নেবে। আমি তাদের আর সময় দিতে রাজী নই।'

'আরিশ ও ফরমার পর আমি তাদের বিলবিস কোনো মূল্যেই নিতে দেব না'– মুকাওকিস বললেন– 'কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে বুঝবে, আরও কিছু সময় আমাদের নিতেই হবে।'

ইতিহাস বলছে, দুজনে আলাপ-আলোচনা যা হয়েছিল, তাতে দুজনের মতপার্থক্যই প্রকটরূপে ফুটে উঠেছিল এবং দুজনের একজনও হার মানতে রাজী ছিলেন না। মুকাওকিস পদমর্যাদায় বড় ছিলেন। তিনি মিশরের শাসনকর্তা আর আতরাবুন একজন সেনাপতি। ফলে শেষ পর্যন্ত মুকাওকিসের কথা-ই মেনে নিতে হলো। তিনি পরিকল্পনা দিলেন, পাদরিদের একটি প্রতিনিধিদল মুসলমানদের সিপাহসালারের কাছে পাঠানো হবে। তারা প্রস্তাব দেবে, মুসলমানরা মিশর থেকে বেরিয়ে যাক এবং বলুক, এর জন্য আমাদেরকে তাদের কী-কী শর্ত মানতে হবে।

আতরাবুন বলল, যদি শর্ত দেন, তিনি মিশরের যেটুকু অঞ্চল জয় করে নিয়েছেন, সেটুকু তাদের কর্তৃত্বে থাকবে; কিন্তু তার সম্মুখে আর অগ্রসর হবে না, তাহলে কি আমরা মেনে নেব? আতরাবুন আরও বলল, মুসলমানরা এই শর্তও আরোপ করতে পারে যে, বিলবিস নগরীটাও আমাদের দিয়ে দাও।

'মিশরের এক বিঘত জমিও আমি তাদের দেব না'– মুকাওকিস বললেন– 'আমি তাদের চক্করে ফেলতে চাই। আমাকে পাদরিদের একটি প্রতিনিধিদল তাদের কাছে পাঠাতে দাও। তুমি বাহিনী প্রস্তুত করো। আর আতরাবুন! ওই হতভাগা কিবতি খ্রিস্টানদের কথা ভুলে যেয়ো না। তাদের পুরোহিত বিনয়ামিনকেও জালে আটকানোর চিন্তা করছি।'

অবশেষে দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, পাদরিদের প্রতিনিধিদল মুসলমানদের সিপাহসালারের কাছে পাঠানো হবে। তখনই চার কিংবা ছয়জন নেতৃস্থানীয় পাদরির কাছে লোক পাঠানো হলো যে, মুকাওকিস আপনাদের অমুক সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

হেরাক্‌ল-এর সরকারি খ্রিস্টবাদের প্রধান বিশপ ছিল কায়রাস। পাদরিদের এই প্রতিনিধিদলে কায়রাসের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু তাকে ডাকা হলো না। ইতিহাসে এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হেরাক্‌ল ও কায়রাসের মাঝে খানিক মতবিরোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সে-সময় কায়রাস এস্কান্দারিয়ায় ছিল। হেরাক্‌ল তখনও পর্যন্ত বাজিন্তিয়ায় বসে-বসে আদেশ পাঠাচ্ছিলেন, যা কিনা মুকাওকিস ও আতরাবুনের জন্য ছিল একদম বেকার ও ফালতু।

অবরোধের সপ্তম কিংবা অষ্টম দিন। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে সংবাদ এল, মিশরি পাদরিদের একটি প্রতিনিধিদল আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমর ইবনে আস তখনই তাদের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন এবং যথাযথ সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রতিনিতিদলের সব কজন সদস্য ধর্মনেতা ছিলেন বিধায় তারা ধর্মের সূত্রেই কথা বললেন এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি বিষয়ে একটি বয়ান ঝাড়লেন।

আমর ইবনে আস তাদের এই ওয়াজ অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে শুনলেন এবং বললেন, আমাদের ধর্মও এই একই শিক্ষা দেয়। বলুন, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী। তারা বললেন, আপনারা আমাদের এ দেশে ছেড়ে আপন দেশে ফিরে যান; এর জন্য আপনাদের কোনো শর্ত থাকলে বলুন।

'আমার ব্যক্তিগত কোনো শর্ত নেই'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'আমরা আমাদের ধর্মের নিয়ম-নীতির অনুসারী। তাই শর্ত সেটিই পেশ করব, যা আমাদের ধর্ম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের বিধান হলো, আমি আপনাদের ও আপনাদের শাসকদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেব। যারা ইসলাম কবুল করে নেবে, তাদের ও আমাদের মাঝে কোনো ব্যবধান থাকবে না। তারা আমাদের জাতির সদস্য হয়ে যাবে। ইসলাম মানুষে-মানুষে সাম্য অটুট রাখতে আদেশ দিয়েছে। ইসলামে কোনো রাজা-বাদশা হয় না আর কাউকে প্রজা নামেও ডাকা হয় না। ইসলামে সব মানুষ সমান। আর আপনাদের যারা ইসলাম গ্রহণ করবেন না, তাদের উপর কোনো জবরদস্তি করা হবে না। কিন্তু তাদের থেকে আমরা জিযিয়া উসুল করব। তাদের সঙ্গেও সেই আচরণই করব, যেমন আচরণ আমরা মুসলমানদের সঙ্গে করে থাকি। অমুসলিমদেরও জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম সুরক্ষার দায়িত্ব আমরা পালন করব এবং তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করব।'

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির এই শর্ত মেনে নেয়নি এটিই সত্য। এত সহজে এমন কঠিন শর্ত মেনে নেওয়া যায় না। তারা আমর ইবনে

আস-এর সম্মতি নিতে চেষ্টা করল, আপনি এই রক্তক্ষয় বন্ধ করে দিন এবং ফিরে চলে যান। মুকাওকিসের পরিকল্পনা অনুসারে পাদরিরা কিছু মণি-মাণিক্যেরও প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু আমর ইবনে আস বললেন, ইসলামের জিহাদি চেতনায় রাজ্যদখলের মোহ থাকে না। না রাজভাণ্ডার হাতে আসার স্বপ্ন দেখা হয়।

আমর ইবনে আস (রাযি.) জানতেন, এই আলোচনা কোনো সাফল্য বয়ে আনবে না। কেননা, মুসলমানরা মিশর থেকে বেরিয়ে যাবে মুকাওকিসের এই আব্দার কোনো মূল্যেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি রসিকতার ছলে প্রতিনিধিদলকে উদ্দেশ করে বললেন, মিশরিদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। সেই সুবাদে মিশরের উপর আরবদের অনেকখানি হক আছে বই কি।

পাদরিরা বুঝে ফেললেন এই মুসলিম সিপাহসালার কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইশারাটি ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ.) মিশর গিয়েছিলেন। তখন মিশরের বাদশা তাকে একটি মেয়ে উপহার দিয়েছিলেন। পরে ইবরাহীম (আ.) তাকে বিবাহ করে নিয়েছিলেন। তার নাম রেখেছিলেন হাজেরা। হাজেরার গর্ভ থেকে হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্ম নিলেন। আবার আত্মীয়তার এই ইঙ্গিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকেও ছিল। মুকাওকিস নবীজিকে দুটি মেয়ে উপহার পাঠিয়েছিলেন, যাদের একজন নবীজির স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

'এই আত্মীয়তা আমরা ভুলতে পারি না'– প্রতিনিধিদলের বড় পাদরি মুচকি হেসে বললেন– 'কিন্তু এ ধরনের আত্মীয়তা পুনর্জীবিত করা কেবল কোনো নবী-রাসূলেরই পক্ষে সম্ভব।'

'আমরা বোধহয় একে অপরের সময় নষ্ট করছি'– আমর ইবনে আস এরূপ আলোচনায় অনীহা প্রকাশ করে বললেন– 'কথা এ পর্যন্তই যে, কোনো শর্তেই আমরা মিশর ত্যাগ করব না। মুসলমান যাওয়ার জন্য আসে না। আমরা একটি বার্তা নিয়ে এসেছি। যদি তারা তা কবুল করে, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় সিদ্ধান্ত যুদ্ধের মাঠে হবে।'

আমর ইবনে আস আর কোনো কথা বলতে ও শুনতে সাফ অস্বীকৃতি জানালেন। মুকাওকিস প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, আমি কিছু সময় নিতে চাই, যাতে বাহিনীকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে মুসলমানদের ঘিরে ফেলতে পারি।

'আমাদের কিছু সময় দিন'– প্রতিনিধিদলের প্রধান বললেন– 'আমি মিশরের শাসনকর্তার সঙ্গে কথা বলে পরে এসে আপনাকে উত্তর জানাব ।'

'মনে রাখবেন'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না । আপনাকে আমি তিন দিন সময় দিচ্ছি । আমি যদি ইসলামের শর্ত অনুযায়ী উত্তর না পাই, তাহলে রক্তক্ষয় হবে, আপনি যাকে ঠেকাতে চাচ্ছেন ।'

ইতিহাসে এসেছে, পাদরিরা সময় আরও কদিন বাড়ানোর আবেদন জানালেন । তারা অনেক সময় নিতে চাচ্ছিলেন । আমর ইবনে আস তাদের এই আবেদনও মঞ্জুর করে নিলেন এবং তিন দিনের স্থলে পাঁচ দিন সময় দিলেন । পাদরিরা আবারও আসবেন বলে ওয়াদা দিয়ে ফিরে গেলেন ।

পাদরিরা ফিরে গিয়ে মুকাওকিসের সাথে দেখা করলেন এবং আলোচনার বৃত্তান্ত শোনালেন । মুকাওকিস অনেক দিন সময় পাবেন বলে আশা পোষণ করছিলেন । কিন্তু পাদরিরা তাকে জানালেন, সিপাহসালার পাঁচ দিনের বেশি সময় দিতে রাজি হলেন না । শুনে মুকাওকিস গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন ।

'আমার জন্য পাঁচ দিন অনেক সময়'– আতরাবুন অতিশয় উদ্দীপ্ত গলায় বলল– 'এই পাঁচ দিনে আমি বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রস্তুত করে নেব এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাব । আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মুসলমানদের পেছনে হটিয়েই তবে আমি দম নেব ।'

বিলবিসের অবরুদ্ধ নাগরিকদের ব্যাপারে মুকাওকিস একটি সংবাদ পেলেন । তাহলো, তারা খুবই বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে, তাদের মনোবল ভেঙে গেছে এবং বলছে, মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নেওয়া হোক ।

বিলবিসে এমন কিছু লোকও ছিল, যারা ফরমা থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল । তারা দেখেছে, মুসলমানরা কীভাবে তাদের সৈনিকদের কচুকাটা করেছে এবং পালাতে বাধ্য করেছে । বিলবিসের নাগরিকদের উপর একদিকে মুসলমানদের আতঙ্ক বিরাজ করছিল, অপরদিকে ফরমা ও আরিশ থেকে আসা লোকেরা প্রচার করে ফিরছিল, তোমরা তোমাদের বাহিনীকে লড়তে দিয়ো না । তারপরও যদি বাহিনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তোমরা তাদের কোনো প্রকার সহযোগিতা করো না । কারণ, মুসলমানরা এলে তোমাদের কোনোই সমস্যা নেই । তারা সাধারণ মানুষদের কোনো কষ্ট দেয় না, উত্যক্ত করে না । বরং তারা নিরীহ নাগরিকদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের হেফাযত করে । কিন্তু যদি তোমরা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়াই কর, তাদের সাহায্য দাও, তাহলে এর পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ । মুসলমানরা তোমাদের ক্ষমা করবে না ।

মুকাওকিস দুজন পাদরিকে বিলবিস পাঠালেন। বলে দিলেন, ভেতরে গিয়ে লোকদের বলো, তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মিশরের শাসনকর্তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের নিশ্চয়তা দাও, তিনি মুসলমানদের পিটিয়ে তাড়িয়ে ছাড়বেন।

পাদরিদ্বয় গেলেন এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সঙ্গে দেখা করে নগরীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন।

আমর ইবনে আস তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ভেতরে তোমাদের কাজ কী? কেন যাবে? তারা মিথ্যা উত্তর দিল, আমরা জনতাকে বোঝাব, তোমরা ইসলাম কবুল করে নাও; তাহলে নিরাপদ থাকবে। আমর ইবনে আস তাদের অনুমতি দিয়ে দিলেন। তারা নগরীর প্রধান ফটকের কাছে গেল এবং তাদের জন্য ফটক সামান্য খুলে গেল। তারা ভেতরে ঢুকে গেল এবং ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

পাদরিদের আশা ছিল, তাদের থেকে উৎসাহ পেয়ে জনতা তাদের বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নগরীর প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করবে। একটা সমাবেশের আয়োজন করে তারা জনতার উদ্দেশে কথা বলতে শুরু করল। অমনি জনতা হট্টগোল শুরু করে দিল। তারা সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল, না-না; মুসলমানদের মোকাবেলা যেন না করা হয়। এমন কিছু শব্দও কানে এল যে, জনতা রোমান বাহিনীকে তিরষ্কার করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে। তারা বলছিল, আমাদের বাহিনী মুসলমানদের প্রতিরোধ করলইবা কোথায়? ওরা গোটা শাম রাজ্যটা মুসলমানদের দিয়ে দিল! আর এখন মুসলমানরা এই বাহিনীকে রক্তাক্ত করে মিশরেরও দুটা নগরী দখল করে নিল। আমাদের বাহিনী প্রতিরোধটা করছে কোথায়?

পাদরিরা জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এমন তো হতে পারে না, কোনো একটা নগরী– চাই তা ছোট হোক বা বড়– বিনাযুদ্ধে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে। কাজেই তোমরা বাহিনীকে যুদ্ধ করার সুযোগ দাও আর নিজেরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করো, যাতে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু জনতার হট্টগোল থামানো গেল না। ফলে নিশ্চিত ধরে নিতে হলো, নগরবাসী তাদের বাহিনীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়।

পাদরিরা ফিরে গিয়ে যখন মুকাওকিস ও আতরাবুনকে বিলবিসের অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া জানালেন, তখন আতরাবুন চমকে উঠল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসে থেকে পরে বলল, আমার বাহিনী আমারই লোকদের হাতে অপদস্থ হবে এ হতে পারে না। মুকাওকিস এতক্ষণ বিহ্বলের মতো বসে রইলেন। এবার হতাশকণ্ঠে বললেন, চিন্তা করো না; পথ একটা-না-একটা বেরিয়ে আসবেই।

আতরাবুন আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু তার এই নীরবতার ধরন বলছিল, সে অন্য কিছু ভাবছে।

আতরাবুন ইতিহাসের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিল। সে রাষ্ট্রের অধিপতি মুকাওকিসের অনুমতি ব্যতীত এবং তার অগোচরে বারো হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী তৈরি করে ফেলল এবং একদিন বিলবিস-অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। খবরটা মুকাওকিসের কানে এল। কিন্তু তিনি আতরাবুনকে ভেটো দেওয়ার সাহস করলেন না।

* * *

একদিন সকালবেলা। ফজর নামাযের আযান হয়ে গেছে। মুজাহিদগণ নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েক হাজার ধাবমান ঘোড়ার একটা ঝড় এসে পড়ল। এটি আতরাবুনের বারো হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের বাহিনী, যারা মুজাহিদদের উপর পেছন থেকে আক্রমণ চালাতে এসে পড়েছে। আতরাবুন সময়টা বেছে নিয়েছে বেশ যুৎসই। তার জানা ছিল, এটা মুসলমানদের নামাযের কিংবা নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। কাজেই আক্রমণটা এ সময়েই করতে হবে। সে ঠিকই ভেবেছিল, এ সময় মুসলমানরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকবে এবং হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে আত্মসংবরণ করে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে-নিতে এই সময়টায় আমার বারো হাজার অশ্বারোহী সৈনিক তাদের কুপোকাত করে ফেলবে এবং তাদেরকে তাদেরই রক্তের মাঝে ডুবিয়ে দেবে।

আতরাবুন অসতর্ক অবস্থায় মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কৌশল অবলম্বনে কোনেই ত্রুটি করেনি। ধূর্ত সেনাপতির ধূর্তামিপূর্ণ চাল যথার্থই ছিল। কিন্তু তার জানা ছিল না, মুসলমানদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস তাঁর সালার, কমান্ডার ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের আগেই বলে রেখেছেন, তোমাদের পেছন থেকে বা উভয় পার্শ্ব থেকে হামলা হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কাজেই প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে। আতরাবুন এই তথ্যও জানত না, মুজাহিদদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছিল, নামাযের সময় সবাই আপন-আপন তরবারি, বর্শা, ধনুক ও তূনীর সঙ্গে রাখবে এবং ঘোড়া সব সময় প্রস্তুত থাকবে। আমর ইবনে আস এমনই একজন সিপাহসালার ছিলেন যে, মনে হতো, তিনি বাতাসে শত্রুর ঘ্রাণ পেয়ে যাচ্ছেন এবং সেই ঘ্রাণ থেকে দুশমনের মনোভাব ও পরিকল্পনা ধরে ফেলছেন।

বেদুইনদের নিয়ে মুজাহিদদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশি। ফরমায় মুজাহিদগণ শাহাদাত বরণ করেছেন অপেক্ষাকৃত বেশি-ই। আর আহত মুজাহিদদের সংখ্যাও কম নয়, যাদের পক্ষে বিলবিস-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব

হবে না। বেদুইনরা অনভিজ্ঞতার কারণে মারা গেছে বিপুলসংখ্যক। এত প্রাণহানির পর বেদুইনদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এমনটা হয়নি। বরং তাদের সাহসিকতায় আগের চেয়ে বেশি উদ্যম ও রোষ তৈরি হয়ে গেছে। ফরমার গনিমত থেকে প্রত্যেক বেদুইনকে এতটুকু ভাগ দেওয়া হয়েছিল যে, মুসলমানদের নিষ্ঠা ও উদারতার ব্যাপারে তারা নিঃসংশয় হয়ে গেল।

আমর ইবনে আস (রাযি.) জানবার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না, শত্রুর সংখ্যা কত এবং তাতে অশ্বারোহী কতজন আর পদাতিক কতজন। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তিনি আগে থেকেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। আবার আক্রান্ত হলে বাহিনীর বিন্যাস কীরূপ হবে এবং কোন ইউনিট রিজার্ভে থাকবে, তাও তিনি আগাম বলে দিয়েছেন। এক্ষণে সেই আকস্মিক হামলাটা এসে পড়ল, যা মুজাহিদদের জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রতিজন মুজাহিদ পলকের মধ্যে আপন-আপন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গেলেন। অশ্বারোহীরা এক দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন এবং পূর্বনির্দেশিত বিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। একাজে সালারদের একটুও বেগ পেতে হলো না।

আমর ইবনে আস (রাযি.) আয়োজন আরও একটা করে রেখেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন, পেছন থেকে আক্রমণ যদি হয়-ই, তাহলে হতে পারে, নগরীর ভেতর থেকেও বাহিনী বাইরে বেরিয়ে আসবে। তখন মুজাহিদগণ বাহিনীর ঘেরাওয়ে চলে যাবে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে বিরাটা সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে। এর মোকাবেলায় আমর ইবনে আস রিজার্ভ ইউনিটটিকে আগেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন, এমন পরিস্থিতিতে আধা রিজার্ভ ফোর্স তাৎক্ষণিকভাবে নগরীতে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা চালাবে। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর আশা ছিল, অল্প কিছু মুজাহিদও যদি নগরীতে ঢুকে যায়, তাহলে ভেতরে হুলস্থুল পড়ে যাবে, চরম একটা অস্থিরতা তৈরি হয়ে যাবে, যে রোমান বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হবে।

রোমান সেনাপতি আতরাবুন বারো হাজার অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সে দেখতে পেল না, বেশ কিছু মুজাহিদ ডান ও বাম দিকে বেরিয়ে গেছেন। তখনও রাতের অন্ধকার অবশিষ্ট ছিল। লড়াইটা ছিল খুবই ঘোরতর। স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল, এই বিপুলসংখ্যক সৈনিক মুজাহিদদের এক টিপে শেষ করে দেবে। কিন্তু হঠাৎ আতরাবুনের অশ্বারোহী সৈনিকদের উপর ডান ও বাম পার্শ্ব থেকে এক যোগে আক্রমণ হলো। তাতে রোমানদের আক্রমণের যে-তীব্রতা ছিল, তা নিমিষেই নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তারা একের-পর-এক ধরাশায়ী হতে লাগল।

যদি সংখ্যার তারতম্য বিবেচিত হতো, তাহলে পরাজয় মুজাহিদদেরই বাটে আসত। কিন্তু যে-চেতনা মুজাহিদদের মাঝে বিরাজমান ছিল, রোমানদের মাঝে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। মুজাহিদদের অনুভূতি ছিল, সংখ্যার স্বল্পতা তাঁদের চেতনা ও সাহস দ্বারা পূরণ করতে হবে। তারপর বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহর আমাদের সঙ্গে আছেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) চোখ রাখলেন, হয়তবা এখনই নগরীর দ্বার খুলে যাবে এবং ভেতরের বাহিনীটি বাইরে বেরিয়ে আসবে। কিংবা হতে পারে, আতরাবুনের বাহিনী ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কেউ ফটক খুলছে না।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস ও অন্যান্য সালারগণ পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন এবং পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুজাহিদদের তাকবিরধ্বনিতে এমনই জোশ ও জযবা ছিল যে, এই আওয়াজ রোমান সৈনিকদের পিলে কাঁপিয়ে তুলল। আধা দিন গত না হতেই রোমান বাহিনী পিছু হটতে শুরু করল। আমর ইবনে আস (রাযি.) তৎক্ষণাৎ তাঁর অধীন সালারদের কাছে বার্তা পাঠালেন, যেন তারা পলায়মান রোমান বাহিনীকে ধাওয়া না করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আতরাবুনের এই বাহিনী নিজেদের বিপুলসংখ্যক মরদেহ ও আহতদের ফেলে পিছনে সরে গেল।

* * *

দিনের বাকি সময়টুকু লাশ তোলার কাজেই ব্যয় হয়ে গেল। গুরুতর আহতদেরও তুলে আনা হলো। মহিলারা আহতদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা ও দেখভাল শুরু করে দিল। আতরাবুনের বাহিনী কোথায় আছে দেখার জন্য আমর ইবনে আস (রাযি.) গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন। রণাঙ্গনে পড়ে-থাকা রোমান বাহিনীর নিহতদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো।

সন্ধ্যার পর গোয়েন্দারা জানাল, আতরাবুনের বাহিনী তিন-চার মাইল দূরে একস্থানে ছাউনি ফেলেছে এবং তাঁবুও লাগিয়েছে। আমর ইবনে আস সেরাতের জন্য আরেকটা বন্দোবস্ত করে নিলেন। তিনি চল্লিশ-পঞ্চাশজন গেরিলা সৈনিকের একটা ইউনিট প্রস্তুত করে নিলেন।

রাতে সারা দিনের ক্লান্ত রোমান সৈনিকরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। কিন্তু মধ্যরাতের পর তাদের উপর আগুনের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। এগুলো একধরনের মশাল। গেরিলা মুজাহিদরা ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে রোমান বাহিনীর তাঁবুগুলোর উপর নিক্ষেপ করছিলেন। কীর্তিটা মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশজন জানবাজ মুসলমানের। রোমানরা তাদের ঘোড়াগুলোকে শুকনা ঘাস খাওয়াত, যেগুলো

তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। একজন জানবাজ একটা মশাল ঘাসের মধ্যখানে ছুড়ে মারল আর অমনি ঘাসগুলো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এই আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াগুলো কেয়ামতের শোরগোল জুড়ে দিল এবং রশি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পালাতে লাগল। ওদিকে তাঁবু পুড়েছে মাত্র গোটাকতক; কিন্তু সমস্ত বাহিনীতে তোলপাড় ও হুলস্থুল পড়ে গেল। মশাল তেমন বেশি ছোড়া হয়নি– মাত্র কয়েকটা। কিন্তু জ্বলন্ত তাঁবু ও শুকনা ঘাসের লেলিহান শিখা রাতটাকে খুবই ভয়ানক দৃশ্যে পরিণত করে দিল। জানবাজরা যখন রোমনদের ঘুম থেকে জেগে তাঁবু থেকে বের হতে ও দৌড়ে পালাতে দেখল, তখন তারা ধাবমান দু-তিনজন অশ্বারোহী রোমান সৈনিককে বর্শা ও তরবারির আঘাতে ঘায়েল করে কেটে পড়ল। এভাবে রোমানদের প্রভুত ক্ষতি সাধন করে তারা ফিরে এল।

আমর ইবনে আস (রাযি.) জানবাজদের একটি পূর্ণ ইউনিট তৈরি করে রেখেছিলেন, যারা আগুন লাগানো, আগুন ছড়ানো ও গেরিলা আক্রমণের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল।

পরদিন আতরাবুন আর আক্রমণের যোগ্য রইল না। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই গেরিলা আক্রমণে রোমানদের জানি ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি হয়নি যে, আর আক্রমণ করা সম্ভয় নয়। কিন্তু যা ঘটেছে, তা হলো, আতরাবুনের গোটা বাহিনীর উপর মুসলমানদের এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আতরাবুন নিজেই তা অনুধাবন করে পরদিন আক্রমণ মুলতবি করে দিয়েছিল।

আমর ইবনে আস বিলবিস-অবরোধ বহাল রাখলেন এবং নজর রাখলেন, কোনো একটা ফটক খোলা হয় কিনা এবং ভেতরের সৈনিকরা বাইরে বেরিয়ে আসে কিনা। কিন্তু এমনটি হলো না। আমর ইবনে আস নগরীর উপর আক্রমণের কোনোই উদ্যোগ নিলেন না। তিনি বুঝে নিলেন, লড়াই আতরাবুনের বাহিনীর সঙ্গেই অব্যাহত থাকবে। পরে নগরীর বাহিনী বাইরে বেরিয়ে আসবে কিংবা অন্য কোনো পন্থা তৈরি হয়ে যাবে।

সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, বিলবিসের এই লড়াই পুরো একটা মাস বহাল থাকল। আমর ইবনে আস-এর অনুমান প্রথম দিন যেমন ছিল, শেষ দিনও তেমনই রইল। আতরাবুন তার অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ চালাতে থাকল আর মুসলমানরা পরম নৈপুণ্যের সাথে তাদের মোকাবেলা চালিয়ে গেল। পার্শ্ব থেকে পালটা আক্রমণ চালিয়ে-চালিয়ে তারা আতরাবুন-বাহিনীর সমূহ ক্ষতিসাধন করে চলল।

আমর ইবনে আস (রাযি.) দু-দু ও চার-চার রাতের বিরতি দিয়ে রোমান বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখলেন। রোমানরা রাতে পাহারার ব্যবস্থা করত বটে; কিন্তু মুসলিম গেরিলারা তারপরও কাজ সমাধা করে আসত। এভাবে রোমানদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হতে থাকল এবং তাদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল। তাদের সবচেয়ে বড় যে-ক্ষতিটা হয়েছে, তাহলো, রোমান সৈনিকদের মনোবল ভেঙে গেছে এবং তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা অনেক কমে গেছে।

* * *

মদিনায় সহযোগী বাহিনী প্রস্তুত হয়ে রওনা হয়েছে। কিন্তু এই বাহিনীর এসে বিলবিস-যুদ্ধ ধরা সম্ভব হবে না। এসে পৌঁছতে তাদের এক মাসও সময় লেগে যেতে পারে। আমর ইবনে আস (রাযি.) আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। রোমানদের জানি ক্ষয়-ক্ষতি অনেক হয়েছে বটে; কিন্তু মুসলিম মুজাহিদ ও বেদুইন যোদ্ধাদের ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। তবে বেদুইনদের মনোবল অটুট ছিল আর মুজাহিদদের জোশ-চেতনা ও ঈমানি শক্তিতে সামান্যতমও দুর্বলতা আসেনি। তাঁদের অবস্থাটা ছিল এমন, যেন শরীরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে; কিন্তু আত্মাগুলো তরতাজা আছে আর তাঁরা সেই আত্মিক শক্তি দ্বারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

আতরাবুনের সুযোগ ছিল, সে পেছন থেকে সাহায্য নিতে পারত। কিন্তু সাহায্যের জন্য সে কোনো আবেদনই জানায়নি। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কোনো ঐতিহাসিকই দেননি। মুকাওকিসও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোনো সাহায্য পাঠাননি। বোধহয় তার কারণ ছিল, বিলবিস নগরীর ভেতরে যে-বাহিনীটা ছিল, তারা তখনও পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এবং একদম তাজাদম ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বিলবিসের এই যুদ্ধকে খুবই রক্তক্ষয়ী লড়াই বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাপক হতাহতের কারণে মুজাহিদদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে আশঙ্কাজনকহারে কমে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরও আমর ইবনে আস (রাযি.) প্রত্যক্ষ করলেন, মাসের শেষে রোমান বাহিনীর পক্ষ থেকে যে-আক্রমণ এল, তার তীব্রতা খুবই কম এবং সংখ্যায় তারা সামান্য। আর আতরাবুন তার বাহিনীর সবার আগে।

গেরিলা মুজাহিদরা আতরাবুনের পতাকাটা দেখে ফেলল। লোকটা একা ছিল না। ছিল সে তার অশ্বারোহী নিরাপত্তারক্ষীদের বেষ্টনিতে। ইতিহাস সেই চারজন জানবাজ গেরিলার নাম সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়নি, যাঁরা আল্লাহর নামে প্রত্যয় নিয়েছিলেন, আজ আতরাবুনকে ঘিরে ফেলব। সে যদি প্রাণে রক্ষা

পেয়েও যায়, কিন্তু তার পতাকাটা হলেও ভূলুণ্ঠিত করে ছাড়ব। তারা আতরাবুনের রক্ষীদের বেষ্টনির কাছে পৌঁছে গেলেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে রক্ষীদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। লড়তে-লড়তে তিনজন শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু চতুর্থজন আহত হয়েও আতরাবুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এক আঘাতে তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলেন। সেই সঙ্গে নিজেও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

ওদিকে বিলবিস নগরীর দু-তিনটা ফটক খুলে গেল এবং ভেতরের সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। সেই সঙ্গে বাইরের বাহিনীতে একটা রব উঠল এবং আওয়াজটা মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মতো বাহিনীর সবার কানে পৌঁছে গেল– 'সেনাপতি আতরাবুন মারা গেছেন। আতরাবুনের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।'

রোমান বাহিনী বোধহয় এই ঘোষণারই অপেক্ষায় ছিল। তাদের পা উপড়ে গেল। তারা পেছনে সরে যেতে শুরু করল। এই ঘোষণা নগরী থেকে বেরিয়ে আসা সৈনিকদেরও কানে গেল। মুজাহিদদের মনোবল এমনভাবে বেড়ে গেল, যেন আগুনের তেজ আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। তাঁরা তাকবির ও জয়ধ্বনি দিতে শুরু করলেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর রিজার্ভ বাহিনীকে আগেই আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেইমাত্র নগরীর ফটক খুলে যাবে, অমনি তোমরা ফটকগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ভেতরে ঢুকে যাবে। বাহিনী নির্দেশনা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুজাহিদ লড়তে-লড়তে নগরীতে ঢুকে পড়লেন।

ওদিকে রোমান সৈনিকরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে নগরী থেকে বেরিয়ে আসা সৈনিকরা পুনরায় ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত শোচনীয়রূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে বাইরের অশ্বারোহী সৈনিকদের পেছনে ছুটতে লাগল।

মুসলিম বাহিনী নগরীতে ঢুকে পড়ল। তিন হাজার অক্ষত রোমান সৈনিক মুসলমানদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করল এবং বন্দিত্ব বরণ করে নিল। বাইরে আতরাবুনের মরদেহটা তুলে নেওয়ার মতোও কেউ ছিল না।

আতরাবুন সাধারণ কোনো সেনানায়ক ছিল না। তার সমর-কৌশল, রণ-দূরদর্শিতা, শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার যোগ্যতা, রণাঙ্গনের ধূর্তামি ও চালবাজির

কথা ইতিহাস আজও স্মরণ করছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)ও তার এই ভয়ংকর গুণগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।

ফিলিস্তিনে যখন রোমান ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হলো, তখন মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষার দায়িত্ব আতরাবুনের কাঁধে ন্যস্ত ছিল। সম্রাট হেরাক্ল বলতেন, আতরাবুন আছে তো ফিলিস্তিনও আমাদের আছে।

হযরত ওমর (রাযি.) বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার জন্য আমর ইবনে আসকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর এই সিপাহসালারের বহুমুখী গুণ ও যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল, আতরাবুনের মোকাবেলা করা আমর ইবনে আস-এর পক্ষেই সম্ভব। তিনি যখন আমর ইবনে আস (রাযি.)কে আতরাবুনের মোকাবেলায় পাঠিয়েছিলেন, তখন এই ঐতিহাসিক শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন– 'আমি আরবের আতরাবুনকে রোমের আতরাবুনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে দিয়েছি। এবার দেখব, কে হারে আর কে জিতে।'

সেই যুদ্ধে আতরাবুন হেরে গিয়েছিল আর আমর ইবনে আস জয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছিলেন। আমর ইবনে আস বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন আর আতরাবুন পালিয়ে গেল।

এখন রোমের সেই আতরাবুন আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর জানবাজদের হাতে প্রাণ হারাল আর বিলবিসের জয় আরবের আতরাবুনের পায়ে চুমো খেল।

দুই

রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হেরাক্‌ল– আপন যুগে যিনি শক্তি ও আতঙ্কের একটি নাম ছিলেন– বাজিন্তিয়ায় বসে ছিলেন। বাজিন্তিয়া (আজকালকার ইস্তাম্বুল) মিশর থেকে অনেক দূরে ছিল। মধ্যখানে সুবিশাল রোমসাগর প্রতিবন্ধক ছিল এবং বেশ কিছু দূরত্ব সড়ক পথেরও ছিল। এই গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে– যেটি মুসলমানরা তার জন্য মিশরে তৈরি করে দিয়েছিল– তার মিশরে থাকা আবশ্যক ছিল। কিন্তু তিনি বাজিন্তিয়ায় বসে মুকাওকিসের নামে আদেশ পাঠাচ্ছিলেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর বাহিনী বিলবিসে দুর্ভেদ্য দুর্গও জয় করে নিয়েছে এবং রোমের বিখ্যাত সেনাপতি আতরাবুন মারা গেছে এই তথ্য এখনও তিনি পাননি। দিনকতক আগে তার কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল, মুসলমানরা ফরমা জয় করে নিয়েছে। এই সংবাদ তাকে অগ্নিশর্মা করে তুলেছিল। তিনি মুকাওকিসের নামে একখানা বার্তা লিখলেন এবং তখনই দূতকে রওনা করিয়ে দিলেন।

'তুমি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, মিশর মুসলমানদের দিয়েই দেবে, তাহলে এখনই দিয়ে দাও'– হেরাক্‌ল বার্তায় লিখলেন– 'তুমি সৈনিকদের হত্যা করাচ্ছ কেন? যদি তোমরা পরাজয়ই বরণ করে নিয়ে থাক, তাহলে এই খুনখারাবি বন্ধ করে দাও। তুমি বোধহয় জান, তোমাদের মাঝে আমার নিজস্ব গোয়েন্দা বিদ্যমান আছে, যারা আমার কাছে তোমাদের প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি তথ্য প্রেরণ করছে। মুসলমানদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস-এর কাছে পাদরিদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তোমরা ভালো করনি। তোমরা ভেবে দেখনি, এভাবে তোমরা নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করেছ। তোমাদের দেখা দরকার ছিল, মুসলমান সংখ্যায় কত নগণ্য আর তারা তাদের মাতৃভূমি থেকে কত দূরে, যেখানে রসদ ও জরুরি সেনাসাহায্য সময়মতো পৌঁছা সম্ভব নয়। বিপরীতে তোমরা কৌশল অবলম্বন করেছ, মুসলমানরা আরও সম্মুখে চলে আসুক আর তোমরা তাদের ঘিরে ফেলে নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু তারা দুর্গ জয় করে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া তারা মিশরের বেদুইনদেরও সাথে জুড়িয়ে নিয়েছে। এ তোমাদের চরম অযোগ্যতা।...

'আমি জানি, তুমি কিবতি খ্রিস্টান এবং কায়রাসকে প্রধান বিশপ মান না। তোমার এই বিশ্বাসকে আমি মূল্যায়ন করি। কিন্তু এটা মেনে নিতে পারছি না, তোমরা রোমসাম্রাজ্যের মর্যাদার কথা ভুলে যাবে আর তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আতরাবুন-থিওডোরের মতো সেনাপতিরা তোমার সঙ্গে আছে। তোমার মনোবল অটুট রাখা উচিত। কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছ। আতরাবুন যুদ্ধ করতে চাচ্ছে আর তুমি মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতা করে নিরাপদ থাকতে চাচ্ছ। কায়রাসের আনুগত্যেও আমার সংশয় আছে। তাকে আমি প্রধান বিশপ বানিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে, সে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। আমি চাচ্ছি, তুমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা বদলে নাও। আমার পক্ষ থেকে যদি তুমি আশ্বস্ত হতে না পার, তাহলে আমি মিশর চলে আসব। কিন্তু তখন আমি তোমাকে আত্মপক্ষ অবলম্বনের সুযোগ দেব না। আতরাবুনের পথে তুমি কোনো প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ো না এবং তাকে মুসলমানদের মোকাবেলায় যেতে দাও। এবার আমি তোমার ভালো খবরের অপেক্ষায় থাকব।'

* * *

হেরাক্ল-এর এই বার্তা মুকাওকিসের কাছে তখন পৌছল, যখন তার সম্মুখে আতরাবুনের লাশ পড়ে ছিল। মরদেহটা খানিক আগে তার কাছে পৌছেছিল। মুকাওকিস তখন ব্যবিলনে ছিলেন। ব্যবিলন বিলবিসের পরে অত্যন্ত মজবুত এবং রোমানদের দাবি অনুসারে একটি অজেয় দুর্গ ছিল। সেযুগে কোনো সেনাপতি যুদ্ধে প্রাণ হারালে তার মরদেহ রণাঙ্গনে পড়ে থাকতে দেওয়া হতো না। একে রাষ্ট্রের জন্য অবমাননাকর মনে করা হতো। ফলে রাষ্ট্রপধানের আদেশে তার মৃতদেহ ময়দান থেকে তুলে নেওয়া হতো। কিন্তু মুকাওকিস তার পরাজিত বাহিনীকে এমন কোনো আদেশ প্রদান করেননি যে, আতরাবুনের লাশটা তুলে নিয়ে আসো। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে পলায়মান বাহিনীর তো হুশই ঠিকানায় ছিল না যে, তারা তাদের সেনাপতির মৃতদেহটা তুলে নেবে। তারা তো নিজেদের জীবন বাঁচানোর ধান্দায়ই ব্যস্ত ছিল। প্রশ্ন হলো, তারপরও রোমান সেনাপতি আতরাবুনের লাশ মুকাওকিসের কাছে কীভাবে পৌছল?

এটা মুসলমানদের বিদ্রূপের একটা ধরন ছিল। রোমানদের সঙ্গে মুসলমানরা মশকারা করেছিল। বিলবিস থেকে রোমান বাহিনী যেভাবে সন্ত্রস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়েছিল, সেই অবস্থায় কারও হুশ ঠিকানায় থাকবার কথা ছিল না যে, দেখবে, রোমের এমন খ্যাতিমান সেনাপতির মৃতদেহ কোন জায়গাটায় পড়ে আছে কিংবা সত্যিই তিনি মারা গেছেন, নাকি মুসলমানরা গুজব ছড়িয়েছিল, আতরাবুনের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, আতরাবুন মারা গেছে। লড়াই শেষ

হওয়ামাত্রই রণাঙ্গনের অবস্থা চরম হুলস্থুল ও আপন-আপন জান বাঁচাও নীতির চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যেত। চোখ ইতস্তত ধাবমান ঘোড়াগুলোর উড়ানো ধূলির মাঝে অনেক দূর পর্যন্ত কাজ করত না। পলায়মানরা মৃতদেহ ও সংজ্ঞাহীন আহতদের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। রক্তে মাটি এমনভাবে লাল হয়ে গিয়েছিল, যেন রক্তবৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। আহতদের আর্তচিৎকার কলিজা ছিঁড়ে ফেলছিল। বন্ধু-শত্রুর ভেদাভেদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। নগরবাসীর হাঁক-ডাক, আহ-চিৎকার হতো আলাদা। তারা একদিকে পালাত, অপরদিকে যুদ্ধে-অংশ-নেওয়া আত্মীয়-স্বজনদেরও খুঁজে বেড়াত।

মুজাহিদদের স্ত্রী ও বোন-কন্যারা– যারা বাহিনীর সঙ্গে ছিল রোমান বাহিনীর পিছু হটার পরপরই রণাঙ্গনে ছুটে গেল। আহতদের তুলে-তুলে পেছনে সরিয়ে আনা, তাদের চিকিৎসার জায়গায় নিয়ে যাওয়া ও পানি পান করানোর দায়িত্ব তারা নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছিল। এটি মুসলমানদের চিরাচরিত রণনীতিও ছিল। এই মহিলাদের মাঝে শারিনাও ছিল। শারিনা তার স্বামী হাদীদের সঙ্গে এই অভিযানে এসেছে। ছিল ফাহাদ ইবনে সামেরের স্ত্রী আইনিও।

শারিনা রোমানদের হতাহতদের মাঝে মুসলিম জখমিদের তালাশ করে ফিরছিল। একটা রোমান লাশের চেহারা তার চেনা-চেনা মনে হলো। পোশাকে সৈনিক নয়; বরং উচ্চপদের কোনো সেনাপতি বলে মনে হলো। লাশের মুখটা রক্ত-মাটিমাখা। লাশটার প্রতি শারিনার আগ্রহের কারণ হলো, রাজপরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে রোমান সেনাপতিদের ব্যাপারে তার জানাশোনা ছিল। শারিনা লাশের গায়ের কাপড় দ্বারা-ই চেহারা থেকে রক্ত ও মাটিগুলো মুছে দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে চকিত হয়ে পেছনে সরে গেল, যেন তার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হলো না, এই রোমান লোকটাও মারা যেতে পারে। এটা-ই রোমান সেনাপতি আতরাবুনের মরদেহ।

আতরাবুনকে শারিনা-ই ভালো করে জানত ও চিনত। আতরাবুন এমন একজন স্বৈরাচারী সেনাপতি ছিল যে, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মতো মহাপ্রতাপশালী ও অত্যাচারী রাজাও তাকে সমীহ্ করে চলতেন।

আতরাবুন বিলাসপ্রিয় মানুষ ছিল। যেকোনো সুন্দরী ও রূপসী নারীকে – চাই সে রাজপরিবারেরই কেউ হোক– সে নিজের ন্যায্য অধিকার মনে করত। যখন যার উপর চোখ পড়ত, তাকে এক-দুরাতের জন্য নিজের কাছে নিয়ে রাখত। শারিনার মা খুবই রূপসী নারী ছিল। শারিনা তখন তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোরী যখন আতরাবুন তার মাকেও নিজের ঘরে নিয়ে যেত। অথচ মহিলা হেরাক্‌ল-এর স্ত্রীদের একজন। কিন্তু এই নারী আতরাবুনের বন্ধুত্বে বেজায় খুশী ছিল।

শারিনার বেশ মনে আছে, আতরাবুনের চোখ তার উপরও পড়েছিল। কিন্তু ভাগ্যটা তার ভালো যে, তখন তার বয়স কম ছিল। আতরাবুন কয়েকবার তাদের ঘরে এসে তাকে কোলো বসিয়েছিল। শারিনা তখনও ভালো করেই বুঝত, এই আদর শিশুসুলভ নয়– এখানে অপর কোনো কুমতলব কাজ করছে।

এখন সেই আতরাবুনের লাশ খাক ও খুনে একাকার পড়ে আছে এবং তার প্রতি তাকানোর মতোও কেউ নেই। তার নিজের সৈনিকরা তার মরদেহটাকে দলে-পিষে পালিয়ে গেছে।

শারিনা উঠে দাঁড়াল এবং এদিক-ওদিক তাকাল। সে আইনিকে দেখতে পেল। আইনি এক জখমি মুজাহিদকে কোলে রেখে পানি পান করাচ্ছিল। কাজ সমাধা করে উঠে দাঁড়ালে সে শারিনাকে দেখতে পেল। শারিনা তার থেকে বেশি দূরে ছিল না। আইনি দৌড়ে শারিনার কাছে গেল এবং বলল, ওই জখমি উঠে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমি তাকে পানি পান করিয়েছি। ক্ষত তার এমন যে, বাঁচবে বলে মনে হয়। কিন্তু তাকে তাড়াতাড়ি জায়গামতো পৌঁছাতে হবে। কিন্তু শারিনা আতরাবুনের লাশের কাছ থেকে সরতে চাচ্ছে না। সে এদিক-ওদিক তাকাল। দেখল, দু-তিনজন মুজাহিদ হতাহতদের নীরিক্ষা করে ফিরছে। শারিনা দৌড়ে তাদের কাছে গেল এবং তাদের উক্ত মুজাহিদকে দেখিয়ে বলল, একে তুলে পিছনে নিয়ে যান। মুজাহিদরা জখমির কাছে গেল আর শারিনা আতরাবুনের লাশের দিকে ফিরে গেল।

'শারিনা!'– আইনি লাশের চেহারাটা দেখেই বলে উঠল– 'ইনি রোমান বাহিনীর বড় কোনো সেনাপতি বলে মনে হচ্ছে। আমি একে দুবার দেখেছি। একবার আমাদের গ্রামের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেছিল। একবার গ্রামে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান নিয়েছিল এবং গ্রামবাসীদের হুমকি-ধমকি দিয়েছিল। পরে চলে গেলে সবাই বলাবলি করল, ইনি অনেক বড় সেনাপতি; নাম আতরাবুন।'

'হ্যাঁ; ইনি তিনি-ই'– শারিনা বলল– 'তুমি দৌড়ে যাও; হাদিদ ও ফাহাদকে ডেকে আনো। মাসউদকে পেলে তাকেও আসতে বোলো।'

আইনি ছুটে গেল। গিয়েই হাদিদকে পেয়ে গেল। বলল, রোমান সেনাপতি আতরাবুনের লাশ একজায়গায় পড়ে আছে। শারিনা আপা আপনাকে, ফাহাদ ও মাসউদকে যেতে বলেছে।

হাদিদ হাতের কাজ ফেলে দিয়ে ফাহাদ ও মাসউদকে খুঁজে বের করল। তারপর তিনজন শারিনার কাছে পৌঁছে গেল। শারিনা আনন্দ প্রকাশ করে রসিয়ে-রসিয়ে বলল, এই দেখো, রোমের সেই সেনাপতি, যাকে মানুষ হেরাক্‌ল-এর চেয়েও

বড় মনে করত, যিনি প্রত্যয় নিয়ে এসেছিলেন, মুসলমানদের মিশর থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবেন।'

আতরাবুন মারা গেছে এটা এই তিন গোয়েন্দা মুজাহিদের জন্য নতুন কোনো খবর ছিল না। এই সংবাদ তারা আগেই শুনেছে। রোমান বাহিনীর পিছুহটার কারণও ছিল, তাদের সেনাপতির পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এবং সেনাপতি নিজেও প্রাণ হারিয়েছে।

'তুমি কি আমাদের এই লাশটা দেখানোর জন্যই ডেকে পাঠিয়েছ?' হাদিদ শারিনাকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে'– শারিনা বলল– 'লাশটা যদি আমরা উপহারস্বরূপ মুকাওকিসের কাছে পাঠিয়ে দেই, তাহলে কেমন হয়?'

হাদিদ তার সঙ্গীদের পানে তাকাল। তিনজনেরই ওষ্ঠাধরে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল, যেন চিন্তাটা তাদের বেশ চমৎকার লেগেছে। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াল, উপহারটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা কী। তিনজন বিষয়টা নিয়ে মতবিনিময় করল এবং বুদ্ধি একটা বেরিয়ে এল।

এই পরাজয়ে বিপুলসংখ্যক রোমান সৈন্য নিহত হয়েছে। অনেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। তিন হাজার সৈন্য দুর্গের অভ্যন্তরে অস্ত্রসমর্পণ করে বন্দিত্ব বরণ করে নিয়েছে। হাদিদ প্রমুখ যখন আতরাবুনের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তখনও অস্ত্রসমর্পণের ধারা অব্যাহত ছিল। কতিপয় রোমান– যারা দুর্গে রয়ে গিয়েছিল– পালানোর চেষ্টায় ইতস্তত লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। হাদিদ, ফাহাদ ও মাসউদ এরূপ দুজন রোমানকে ধরে আনতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কোনো সাধারণ সৈনিক নয়– তাদের দায়িত্বশীল পর্যায়ের দুজন রোমান দরকার। বেশি খাটতে হলো না। যেমন দরকার ছিল, তেমনই দুজন রোমান তারা পেয়ে গেল। একজন উচ্চপর্যায়ের অফিসার। লোকটা আহত। তবে ক্ষত এমন গুরুতর নয় যে, হাঁটতে-চলতে বা অশ্বারোহণে অক্ষম। অপরজন অপেক্ষাকৃত নিম্নপদের; কিন্তু শারীরিকিভাবে একদম সুস্থ। দুজন মুজাহিদ তাদের ধরে দুর্গের দিকে নিয়ে আসছিলেন। পলায়নচেষ্টায় তারা কোথাও লুকিয়ে ছিল। হাদিদ ও তার সাথীরা মুজাহিদদের থেকে তাদের নিয়ে নিল এবং বলল, আমরা গোয়েন্দা। আমাদের কাছে দাও; এদের আমরা দুর্গে নিয়ে যাব। এদের থেকে আমাদের তথ্য আদায় করতে হবে।

'আমাদের কথাগুলো মনোযোগসহকারে শুনে নাও'– মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কি রোমানদুজনের উদ্দেশে বলল– 'এই দেখো তোমাদের সিপাহসালার আতরাবুনের লাশ। আমরা তোমাদের তিনটা ঘোড়া দেব। দুটা তোমাদের

দুজনের জন্য আর অপরটা এই লাশটা নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা তোমাদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দেব। বিনিময়ে তোমরা আমাদের একটি কাজ করে দেবে। এই লাশটা মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিসের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। মাসউদ আহত রোমানকে উদ্দেশ করে বলল, আমরা তোমার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করিয়ে পাঠাব। আর মুকাওকিসকে আমাদের এই বার্তাটি পৌঁছাবে। আমাদের এই মৌখিক বার্তাটি হুবহু মুখস্থ করে নাও–

'যাদের তুমি আরবের বদ্দু বলছ, এই লাশ তারা তোমার জন্য উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছে। এর পানে তাকাও আর শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমার সেনা-অফিসারদের কানে-কানে এই বার্তাটি পৌঁছিয়ে দাও, যে-ই আমাদের মোকাবেলায় আসবে, তারই পরিণতি এমন হবে। আর তোমার সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কাছে খবর পৌঁছাও, মুসলমানরা আতরাবুনের লাশ আমার কাছে উপহার ও শিক্ষার উপকরণস্বরূপ প্রেরণ করেছে।'

'এ-ও শুনে নাও'– হাদিদ বলল– 'শুধু একাজের জন্য আমরা তোমাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। অন্যথায় তোমাদের দাসত্বের মতো অপমানজনক জীবন বরণ করতে হবে আর বাকি জীবন দিন-রাত অন্যের গতর খেটে কাটাতে হবে। এই লাশটা সোজা মুকাওকিসের কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে আমাদের বার্তাটি পৌঁছিয়ে দাও। আমরা তোমাদের দুজনকে ভালোভাবে মনে রাখব। যেভাবে আমরা এই দুর্গ জয় করেছি, তেমনি পরবর্তী দুর্গও আমরা জয় করে নেব। যদি জানতে পারি, লাশটা মুকাওকিস পর্যন্ত পৌঁছাওনি, আমাদের বার্তা তাকে শোনাওনি, তাহলে তোমাদের এমন মৃত্যু মরতে হবে যে, দর্শকরা কাঁপতে শুরু করবে।'

'তোমরা বোধহয় বুঝতে পারনি'– রোমান অফিসার বলল– 'এ তো আমাদের পরম এক পাওয়া। আমাদের সঙ্গে এ অনেক বড় সদাচার যে, তোমরা আমাদের মুক্তি দিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছ। তোমাদের বার্তা আমরা মুকাওকিসের কাছে বর্ণে-বর্ণে পৌঁছিয়ে দেব এবং লাশটা তার হাতে তুলে দিয়ে তার থেকে প্রশংসা লাভ করব। হতে পারে, তিনি আমাদের পুরস্কার দ্বারাও ভূষিত করবেন।'

তিন মুজাহিদ রোমান অফিসারের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করিয়ে দুজনকে দুটা ঘোড়া দিয়ে দিল। আরেকটা ঘোড়া দিল আতরাবুনের লাশ বহনের জন্য। লাশটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দেওয়া হলো। ওখানে ঘোড়ার কোনো অভাব ছিল না। মৃত রোমানদের ঘোড়াগুলো এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে ছিল। আহতরা তখনও পর্যন্ত দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছিল। দুই রোমান ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করল এবং

আতরাবুনের লাশ নিয়ে ব্যবিলনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। হাদিদ, ফাহাদ ও মাসউদ কিছু দূর পর্যন্ত সঙ্গে গেল, যাতে কেউ তাদের ধরে না ফেলে।

* * *

মুসলমানরা বিলবিস নগরী জয় করে নিয়েছে। রোমান বাহিনী অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় হাজার-হাজার সৈনিককে খুন করিয়ে, বন্দি করিয়ে পিছু হটেছে। আতরাবুনের মতো সেনানায়ক– শাসনকর্তা মুকাওকিস যাকে নিজের ডান হাত মনে করতেন– মারা গেছে। ধকলটা সামলানো মুকাওকিসের পক্ষে কত বড় কঠিন ছিল, তা উপলব্ধি করা তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শাসক মুকাওকিসের ব্যক্তিত্বের উপর সবচেয়ে বড় আঘাতটা ছিল সেই বার্তা, যেটি মুসলমানরা তার কাছে পাঠিয়েছিল। এটি ছিল তার জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। এই বার্তায় তার জন্য খুবই অপমানজনক তিরস্কার ছিল, যাকে তিনি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ কিছুই ভাবতে পারলেন না, এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত।

এর অল্পক্ষণ পরই বাজিন্তিয়া থেকে সম্রাট হেরাক্ল-এর দূত এসে হাজির হলো এবং মুকাওকিসকে তার লিখিত বার্তা হস্তান্তর করল। এক তো বার্তাটা-ই এমন ছিল যে, মুকাওকিসের মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল এবং তার কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। তদুপরি তার মানসিক অবস্থাটা ছিলই জ্বলন্ত চুল্লির মতো। হেরাক্ল-এর এই বার্তা তাদের তেল ছিটানোর কাজটা সেরে দিল। মুকাওকিস হেরাক্ল-এর বিরুদ্ধে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলেন। আতরাবুনের মৃত্যু মুকাওকিসের জন্য সাধারণ কোনো ব্যথা ছিল না। তার জানা ছিল, আতরাবুনের মৃত্যু রোমান বাহিনীর মনোবল আরও হীন আর মুসলিম বাহিনীর সাহস আরও চাঙ্গা, আরও তরতাজা করে দিয়ে থাকবে।

ইতিহাসে স্পষ্ট লেখা নেই, কায়রাস ওই সময় কোথায় ছিল। এতটুকু জানা যাচ্ছে, মুকাওকিস তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আর সে তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয়েছিল। মুকাওকিস তাকে হেরাক্ল-এর বার্তাটা পড়তে দিলেন। কায়রাস বার্তাটা পড়তে লাগল আর তার মেজাজের টেম্পারেচার বাড়তে থাকল। মনের অবস্থাটা তার ঠিক মুকাওকিসের মতো হয়ে গেল। বার্তায় হেরাক্ল কায়রাসের আনুগত্যে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বার্তার এই অংশটা পড়ে কায়রাস আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, মিশরে মুসলমানদের জয়ের একটি কারণ ছিল, হেরাক্ল ও কায়রাসের মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং কায়রাস পরদার অন্তরালে মুসলমানদের সহযোগিতা করেছিল।

কিন্তু দাবিটা একেবারেই ভিত্তিহীন। হেরাক্‌ল-এর বার্তা পড়ার পর মুকাওকিস ও কায়রাসের মাঝে যে-কথোপকথন হয়েছিল, তা-ই ওইসব ঐতিহাসিকের দাবির সত্যতা ও বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করছে। এটা সঠিক যে, হেরাক্‌ল ও কায়রাসের মাঝে বিরোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন হয়নি যে, কায়রাস মুসলমানদের হাতে হেরাক্‌লকে পরাজিত করানোর মিশন হাতে নিয়েছিল। বরং বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের পরাজিত করতে সে নিজের মতো করে একটা রণাঙ্গন চালু করার প্রয়াস শুরু করেছিলেন।

'আমাদের সম্রাট বাজিন্তিয়ায় বসে কথা বানাচ্ছেন'– 'মুকাওকিস কায়রাসকে উদ্দেশ করে বললেন– 'কথাও এমন গড়ছেন, যেন তিনি কখনও মুসলমানদের পরাজিত করেছেন আর মুসলমানরা তাঁর ভয়ে তটস্থ। মুসলমানদের সংখ্যা তখনও কম ছিল, যখন তারা হেরাক্‌লকে শাম থেকে তাড়াতে ও রক্তাক্ত করতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে শাম থেকে তারা বের করেই ছাড়ল। আজ তিনি আমাদের পাঠ শেখাচ্ছেন, তোমরা সাহস হারিয়ো না!

'আমি জানি আসল ব্যাপারটা কী'– কায়রাস বলল– 'হেরাক্‌ল শুধু এ কারণে মিশর আসছেন না যে, তিনি মুসলমানদের ভয় পান। শামের প্রতিটি রণাঙ্গনে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তার মন ও মস্তিষ্কের উপর পরাজয়ের ছাপ বসে গেছে। মিশরও তাঁর হাত থেকে চলে যাচ্ছে বলে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই পরাজয়ের কালিমা তিনি অন্য কারও মুখে লেপন করতে চাচ্ছেন। আজ যদি মুসলমানরা পশ্চাদপদতা অবলম্বন করে, তাহলে তিনি দৌড়ে এখানে চলে আসবেন আর জয়ের মালাটা নিজের গলায় পরে নেবেন। খ্রিস্টবাদের চেহারাটা তিনি বিকৃত করে দিয়েছেন আর আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, তুমি মানুষের মাঝে আমার বানানো ধর্মটা চালু করে দাও। যদি কেউ মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলো এবং বংশটা উজাড় করে দাও। আমি তার আদেশ পালন করেছি এবং আপন প্রজাদের রক্ত ঝরিয়েছি। তাঁকে আমি বারবারই বলেছিলাম, প্রজাদেরকে নিজের শত্রু বানাবেন না। কিন্তু তিনি সম্রাট। যাকে খুশি জীবন দান করা, যাকে খুশি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াকে তিনি নিজের অধিকার মনে করেন।'

'যাদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়েছিল আর যারা হেরাক্‌ল-এর খ্রিস্টবাদকে বরণ করে নেয়নি, তারা আজ নিজেদের বাহিনীকে সাহায্য করতে রাজী নয়'– মুকাওকিস বললেন– 'আমার সন্দেহ লাগছে, কিবতি খ্রিস্টানরা তলে-তলে মুসলমানদের সহযোগিতা দিচ্ছে। এমন একটা পন্থা খুঁজে বের করুন বিশপ, যাতে কিবতিরা আমাদের সঙ্গে চলে আসে। অন্তরে রোমান বাহিনীর প্রতি বিদ্বেষ

বা শত্রুতা থাকা কোনো বিষয় নয়; কিন্তু মাতৃভূমির শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতা করা খুবই ভয়াবহ ও লজ্জাকর ব্যাপার। এই সমস্যার একটা সমাধান বের করুন। মুসলমানদের মিশর থেকে হয় তাড়িয়ে দিতে হবে, নাহয় একটা-একটা করে মুসলমানকে মিশরের মাটিতেই পুতে ফেলতে হবে। তৃতীয় কোনো পথ আমার জানা নেই। এর কোনো বিকল্প নেই। তারা আতরাবুনের লাশের সঙ্গে যে-বার্তা পাঠিয়েছে, সে আমার সহ্যের অতীত। আমার আত্মমর্যাদাকে তারা চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের থেকে আমি দৃষ্টান্তমূলক প্রতিশোধ নেব।'

'আমিও তো এমনই চাই'– কায়রাস বলল– 'কিন্তু বিনয়ামিনকে সাথে নেওয়া ছাড়া আমরা সফল হতে পারব না। কিবতিরা বিনয়ামিন ছাড়া আর কারও আদেশ মানে না। তিনি নিজে কাওসের মরুভূমিতে আত্মগোপন করে আছেন বটে; কিন্তু এমন একটা আয়োজন করে রেখেছেন যে, তার প্রতিটি আদেশ দূর-দূরান্ত অঞ্চলের প্রতিজন কিবতির খ্রিস্টানের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি যদি জনসম্মুখে আসেন, তাহলে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব এবং নিজে পদত্যাগ করে তাকেই প্রধান জাযক বানিয়ে নেব।'

'আমি জানি, তিনি কোথায় আছেন'– মুকাওকিস বললেন– 'যেকোনো দিন যেকোনো সময় আমি তাকে গ্রেফতার করাতে পারি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা সুসম্পর্ক আছে বিধায় কোনো উদ্যোগ নিচ্ছি না। তাছাড়া ওদিকে হাত বাড়ালে কিবতিদের বিদ্রোহ করে বসবারও আশঙ্কা আছে।'

মুকাওকিস ও কায়রাস এ বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করতে থাকলেন। তারা আতরাবুনের পর অপর খ্যাতনামা সেনাপতি থিওডোরকেও ডেকে পাঠালেন। ব্যাপারটা তার সম্মুখে উপস্থাপন করে তারও মতামত চাইলেন। দেখা গেল, সেও একই চিন্তা লালন করছে। এমনকি সে এ-ও বলল, হেরাক্লকে রাজত্বের আসন থেকে না সারানো পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না।

'অপসারণ নয়– যমের হাতে তুলে দিতে হবে'– মুকাওকিস জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন– 'অপসারণ করলে আশঙ্কা আছে, বাহিনীতে বিভক্তি তৈরি হয়ে যাবে এবং গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে। এমনটা হলে মুসলমানরা অতি অনায়াসে পুরোটা মিশর দখল করে নেবে। রোমসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ধরে রাখা সম্ভব হবে যদি হেরাক্লকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়।'

মুকাওকিস স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছেন, হেরাক্লকে হত্যা করতে হবে; তারপর কিবতি খ্রিস্টানদের পক্ষে আনতে হবে। তারপরই কেবল মুসলমানদের প্রতিহত করা যেতে পারে। আলোচনা শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাটায় গিয়ে থামল যে, বিনয়ামিনকে পক্ষে আনা খুবই জরুরি।

মুকাওকিস তখনই তার বিশেষ এক ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে জরুরি কিছু নির্দেশনা দিয়ে বললেন, কাওসের মরুভূমিতে কিবতিদের আস্তানায় চলে যাও। নিজেকে কিবতি খ্রিস্টান দাবি করে বিনয়ামিনের কাছে পৌঁছে যাও। তার কাছে নিজের আসল পরিচয় ব্যক্ত করে বোলো, মুকাওকিস ও কায়রাস আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। তারা হেরাক্ল-এর বানানো খ্রিস্টধর্ম নির্মূলের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এ কাজে তাদের আপনাকে প্রয়োজন।

'হতে পারে, বিনয়ামিন সন্দেহে পড়ে যাবেন এবং কথা বিশ্বাস করবেন না'– মুকাওকিস বললেন– 'তাকে নিশ্চয়তা দেবে এবং বিশ্বাস করাবে, আপনি নির্ভয়ে চলে আসুন। আর যদি গ্রেফতারির আশঙ্কা করেন, তাহলে আপনার যেতে হবে না– কায়রাস এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি একা আসবেন। তার সঙ্গে কোনো ফৌজ থাকবে না।'

লোকটি রওনা হয়ে গেল।

মিশরের অধিপতি, প্রধান জাযক ও রোমান বাহিনীর একজন বিখ্যাত সেনাপতির অন্তরে রোমসম্রাট হেরাক্ল-এর বিরোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যা কিনা এতই তীব্র ছিল যে, তা শত্রুতায় পরিণত হয়ে গেল। হেরাক্ল-এর প্রতি এদের বিরক্তির কারণ স্পষ্ট ছিল। এ সেই হেরাক্ল, যিনি গুটিকতক মুসলমানের হাতে একের-পর-এক পরাজয় বরণ করে গোটা শাম রাজ্যটা তাদের দিয়ে এসেছেন আর এখন বাজিন্তিয়া থেকে এমনভাবে আদেশ পাঠাচ্ছেন, যেন এরা তিনজন কাপুরুষ এবং মনোবল হারিয়ে বসে আছেন। প্রধান বিশপ ও সেনাপতি থিওডোর মুকাওকিসকে বললেন, এখনই হেরাক্ল-এর নামে বার্তা পাঠিয়ে দিন। প্রথমে তাকে বিলবিসের পতন ও আতরাবুনের মৃত্যুর সংবাদ দিন। তারপর তার বার্তার উত্তরে 'ইটের জবাবে পাথর' ছুড়ে দিন।

মুকাওকিস তো আরও বেশি উত্তেজিত, আরও অধিক ক্ষ্যাপা ছিলেন। তখনই তিনি নিজের হাতে বার্তা লিখতে শুরু করলেন। কায়রাস ও থিওডোর তাকে পরামর্শ দিতে থাকলেন। এভাবে তিনজন মিলে সম্রাট হেরাক্ল-এর নামে যে-বার্তাটা তৈরি করলেন, তার ভাষ্য নিম্নরূপ–

'রোমসম্রাট হেরাক্ল-এর নামে, যার সুখ-শান্তি ও জয়ের জন্য আমরা সব সময় প্রার্থনা করি। আপনার বার্তা ঠিক সেই সময় পেয়েছি, যখন আমি ব্যাবিলনে আতরাবুনের লাশের সামনে দণ্ডায়মান। আমার আক্ষেপ লাগছে, আপনাকে আমি ব্যথা দিচ্ছি। কিন্তু এই দুঃসংবাদটা আপনার থেকে লুকোনোর মতো বিষয় নয়। আতরাবুন মুসলিম বাহিনীর উপর সেই সময় আক্রমণটা চালাল, যখন মুসলমানরা বিলবিসকে অবরোধ করে রেখেছিল। গোটা একটা মাস লড়াই

অব্যাহত থাকল। শেষ পর্যন্ত আতরাবুন মারা গেল এবং তার বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেল। মুসলমানরা আমাদের বাহিনীর ব্যাপক প্রাণহানি ঘটাল। আমাদের বহু সৈনিক মুসলমানদের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করল। আতরাবুনের লাশ আমার কাছে আমাদেরই দুজন সৈনিক বয়ে এনেছে। কিন্তু কাজটা তারা নিজেদের উদ্যোগে করেনি। মুসলমানরা অতিশয় অপমানজনক' একটা বার্তার সঙ্গে আমাদেরই লোকদের সাথে লাশটা প্রেরণ করেছে। আপনার বার্তার উত্তর আমি এমন অবস্থায় দিচ্ছি যে, আতরাবুনের লাশ পাশের কক্ষে পড়ে আছে।...

'আপনার বার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আপনি আমাকে খুবই দুর্বল ও কাপুরুষ মনে করছেন। মুসলমানদের সঙ্গে আমি সমঝোতা করতে চেয়েছিলাম। তার পেছনে আমার কোনো দুর্বলতা কার্যকর ছিল না। সব দিক বিবেচনা করে নিজেদের স্বার্থেই আমি এই পদক্ষেপটা গ্রহণ করেছিলাম। আপনি লিখেছেন, আমি যেন বাহিনীর প্রাণহানি না ঘটিয়ে মিশর মুসলমানদের হাতে তুলে দেই। আমি চিন্তা করেছিলাম, বাহিনীটাকে খুনখারাবি থেকে রক্ষা করব এবং মুসলমানরা ফরমা থেকেই ফিরে যাক। আমি আতরাবুনকে হামলা করতে বারণ করেছিলাম। এ আমি অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছিলাম। কিন্তু আতরাবুন আমাকে অমান্য করে এবং আমাকে অবহিত না করে বাহিনী নিয়ে বিলবিস চলে গিয়েছিল। তারপর তা-ই ঘটল, আমি যার আশঙ্কা করছিলাম। মুসলমানরা আতরাবুনের বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলল এবং শক্তপায়ে মোকাবেলা করল। তারপর আতরাবুনের বাহিনীর উপর রাতের বেলা এমন গেরিলা আক্রমণ শুরু হলো যে, তারা ব্যাপক জানি ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি চরম মানসিক ক্ষতিরও শিকার হলো। আমাদের সৈনিকরা মুসলমানদের নামে এমনিতেই আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। এবার তারা আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এটাই ছিল পরাজয়ের কারণ।...

'আপনি লিখেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা গুটিকতক আর আমরা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরাস্ত করতে পারলাম না। আমি আপনাকে সবিনয়ে বলতে চাই, এরা সেই 'গুটিকতক মুসলমান' যারা আপনাকে ও আপনার বাহিনীকে শাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শাম থেকে আমাদের যেকজন সৈনিক প্রাণে রক্ষা পেয়ে মিশর এসেছিল, তাদের মুসলমানদের নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতা ভুতের মতো সওয়ার হয়ে গিয়েছিল। সেই পরাজিত সৈনিকরা মিশর এসে গোটা বাহিনীর মাথায় বুঝ ঢুকিয়েছে, মুসলমানরা মানুষ নয়– জিন, যাদের মোকবেলায় বড়-থেকে-বড় কোনো শক্তিরও দাঁড়াবার সাধ্য নেই। এভাবে বাহিনীর চেতনা

আহত হয়েছে আর এটা-ই আমাদের বাহিনীর পরাজয়ের কারণ। আমি একথা বলার দুঃসাহস দেখাতে চাই যে, এর দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না-বর্তায় আপনার উপর। মনে হচ্ছে, রোমসাগরের ওপারে গিয়ে আপনি সবকিছু ভুলে গেছেন। আপনি জানেন মুসলমান কীভাবে জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করে। এই জযবা আমাদের সৈন্যদের মাঝে কোনোদিনও তৈরি হয়নি; ভবিষ্যতেও তৈরি হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।...

'আমি আপনাকে স্মরণ করাতে চাই, প্রধান বিশপ কায়রাসের হাতে আপনি আপনার খ্রিস্টবাদের বিরোধীদের উপর যে-নিপীড়ন চালিয়েছিলেন, আজ আমাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। মিশরে কিবতি খ্রিস্টানদের সংখ্যা এখন কয়েক লাখ। কিন্তু তারা আমাদের বাহিনীতে আসছেই না। প্রধান বিশপ কায়রাসও এখন নিজের অপকীর্তির জন্য আক্ষেপ করছেন। তার আনুগত্যে আপনি যে-সংশয় ব্যক্ত করেছেন, তা সঠিক নয়। সেই প্রজাদের থেকে তিনি কীভাবে সহযোগিতা আদায় করবেন, যাদের উপর তাকে জল্লাদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল? আপনি লিখেছেন, মিশরের কয়েক হাজার বেদুইন মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে। চিন্তা করুন, তারা আমাদের সঙ্গে কেন যোগ দিল না? তারা হানাদারদের দলে কেন ভিড়ে গেল? আমি নিজে পর্যন্ত তাদের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাদের কাছে কোনো পাত্তা-ই পাইনি। তারা বলছিল, আমরা স্বাধীন; আমরা কারও কথায় চলতে রাজী নই। আমাদের মোকাবেলায় তারা মুসলমানদের বেছে নিয়েছে এবং একটি বাহিনীর আদলে মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে।...

'আমি আপনার মনের প্রশান্তির জন্য বলছি, কিবতি খ্রিস্টানদের দলে ভেড়ানোর জন্য জোরে-শোরে কাজ চলছে। এ ব্যাপারে আমরা চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করছি না। বিনয়ামিনের কাছে আমি একজন দূত পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। বিশপ কায়রাসের দৃষ্টিভঙ্গি এখন অনেক নমনীয়। পরিস্থিতির বাস্তবতা তিনি ভালো করেই বোঝেন। বিনয়ামিন যদি এসে পড়েন, তাহলে আমি তার ও কায়রাসের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে দেব এবং বিনয়ামিনকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসব। তিনি কিবতি খ্রিস্টানদের একটি বাহিনী গঠন করে দেবেন। তারা রোমান বাহিনীতে এসে যোগ দেবে। আমার এই বার্তা যদি আপনাকে আশ্বস্ত করতে না পারে, তাহলে আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন এবং যুদ্ধের ভালোমন্দ নিজেই দেখাশোনা করুন। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা একজনও সাহস হারাইনি এবং আমাদের মনোবল অটুটই আছে।'

মুকাওকিস বার্তাটা সিল-মহর করে একজন দূতের হাতে দিয়ে বলে দিলেন, যত দ্রুত সম্ভব বাজিন্তিয়া চলে যাও এবং এই বার্তাটি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর হাতে পৌঁছিয়ে দাও।

* * *

আসুন, আমরা আবার বিলবিস ফিরে যাই। ওখানে নগরীর ভেতরে ও বাইরে অগণিত লাশ ছড়িয়ে রয়েছে। গুরুতর আহতরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। যাদের চৈতন্য ঠিক আছে, তারা নিজেদের টেনে-টেনে নিরাপদ জায়গার সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম নারীরা আহতদের পানি পান করিয়ে-করিয়ে তুলে নিচ্ছে। বিশাল বিস্তৃত একটা অঞ্চল মানুষের রক্ত পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

এখান থেকেই আতরাবুনের মরদেহটা তুলে নেওয়া হয়েছিল। শারিনা ও আইনি লাশটা মুকাওকিসের উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়ে আপন-আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাদিদ, ফাহাদ ও মাসউদ ওখান থেকে চলে গেছে। অনেক মুসলিম নারী আহতদের তুলে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে পুরুষ মুজাহিদও রয়েছে, যারা সেই আহতদের তুলে-তুলে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে, যারা অচেতন বা দাঁড়াতে অক্ষম।

একজন নারীরও মুখে এমন কোনো অবগুণ্ঠন নেই যে, দেখে তাকে চেনা যায় না। কিন্তু একজন মহিলা তার মুখটা এমনভাবে নেকাবে ঢেকে রেখেছে যে, তার শুধু চোখগুলো দেখা যাচ্ছে। মহিলা হতাহতদের দেখে-দেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাবে মনে হচ্ছে, সে কাউকে খুঁজছে। ওখানে মুজাহিদীন ও তাঁদের নারীরা এতই ব্যস্ত যে, একজন আরেকজনের দিকে তাকাবে এমন ফোরসত কারুর নেই। কোনো জখমি যাতে অধিক রক্তক্ষরণের কারণে শহীদ হয়ে না যায়, সেজন্য তাদের তুলে নিতে তাড়াহুড়া চলছে।

শারিনা ও আইনি দুজন মিলে এক জখমি মুজাহিদকে তুলছিল। মুজাহিদ উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েদুটো তাকে সহায়তা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু জখমি তাদের বারণ করে বললেন, তোমাদের ধরতে হবে না; আমি নিজের শক্তিতেই যেতে পারব। শারিনা দেখল, লোকটি ভালোভাবে হাঁটতে পারছে না। তাই বলল, অযথা নিজের উপর চাপ তৈরি করো না; আমার সাহায্য নিয়েই চলো। আইনিও জখমির অপর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াল এবং নিজের একটা বাহু তার কোমরে রাখল।

'না; বোনেরা আমার!'– মুজাহিদ আইনি ও শারিনা থেকে আলগ হয়ে এবং স্মিত হেসে বলল– 'আমাদের পরের সহায়তায় অভ্যস্ত করো না। আমরা যদি অন্যের সহায়তায় হাঁটতে-চলতে শুরু করি, তাহলে মিশর কে জয় করবে।

তোমরা যাও আর যেসব জখমি অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের তুলে নাও। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমি আপন শক্তিতেই যেতে পারব।'

জখমি চলে গেল। শারিনা ও আইনি অন্যান্য জখমিদের অনুসন্ধানে ছুটে গেল। জখমিদের করুণ আর্তনাদ, আহত ঘোড়াগুলোর ছুটোছুটির কানফাটা আওয়াজ ও রণাঙ্গনের অপরাপর শব্দ-সাড়ার মাঝে শারিনার কানে বাজল, যেন কোনো এক নারী তাকে ডাকছে। শারিনা দাঁড়িয়ে ডানে-বামে তাকাল। সে এক মহিলাকে দেখতে পেল, যার মুখটা নেকাবে আবৃত। শুধু চোখদুটো খোলা।

'শারিনা!'– মেয়েটা কাছে এসে বলল– 'তোমাকে চিনতে আমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়; শারিনা-না?'

'হ্যাঁ; আমি শারিনা'– শারিনা কৌতূহলী চোখে তার পানে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল– 'মুখ থেকে নেকাবটা সরাও; দেখি, তুমি কে। তুমি আমার ভাষায় কথা বলেছ। তুমি মুসলমান নও কি?'

'না'– মেয়েটি বলল– 'আমি আরবিলা। আমরা দুজন পরস্পরকে ভুলতে পারি না।'

'উহ আরিবলা!'– শারিনা আরবিলাকে উভয় বাহুতে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রবল উচ্ছ্বাসের সাথে বলল– 'এখানে তুমি কী করছ? কার সাথে এসেছ? তাড়াতাড়ি বলো। এখানে তোমার একাকি ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়।'

'বজ্জাত আতরাবুনটা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল'– আরবিলা বলল– 'শুনেছি, ও নাকি মারা গেছে। এই খবরে আমি অনেক খুশি হয়েছি। এখানে এক সেনা-অফিসার রাওবাশকে খুঁজছি। পাশাপাশি এটাও নজর রাখছি যে, আতরাবুনের লাশটা যদি কোথায় দেখতে পাই, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাব, আমি মুক্তি পেয়ে গেছি। আর তার লাশের মুখে থুতু ছিটাব।'

আরবিলা শারিনাকে জানাল, আতরাবুন তাকে গণিকা বানিয়ে সঙ্গে রেখেছিল। সে এক যুবক সেনা-অফিসার রাওবাশকে মনে-প্রাণে কামনা করত। রাওবাশও তার জন্য পাগলপারা ছিল। তাদের বিবাহ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এতদিনে হয়েও যেত। কিন্তু আরবিলার উপর আতরাবুনের চোখ পড়ে গেল এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাকে গণিকা বানিয়ে নিল। তার পিতামাতাকে অর্থ-কড়ি দিয়ে; সেই সঙ্গে মন্দ পরিণতির হুমকি দিয়ে তাদের দমিয়ে রেখেছিল। আরবিলার পিতামাতা আগে থেকেই শঙ্কিত ছিল। কারণ, তারা সম্রাট হেরাক্ল-এর সরকারি খ্রিস্টবাদের বিরোধী ছিল এবং কিবতি ছিল। কিবতি খ্রিস্টানদের উপর নেমে-আসা-দুর্যোগ তারা প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে মনের উপর পাথর চাপা দিয়ে তারা মুখ বন্ধ রেখেছিল।

পাঁচ-ছয় মাস আগের কথা। আরবিলা আতরাবুনের জিন্দানখানায় আটক ছিল। মুক্তি পেতে সে অনেক কান্নাকাটি করল, আর্তনাদ করল। কিন্তু আতরাবুনের পিঞ্জরা তাকে ছাড়ল না। এই অবস্থার মধ্যেও সে দু-তিনবার প্রেমিক রাওবাশের সঙ্গে দেখা করেছিল। একবার আতরাবুন ব্যাপারটা টের পেয়ে আরবিলাকে খুব মারধর করল। রাওবাশ যেহেতু রাজপারিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেজন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। অন্যথায় তাকেও এক হাত দেখিয়ে ছাড়ত। কিন্তু মনে তার প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। রাওবাশ তখন এস্কান্দারিয়ায় ছিল। আতাবুন তাকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে সেই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিল, যেটি ফরমা ও বিলবিসে কর্তব্যরত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, এখানকার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে লোকটা মরে যাক।

এবার আতরাবুন বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে এলে আরবিলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে এল। আরবিলা ছাড়া আরও একটা মেয়ে তার সঙ্গে ছিল। মুসলমানরা তো স্ত্রী, বোন ও কন্যাদের সঙ্গে রাখত। কিন্তু রোমান বাহিনীর অফিসাররা গণিকাদের রণাঙ্গনে নিয়ে আসত। আতরাবুন নারীলোলুপ পুরুষ ছিল। আরবিলা কোনোভাবে তথ্য পেয়েছিল, রাওবাশ বিলবিস দুর্গে আছে। সে শারিনাকে বলল, অপর মেয়েটা যদি সঙ্গ দিত, তাহলে দুজনে মিলে আতরাবুনকে বিষ পান করিয়ে বা অন্য কোনোভাবে হত্যা করে ফেলতাম। কিন্তু সে খুবই উৎফুল্ল ছিল যে, আমি এত বড় একজন সেনাপতির গণিকা। ফলে আতরাবুনের মৃত্যুর প্রার্থনা করা ছাড়া আরবিলার জন্য আর কোনো পথ খোলা ছিল না। অবশেষে বিলবিসের চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় তার কানে আওয়াজ এল, আতরাবুন মারা গেছে। রোমান বাহিনীর ছাউনি বিলবিসের রণাঙ্গন থেকে দু-তিন মাইল দূরে ছিল। ওখান যেসব রোমান কর্মচারী প্রভৃতি ছিল, সবাই ওখান থেকেই পালিয়ে গেছে। আতরাবুনের অপর গণিকাও তাদের সঙ্গে চলে গেছে। আরবিলা আতরাবুনের তাঁবুতেই রয়ে গেল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, আমি এতই ভাগ্যবতী হয়ে গেলাম যে, আতরাবুন মরে গেছে!

দীর্ঘ সময় পর আরবিলা তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখতে পেল, এত বড় ছাউনিটায় সে একা। একটা ঘোড়াও ওখানে ছিল না যে, তাতে চড়ে মেয়েটা পালিয়ে যাবে। পালাবার ইচ্ছাও তার ছিল না। অগত্যা সে বিলবিস গিয়ে রাওবাশের সন্ধানে নেমে পড়ল। রণাঙ্গনের মরদেহগুলো ও জখমিদের মাঝে প্রেমাস্পদকে খুঁজতে লাগল। এমনি সময়ে শারিনার উপর তার চোখ পড়ল। শারিনা যখন

তার মায়ের সাথে হেরাক্‌ল-এর প্রাসাদে থাকত, তখন আরবিলা শারিনার কাছে আসত এবং গাল-গল্প করত।

'অনুমান করো শারিনা!'– আরবিলা বলল– 'আমার ভালবাসা দেখো। রাওবাশকে খুঁজতে নেমে আমি চিন্তা-ই করলাম না, মুসলমানরা যদি আমাকে গ্রেফতার করে ফেলে, তাহলে আমার সঙ্গে তারা কীরূপ আচরণ করবে।'

'না আরবিলা!'– শারিনা বলল– ভয় শুধু এটুকুই ছিল যে, তুমি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু যে-ভীতি তুমি মনে লালন করছ, মুসলমানদের এখানে এমন আশঙ্কার কোনোই কারণ নেই। মুসলমানরা শত্রুবাহিনীর যে-নারীদের গ্রেফতার করে, তাদের পেছনে পাঠিয়ে দেয়। কোনো মুসলমান– তিনি যত বড় ক্ষমতাবানই হোন– কোনো নারীকে গণিকা বানাতে পারেন না। তবে নিয়মতান্ত্রিক বিবাহের পর স্ত্রী বানাতে পারেন। বন্দি নারীদের সঙ্গে তারা এই আচরণই করে থাকেন। তুমি যদি ধরা পড়তে, তাহলে তোমার ক্ষতি শুধু এটুকু হতো যে, রাওবাশকে খুঁজতে পারতে না। আচ্ছা আমি একটু চিন্তা করে দেখি, রাওবাশকে তুমি কোথায়-কোথায় খুঁজতে পার।'

'তুমি কি আমার কোনো সাহায্য করতে পার না শারিনা?'– আরবিলা চোখের পানি ছেড়ে বলল– 'আমি তো তোমাকে জিজ্ঞেসই করলাম না, এখানে তুমি কোনভাবে আছ এবং আমাকে কোনো সহায়তা করা তোমার পক্ষে সম্ভব কিনা।'

'হাঁ পারি'– শারিনা বলল– 'এখানে এসেই আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি এবং যার সঙ্গে এসেছি, তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি তোমার উপর শর্ত আরোপ করছি না। তোমাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, রাওবাশের অনুসন্ধানে আমি তোমাকে সঙ্গ দেব। যদি তাকে জীবিত পেয়ে যাই, তাহলে তোমরা দুজন মুসলমান হয়ে যেয়ো। তারপর তোমাদের বিবাহ হয়ে যাবে।

শারিনা আরবিলাকে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যকার পার্থক্য বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিল। বলল, সবচেয়ে বড় কথাটি হলো, মুসলমানদের কাছে রাজপরিবার বলে কিছু নেই। খলীফা-সেনাপতিও নিজেদের অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবেন না। সব শুনে আরবিলা বলল, ঠিক আছে; রাওবাশকে যদি পেয়ে যাই, তাহলে দুজনে মিলে মুসলমান হয়ে যাব।

শারিনা আইনিকে ওখানে রেখে আরবিলাকে নিয়ে দুর্গের ভেতরে চলে গেল এবং যেসব রোমান সৈন্য অস্ত্রসমর্পণ করছিল, শারিনা সবার আগে তাদের মাঝে রাওবাশকে খুঁজতে চাচ্ছে।

* * *

বিলবিস নগরীটা অত্যন্ত মজবুত, চওড়া ও উঁচু প্রাচীরের মাঝে অবস্থিত। প্রাচীরগুলোতেও স্থানে-স্থানে অনেক লাশ পড়ে আছে। তাদের মাঝে আছে সংজ্ঞাহীন জখমিও। অস্ত্রসমর্পণের কাজটা কোথায় সম্পন্ন হচ্ছে শারিনার জানা আছে। সেটা দুর্গের অভ্যন্তরে বিশাল একটা মাঠ। শারিনা সবার আগে কয়েদিদের দেখতে চাচ্ছে। তার ধারণা, রাওবাশ ওখানে থাকতে পারে।

শারিনা ও আরবিলা এখনও উক্ত মাঠ থেকে খানিক দূরে। এমন সময়ে তারা রোমান বাহিনীর একটা দল আসতে দেখল। সংখ্যায় পঁচিশ-ত্রিশজন হবে। তিন-চারজন মুজাহিদ তাদের হাঁকিয়ে মাঠের দিকে নিয়ে আসছে। লোকগুলো তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে হঠাৎ আরবিলা চিৎকার দিয়ে উঠল- 'রাওবাশ!' মেয়েটা লোকগুলোর দিকে ছুটে গেল। রাওবাশ তাদের একজন। শারিনাও আরবিলার পিছনে দৌড়ে গেল। আরবিলাকে দেখে রাওবাশ দলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল।

'ও মিয়া!'- এক মুজাহিদ ধমকে উঠলেন- 'কোথায় যাচ্ছ? দলের সঙ্গে থাকো; তুমি কয়েদি!'

মুজাহিদ যদি রাওবাশকে ধাক্কা দিয়ে দলের মাঝে ঢুকিয়ে না দিতেন, তাহলে রাওবাশ জানতেই পারত না মুজাহিদ কী বলেছে। কারণ, মুজাহিদ আরবিতে কথা বলছিল আর রাওবাশ আরবি বোঝে না। শারিনা আরবিলাকে ওখানেই থামিয়ে দিল এবং বলল, মুখের উপর আগের মতো নেকাবটা ফেলে রাখো।

'তোমরা এখানে কী করছ?'- মুজাহিদ শারিনা ও আরবিলাকে বললেন- 'যাও; গিয়ে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কাজ করো। এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবার দরকার নেই।'

শারিনা তখনই আরবিলাকে নিয়ে ওখান থেকে ফিরে এল এবং দ্রুতপায়ে হেঁটে নগরী থেকে বেরিয়ে এল। কেন জানি মুজাহিদ তাদের জিজ্ঞেস করলেন না, রোমান বাহিনীর ওই অফিসার তোমাদের দেখে কেন দল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। শারিনা আরবিলাকে নিয়ে তার স্বামী হাদিদের কাছে পৌঁছে গেল।

শারিনা হাদিদের কাছে আরবিলাকে পরিচয় করিয়ে দিল এবং ঘটনার বৃত্তান্ত শোনাল। জানাল, রাওবাশকে আমরা যুদ্ধবন্দীদের মাঝে দেখেছি। যদি সে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে এরা দুজনই মুসলমান হয়ে যাবে।

হাদিদ বিষয়টা তার সঙ্গীদের জানাল।

হাদিদ ও তার সঙ্গীরা গোয়েন্দা মুজাহিদ। সেনাপতি আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সঙ্গে তাদের সরাসরি সম্পর্ক আছে। এই ব্যাপারটা সিপাহসালারের সাথে সম্পৃক্ত। শেষ পর্যন্ত বিষয়টা তাঁকেই মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু সময়টা এমন

ছিল যে, তখন সিপাহসালারকে খুঁজে বের করা সহজ ছিল না। নগরী এইমাত্র বিজিত হয়েছে। কে জানে সিপাহসালার কোথায়-কোথায় ঘুরে ফিরছেন। নগরীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সব দিককার খবরাখবর সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কাজ হলো গনিমতের সম্পদগুলো জড়ো করা। নগরবাসীদের যাতে কোনো প্রকার কষ্ট না হয়, কোনো লুটপাট না হয় সেদিকেও তাঁকে কড়া নজর রাখতে হচ্ছে। মুসলমানরা তো লুটমারকে পাপ মনে করেন; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মিশরি বেদুইনরাও আছে, যারা এই অস্থির ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ইসলামি রীতির পরিপন্থী কাজ করে বসতে পারে।

হাদিদ শারিনা ও আরবিলাকে সঙ্গে করে সিপাহসালারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে পাওয়া গেল। একজায়গায় বসে তিনি নগরীর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও নিজের দুজন নায়েবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অপেক্ষা করতে-করতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেল। কিন্তু ওখানে তো কোনো মসজিদ নেই। এক মুজাহিদ দাঁড়িয়ে আযান দিল এবং ওখানেই জামাতের সঙ্গে নামায আদায়ের জন্য সবাই সমবেত হয়ে গেল। সিপাহসালার আমর ইবনে আস সব কাজ ফেলে রেখে নামায পড়াতে এসে হাজির হলেন।

নামায শেষ করে হাদিদ সিপাহসালারের সঙ্গে দেখা করল এবং তাঁকে আরবিলা ও রাওবাশসংক্রান্ত সব কিছু অবগত করল। সিপাহসালার আদেশ জারি করলেন, রাওবাশ নামক রোমান অফিসারকে কয়েদিদের মধ্য থেকে বের করে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনে আস নামাযের অনেক পর যখন তাঁবুতে এলেন, ততক্ষণে রাওবাশ ওখানে এসে উপস্থিত। হাদিদ, শারিনা, আরবিলাও আছে। আমর ইবনে আস চারজনকে তাঁবুতে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এবার ব্যাপারটা খুলে বলো। সবার আগে আরবিলা কথা শুরু করল এবং এমন কাঁদা কাঁদল যে, তার কণ্ঠই রুদ্ধ হয়ে এল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সেকথা-ই বলল, যা শারিনাকে শুনিয়েছিল।

'এখন তুমি চাচ্ছ কী?' আমর ইবনে আস জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমার থেকে শুনুন'– রাওবাশ বলল– 'আপনি যদি মনে করে থাকেন, আমি একজন মজলুম মানুষ এবং আমার মুক্তি দরকার, তাহলে এটা ঠিক হবে না। আমি সেই দেশটিতে আর ফিরে যেতে চাই না, যেদেশে ইজ্জত-সম্ভ্রম নিরাপদ নয় এবং একজন সেনাপতি যা খুশি করে

বেড়ায়। হেরাক্‌ল এমন একজন সম্রাট, যিনি নিজের তৈরি একটি ধর্ম তরবারির জোরে দেশের জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। মুসলামানদের সম্পর্কে আমি বহু কিছু শুনেছি। এসব যদি সঠিক হয়, তাহলে আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। আরবিলাও আশা করি আমার সঙ্গে দ্বিমত করবে না। আমি একজন অভিজ্ঞস সেনা-অফিসার। আমার নানামুখী সেবা আপনাকে নিরাশ করবে না। আপনি যদি আমাদের কয়েদিদের মাঝে রাখতে চান, তাহলে মনে করবেন, একজন মূল্যবান মানুষকে আপনি নষ্ট করছেন। আমি রোমান খ্রিস্টান। রোমান শাসকদের থেকে প্রতিশোধ নিতে মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে আছে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) এত সহজে একজন অমুসলিমের কথায় ভজে যাওয়ার মতো সেনাপতি নন। তিনি লোকটাকে ভালোমতো বাজিয়ে দেখতে চাইলেন। শারিনা বলল, আমি আরবিলাকে ছোটবেলা থেকেই জানি। স্বভাব-চরিত্রে মেয়েটা প্রশংসনীয়া। ওর উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন।

সুদীর্ঘ ও অর্থবহ আলাপচারিতার পর আমর ইবনে আস (রাযি.) সিদ্ধান্ত দিলেন, ঠিক আছে; তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তিনি রাওবাশ আরবিলাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিলেন এবং সাথে-সাথে দুজনের শুভবিবাহও পড়িয়ে দিলেন। আমর ইবনে আস রাওবাশের নাম রাখলেন ফারুক আর আরবিলার নাম রাখলেন ফাতেমা।

আমর ইবনে আস মিশর সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে ব্যবসায়িক কাজে বেশ কবার তিনি মিশর গিয়েছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশি এস্কান্দারিয়া দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যার বিস্তারিত বিবরণ উপরে আলোচিত হয়েছে। এবার তিনি যে-অঞ্চলটায় অগ্রযাত্রা করছেন, সে সম্পর্কেও তাঁর ভালো জানাশোনা আছে। কিন্তু ততখানি নয়, যতখানি তিনি প্রয়োজন অনুভব করছেন। আগে মিশরকে তিনি অন্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এবার এই অঞ্চলটাকে তিনি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাচ্ছেন। তার গোয়েন্দারা তাকে তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে যথেষ্ট মনে করছেন না। এবার রোমান বাহিনীর একজন অফিসার তাঁর হাতে চলে এসেছে। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

'তুমি বাহিনীর একজন অফিসার ফারুক!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'এক-আধটা সেনা-ইউনিটের নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতা তোমার আছে। কিন্তু এখনই আমি তোমাকে কোনো ইউনিটের দায়িত্ব দিচ্ছি না। কিছুদিন তোমাকে আমার গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতে হবে। রাতে গেরিলা আক্রমণের জন্যও আমি তোমাকে পাঠাব। তোমাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করি। এই

মুহূর্তে আমার প্রয়োজন হলো, আমাকে নীলনদ ও তার সম্মুখের আরও কিছু অঞ্চলের তথ্য জানতে হবে। আমি জানি, সামনে দু-তিনটা দুর্গ আছে। কিন্তু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে দুর্গগুলোর ধরন ও অবস্থান আমার জানা দরকার।'

'এসব তথ্য আপনাকে আমার চেয়ে ভালো আর কে জানাতে পারবে?'– ফারুক বলল– 'এখান থেকে অগ্রযাত্রা করলে খানিক দূরে গিয়ে আপনি একটা মরুভূমি পাবেন। তার আগে এমন সবুজ-শ্যামল ও সুদৃশ্য অঞ্চল যে, এমন এলাকা বোধহয় আপনি কখনও দেখেননি। নিলনদের কূলে একটা নগরী আছে উম্মেদানিন, যেটি কিনা দুর্গঘেরা অতিশয় মজবুত একটি শহর। তার একদম কাছাকাছি নদীর ঘাট, যেখানে অনেকগুলো নৌকা ও পালের জাহাজ দাঁড়ানো থাকে। ফেরাউনরা এই নগরীটাকে তাদের রাজধানী বানিয়েছিল। মূলত মিশরের প্রতিরক্ষা এখান থেকেই শুরু। এই দুর্গগুলোতে আপনাকে সাহস ও জযবার কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে আমি বরং বলব, আপনার সঙ্গে যেকজন সৈনিক আছে, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই দুর্গগুলোতে যে রোমান সৈন্যরা আছে, সংখ্যায় তারা আপনার বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি।...

'তবে এই দুর্গে এবং এর সামনের দুর্গগুলোতে যেসব রোমান সৈন্য আছে, তাদের মাঝে এমন একটা দুর্বলতা আছে, যেটা আপনার উপকারে আসতে পারে। তা হলো, আপনার সৈনিকরা যখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন, তখন রোমান বাহিনীর প্রতিজন সৈনিকের চেহারায় ভীতি ও ভীরুতার ছাপ ফুটে ওঠে। আপনি বিলবিস জয় করেছেন। এই জয়ে একটা দুর্গঘেরা মজবুত দুর্গ আর বিপুল পরিমাণ গনিমতই যে আপনার হাতে এসেছে, শুধু তা-ই নয়; বরং এতে আপনার বাহিনী একটি মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে রোমান বাহিনীর উপর ছেয়ে গেছে। রোমান বাহিনীর যেসব সৈন্য বিলবিস থেকে পালিয়ে গেছে, তারা যেখানেই যাবে, সেখানেই আপনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। মোটকথা, যে-চেতনা আপনার বাহিনীর মাঝে আছে, তা রোমানদের মাঝে নেই।...

'উম্মেদানিনের দক্ষিণে মাইলকয়েক দূরে ব্যবিলনের দুর্গঘেরা বিশাল নগরী। আমি আপনাকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পরামর্শ দিচ্ছি, এই দুর্গটা জয় করতে আপনি এই বাহিনীটি নিয়ে যাবেন না। কারণ, এরা নিতান্তই অল্প। আর নগরীতে এত অধিকসংখ্যক সৈন্য আছে যে, তারা যদি বেরিয়ে এসে আপনার বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে আপনার পা উপড়ে যাবে। এই দুর্গের প্রাচীরগুলোর উপর পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিকও স্থাপন করা আছে। এটি আপনার বাহিনীর সমূহ ক্ষতিসাধন করতে পারে। এর প্রাচীরগুলো খুবই

চওড়া ও পাথুরে। ফলে এগুলোতে কোনো ছিদ্র তৈরি করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। এটি ফেরাউনদের নির্মিত দুর্গ, রোমানরা এসে যাকে আরও মজবুত করে তুলেছে। রোমানরা একে দুর্ভেদ্য ও অজেয় দুর্গ মনে করে, যার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না।...

'নদীর ওপারে আরেকটি দুর্গঘেরা নগরী আছে ফাউম। মজবুতির দিক থেকে এটিও কম নয়। উম্মেদানিন ও ব্যবিলন জয় না করে আপনি ফাউম যেতে পারবেন না। কারণ, সোজা ফাউম চলে গেলে ব্যবিলনে এত পরিমাণ সৈনিক আছে, যার একটি অংশ ফাউমের অবরোধ ভাঙার জন্য পেছন থেকে আপনার উপর আক্রমণ করে বসবে। পেছন থেকে জরুরি সাহায্য এসে পৌঁছলেই তবে আপনি ব্যবিলন অভিযানের ঝুঁকি মাথায় নিতে পারেন। এই অঞ্চলগুলোর গুরুত্ব আপনি এভাবে বুঝুন যে, ফেরাউনদের পিরামিডগুলো এই অঞ্চলে অবস্থিত। আবুলহাওলের প্রতিকৃতিও এখানে। ধরে নিন, যিনি এই অঞ্চলটা জয় করে নিলেন, সমগ্র মিশর তার হাতে চলে এসেছে। মুকাওকিস ও আতরাবুন আমাদের মাথায় এই বুঝ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, মুসলমানরা যদি উম্মেদানিন, ব্যবিলন ও ফাউম পর্যন্ত এসে পড়ে, তাহলে এটি রোমানদের জন্য জীবন ও মৃত্যুর লড়াই হবে। যদি রোমানরা হেরে যায়, তাহলে মিশরে তাদের কোনো ঠিকানা থাকবে না। হেরাক্ল শাম থেকে বিদায় গ্রহণের সময় বলেছিলেন, বিদায় তোমাকে হে শাম! এখন আর আমরা তোমার মাঝে কোনোদিনও ফিরে আসতে পারব না। আপনি যদি এই লড়াইয়ে জিতে যান, তাহলে হেরাক্ল মিশরের কূলে দাঁড়িয়ে বলবেন, বিদায় তোমাকে হে মিশর! এখন আর আমি তোমার মাঝে কোনোদিনও ফিরে আসতে পারব না।'

আমর ইবনে আস ফারুকের বক্তব্য গভীর মনোযোগসহকারে শুনতে থাকেন। ফাঁকে-ফাঁকে কিছু প্রশ্ন করেও অনেক কিছু জেনে নিলেন। এভাবে উক্ত অঞ্চলের স্বচ্ছ একটি নকশা তাঁর সামনে চলে এল। পরে তিনি ফারুককে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, কিবতি খ্রিস্টানদের মতিগতি কী? এমন কোনো সম্ভাবনা আছে কি যে, তারা হেরাক্ল-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

'ওদের উপর কখনও আস্থা রাখবেন না'– ফারুক বলল– 'এটা ঠিক যে, কিবতি খ্রিস্টানরা যুদ্ধের সময় রোমান বাহিনীকে সহযোগিতা দেবে না। কিন্তু বিনয়ামিন খুবই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মানুষ। তার মাথায় এই ভাবনাও আছে যে, তিনি যদি হেরাক্লকে ক্ষেপিয়ে তোলেন আর জয় তার বাটে যায়, তাহলে মিশরে তিনি একজন কিবতিকেও জ্যান্ত রাখবেন না। তাছাড়া হেরাক্ল-এর সরকারি খ্রিস্টবাদের বিশপ কায়রাসও অত্যন্ত ধূর্ত ও চালাক মানুষ। তিনি এমন

কৌশল অবলম্বন করবেন যে, কিবতি খ্রিস্টানদের তার ভক্ত বানিয়ে নেবেন। আমি বলতে চাচ্ছি, আপনি কায়রাস ও বিনয়ামিনের রাজনীতি বুঝবার চেষ্টা করুন আর কিবতিদের উপর ভরসা রাখবেন না। ভরসা নিজের সেই বাহিনীটির উপর রাখুন, যারা এ সময় আপনার সঙ্গে আছে সংখ্যায় তারা কম হোক বা বেশি। এটি আপনার নিজস্ব শক্তি। এটিই আপনার কাজে আসবে।

* * *

মদিনা থেকে রওনা-হওয়া সহযোগী বাহিনী এখনও আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে এসে পৌঁছয়নি। তিনি বিলবিস-জয়ের প্রথম রাতেই আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর নামে বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, আমি আরও একটি দুর্গ জয় করে নিয়েছি। এখন সহযোগী বাহিনী ছাড়া এক পা-ও সামনে অগ্রসর হওয়া মানে নিজেদের এমন একটা ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া, যেখানে গোটা বাহিনীর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা-ই বেশি। আমর ইবনে আস (রাযি.) তখনও জানতে পারেননি, সহযোগী বাহিনী মদিনা থেকে রওনা হয়ে গেছে।

পরদিন ফজর নমাযের পর আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর দুজন নায়েব সালার ও তাদের নিম্নস্তরের দায়িত্বশীলদের তলব করলেন। এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক।

'আমার বন্ধুগণ!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমার অনুভূতি আছে, আমি তোমাদের সবাইকে বিরাট এক পরীক্ষায় নিপতিত করছি। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায়ও তো নেই! বাহিনীর সৈনিকদের দৈহিক অবস্থা আমি প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখান থেকে আমাদের অতি তাড়াতাড়ি সামনের দিকে রওনা হয়ে যাওয়া এবং সামনের কোনো একটি দুর্গ অবরোধে নিয়ে নেওয়া দরকার। তোমাদের কেউ হয়ত এও ভাবছ যে, মিশর-অভিযানের বিরোধিতাকারীরা– যাঁদের মাঝে প্রবীণ সাহাবি হযরত ওছমান (রাযি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– বলেছিলেন, আমি এলোপাতাড়ি ঝুঁকির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং এই অভিযানে গোটা বাহিনীকে অজানা ঝুঁকিতে ফেলে মেরে ফেলব। বন্ধুরা! আমার বিরুদ্ধবাদীরা ভুল বলেননি। কিন্তু আমি না জেনে-না বুঝে কোনো ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি না। আমি বুঝে এবং খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়কে সামনে রেখেই তবে ঝুঁকিতে প্রবেশ করি।'

'মহামান্য সিপাহসালার!'– এক সালার বললেন– 'এই মুহূর্তে আমার সম্মুখে সেই বিরুদ্ধবাদীরা নন, যারা মিশর-আক্রমণের বিরোধী ছিলেন। আমাদের

মোকাবেলায় এখন রোমান বাহিনী, যারা সামনের দুর্গগুলোতে বসে আছে। তো এটা কি ভালো হয় না যে, আপনি সেই শত্রুদের কথা আলোচনা করবেন?'

'তুমি আমার হৃদয় থেকে একটা বোঝা নামিয়ে দিয়েছ দোস্ত!'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'আমি বলতে চাচ্ছিলাম, রোমান বাহিনীকে নিঃশ্বাস ফেলার এবং আত্মসংবরণ করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমরা যদি এখানে বসে সাহায্যের অপেক্ষা করতে থাকি, তাহলে রোমানরা ধরে নেবে, আমাদের আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা নেই এবং সংখ্যাল্পতার কারণে রোমানদের বিশাল বাহিনীকে আমরা ভয় পাচ্ছি। এমনও হতে পারে, আমরা যদি এখানে বসে থাকি, তাহলে কোনো একসময় রোমান বাহিনী এসে বিলবিস অবরোধ করে ফেলবে আর তাতে আমাদের রসদ আটকে যাবে। ভেবে দেখো, পিছপা হতে রোমান বাহিনীর জন্য গোটা মিশর পড়ে আছে। কিন্তু আমরা যদি পরাজিত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের কোনো ঠাঁই মিলবে না। আমি রোমান বাহিনীর উপর আমার বাহিনীর প্রভাব বহাল রাখতে চাই। আমরা তাদের এতটুকুও বুঝতে দিতে রাজী নই যে, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এবং কিছুদিন বিশ্রাম না নিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা রাখি না।'

'আমাদের সহযোগী বাহিনীর আশা রাখা উচিত কি-না?' এক সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'সাহায্য আসছে'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'এমনটা মনে করো না যে, সাহায্য আসবে না। তোমরা কি আমীরুল মুমিনীন সম্পর্কে অবগত নও? আমাদের তিনি নিঃসঙ্গ ছাড়বেন না। আমার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত হলো, অগ্রযাত্রা করে আমরা উম্মেদানিনকে অবরোধে নিয়ে নেব এবং পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে এই দুর্গটা জয় করে ফেলব। আল্লাহর সাহায্যে যদি আমরা সফল হয়ে যাই, তাহলে এই ঘাটে দণ্ডায়মান প্রতিটি জাহাজ ও কিশতি আমাদের হবে। তারপর নীলনদ পার হতে আমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না।'

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, পরিস্থিতি ও সাবধানতার দাবি ছিল, আমর ইবনে আস যেন অগ্রযাত্রার ঝুঁকি বরণ না করেন এবং বিলবিসে বসেই সাহায্যের অপেক্ষা করেন। কিন্তু তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসাকারী ও ঝুঁকির সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সিপাহসালার ছিলেন। নিজের উপর তার এতখানি আস্থা ছিল যে, নিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারও কথা শুনতে তিনি রাজী ছিলেন না।

সালার ও কমাণ্ডারগণ কিছু পরামর্শ দিলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) কিছু গ্রহণ করলেন, কিছু প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল।

* * *

ওদিকে মুকাওকিস উম্মেদানিন ও ব্যবিলনে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর আগে মুকাওকিস এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিলেন যে, মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং এত অল্পসংখ্যক সৈন্যের পক্ষে কোনো দুর্গ জয় করা সম্ভব নয়। এই আত্মপ্রবঞ্চনারই ফলে তিনি ফাঁদ পেতেছিলেন যে, মুসলমানদের আরও সম্মুখে আসতে দাও এবং কোথাও বেকায়দায় ফেলে একদম নাস্তানাবুদ করে দাও। কিন্তু ঘটনা যা ঘটল, সবই ঘটল তার ধারণা ও প্রত্যাশার বিপরীত। মুসলমানরা বিলবিসের মতো মজবুত দুর্গটাও নিয়ে নিল, আতরাবুনের মতো দাপুটে সেনাপতিকেও হত্যা করে ফেলল!

আতরাবুনের লাশ আর হেরাক্‌ল-এর বার্তা মুকাওকিসকে আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বের করে দিল। হেরাক্‌ল-এর দরবারি বিশপ কায়রাসও মুকাওকিসের সঙ্গে যোগ দিল। কায়রাস তাকে নিশ্চয়তা নিয়েছিল, বিনয়ামিনকেও সে দলে ভিড়িয়ে নিবে এবং কিবতি খ্রিস্টানদের সমর্থন আদায় করে তাদের পক্ষে রণাঙ্গনে টেনে আনবে। এখন মুকাওকিসের চিন্তা বদলে গেছে। এই দুটা দুর্গঘেরা নগরীকে অজেয় বানাতে তিনি নতুন প্রস্তুতকৃত বাহিনীটিকে ব্যবহার করলেন। উম্মেদানিনেও তিনি অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করলেন। কিন্তু তার বেশিরভাগ মনোযোগ ছিল ব্যবিলনের উপর। তিনি জানতেন, ব্যবিলন যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে মিশরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে।

মুকাওকিস ব্যবিলনে এই যে সেনাসংখ্যা বাড়ালেন, তা শুধু নগরীর প্রতিরক্ষার জন্যই ছিল না। বরং তিনি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন, মুসলমানরা যেখানেই আক্রমণ চালাবে, তিনি ব্যবিলন থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে পেছন থেকে তাদের উপর পালটা আক্রমণ করবেন। সম্মুখে নিরাপত্তাব্যবস্থা কীরূপ সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে নওমুসলিম ফারুক আগেই তা অবহিত করে রেখেছিল। সে আমর ইবনে আসকে ব্যবিলন সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমর ইবনে আস (রাযি.) সেদিকেই অগ্রযাত্রা করছেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) স্রেফ এক দিন অপেক্ষা করলেন। তাও এজন্য যে, বিলবিস নগরীর শৃঙ্খলাবিধান ও অন্য অনেকগুলো কাজ গোছানোর প্রয়োজন ছিল। পরদিনই তিনি বাহিনীকে অগ্রযাত্রার আদেশ দিয়ে দিলেন। রওনার আগে তিনি বাাহিনীর উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, যার সারমর্ম নিম্নরূপ :

'আল্লাহর আদেশ হলো, তোমাদের দীনের শত্রুরা যদি পালাতে উদ্ধত হয়, তাহলে তোমরা তাদের ধাওয়া করো এবং তাদের ঠিকানা তছনছ করে দাও। আমি বুঝি, আমাদের সেনাসংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা

দিচ্ছি, সাহায্য আসছে। মদিনা থেকে সাহায্য এসে পৌঁছাতে খানিক দেরি হয়ে যাবে বটে; কিন্তু মহান আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের সঙ্গে আছে। আমি তোমাদের ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওখানে তোমরা আমার আদেশে নয়– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশে লড়াই করবে। মনে রেখো ইসলামের সৈনিকরা! এখানে যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে কোথাও আমাদের ঠাঁই থাকবে না। এখানকার মাটি, এখানকার তরু-লতা, এখানকার পাথর, এখানকার বালিকণা সবই তোমাদের শত্রু। আল্লাহই একমাত্র তোমাদের ভরসা। তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে যাও।'

মুকাওকিস ব্যবিলনে চলে এসেছেন। মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবরাখবর একের-পর-এক পাচ্ছেন তিনি। মুসলিম বাহিনী যখন উম্মেদানিনের দিকে যাচ্ছিল, তখন তারা খেয়ালই করল না, একটু-একটু ব্যবধানে দু-একজন লোক আসা-যাওয়া করছে। বাহ্যিকভাবে তাদের সাধারণ মানুষই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ছিল তারা মুকাওকিসের গোয়েন্দা, যারা মুজাহিদ বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল যে, তারা কোনদিকে যাচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা কত।

মুজাহিদদের সংখ্যা আরও অনেক কমে গেছে। বিলবিস লড়াইয়ে তারা শহীদও হয়েছেন, গুরুতর আহতও হয়েছেন। সাধারণ জখমিরা বাহিনীর সঙ্গে যাচ্ছে। তাদের মাঝে কতিপয় এমন আছে, যাদের বলা হয়েছিল, তোমরা এই অভিযানে এখন যেয়ো না; সুস্থ হলে পরে এসো। কিন্তু তারা বাহিনীর সঙ্গ ত্যাগ করা ভালো মনে করল না। বোঝাতে চেষ্টা করল, যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের আছে এবং পিছিয়ে থাকতে চাই না।

সংখ্যাটা বেশি কমে যাওয়ার আরও একটি কারণ হলো, কিছু মুজাহিদকে বিলবিস রেখে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। নগরীর শৃঙ্খলাবিধানের পাশাপাশি সরকারি নানা কাজও ছিল, যেগুলো আঞ্জাম দিতে লোকের প্রয়োজন ছিল। ওখানে বিশ হাজার বন্দি ছিল, যাদের পাহারার জন্যও কিছু মুজাহিদকে রেখে যেতে হলো।

মুজাহিদ বাহিনী কতদিন পর উম্মেদানিন পৌঁছেছিল, তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। নগরীটা বেশি দূরে ছিল না। দিনকতক সময় লেগেছিল বোধহয়। উম্মেদানিন পৌঁছে তারা নগরীটা অবরোধ করে ফেলল। মুসলমানদের দু-চারজন গোয়েন্দা আগে থেকেই এই নগরীতে উপস্থিত ছিল। বাহিনী নগরীর কাছাকাছি পৌঁছার আগেই তারা নগরী থেকে বেরিয়ে এল। কারণ, অবরোধ হয়ে গেলে ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা আর বেরুতে পারবে না। সিপাহসালারকে তাদের জরুরি তথ্যাদি পৌঁছাতে হবে। তারা আমর ইবনে

আসকে জানালেন, নগরীতে রসদ ও পানির সংকট আছে। এই দুটি জিনিস বাইরে থেকে ভেতরে যায়। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর জন্য এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রসদের পথ বন্ধ করে দিলেন এবং পানির সরবরাহও আটকে দিলেন।

আমর ইবনে আস আগেই জেনেছেন, তিনি যখন উম্মেদানিনকে অবরোধে নিয়ে নিবেন, তখন ব্যবিলন থেকে রোমান বাহিনী বেরিয়ে এসে অবরোধের উপর আক্রমণ চালাবে। আমর ইবনে আস-এর সঙ্গে যে-কজন সৈনিক আছে, তারা অবরোধের জন্যই যথেষ্ট নয়। কিন্তু এই গুটিকতক সৈনিকদের এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে, যাতে অবরোধ বহাল রেখে বহিঃআক্রমণেরও মোকাবেলা করা যায়। সেজন্য অবরোধ করে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে দুদিকেই চোখ রাখতে হলো।

প্রায় সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক লিখেছেন, প্রতিক্ষণেই আশঙ্কা ছিল, মুকাওকিস ব্যবিলন থেকে একদল সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না, যার কারণ কেউ খুঁজে বের করতে পারেননি। ব্যবিলনের অবস্থান ছিল উম্মেদানিন থেকে দক্ষিণে মাইলকয়েক দূরে। ইতিহাসে সঠিক দূরত্ব লেখা নেই। তবে দশ থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে ছিল।

খ্যাতনামা অমুসলিম ঐতিহাসিক এলফার্ড বাটলার লিখেছেন, ব্যবিলন থেকে মুকাওকিস বাহিনী বের করেননি, যার কারণ এছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, আতরাবুনের পরিণতি তার চোখের সামনে ছিল। আতরাবুন বিলবিস অবরোধের সময় পেছন থেকে গিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। মুকাওকিস মনে করতেন, মুসলমানদের খোলা মাঠে পরাজিত করা সম্ভব নয়। নিজের বাহিনীর মনোবলও তার জানা ছিল। ইতিহাসে এসেছে, রোমান বাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এই অল্প কজন মুসলমান কোন সাহসে, কোন ভরসায় উম্মেদানিন অবারোধ করল!

* * *

উম্মেদানিনে রোমানদের যে-বাহিনীটা ছিল, তারা সেই বিশেষ ধারাটি-ই অবলম্বন করল, যেটি ফরমা ও বিলবিসের প্রতিরক্ষায় গ্রহণ করেছিল। দু-তিন দিন পরপর তারা নগরীর দু-তিনটা ফটক খুলে দিত আর রোমান বাহিনীর কয়েকটা ইউনিট বাইরে বেরিয়ে এসে অবরোধের উপর হামলা চালাত। কিন্তু দৃঢ়পায়ে মোকাবেলা না করেই ফিরে যেত এবং নগরীর দ্বারা বন্ধ হয়ে যেত।

এখানে আমর ইবনে আস (রাযি.) যে-কৌশল অবলম্বন করলেন, তা হলো, তিনি তাঁর বাহিনীকে বলে দিলেন, ভেতর থেকে রোমান বাহিনী বেরিয়ে এলে তোমরা এগিয়ে গিয়ে মোকাবেলা করো না কিংবা দৃঢ়পদে মোকাবেলা করো না এবং যত বেশি সম্ভব তির ছোড়ো। এর রহস্যটা হলো, আসলে তিনি তাঁর সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছিলেন। তিনি বিরাট এক ঝুঁকির মধ্যে লাফিয়ে পড়েছেন বটে; কিন্তু মস্তিষ্ক তাঁর ঠিকই কাজ করছিল। তিনি পুরোপুরি সতর্ক ছিলেন এবং রণকৌশল অনুপাতেই যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। তাঁর তিরন্দাজির কৌশল বেশ সফল হলো। ভেতর থেকে রোমানদের এক-একটা ইউনিট বেরিয়ে আসত আর তিরন্দাজ মুজাহিদরা পিছনে সরতে-সরতে তাদের উপর তিরের বৃষ্টি বর্ষণ করত। এভাবে প্রতিবারই রোমান বাহিনী বেশ কজন করে সৈনিককে বাইরে রেখেই ফিরে যেতে বাধ্য হতো।

এমনি তিন-চারটা আক্রমণ ভেতর থেকে এল আর মুসলমানরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সেসবের মোকাবেলা করল। তারপর হঠাৎ একদিন এক আরবি অশ্বারোহী এসে আমর ইবনে আস (রাযি.)কে সংবাদ জানাল, সহযোগী বাহিনীর একাংশ এক-দুদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে। আমর ইবনে আস খবরটা বাহিনীকে শুনিয়ে দিলেন, সাহায্য আসছে। শুনে মুসলমানদের মাঝে নতুন উদ্যম ও সজীবতার ঢেউ খেলে গেল।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বরাতে সহযোগী বাহিনীর যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, চার হাজারের এই পুরো বাহিনীটি একসঙ্গে এসে পৌঁছায়নি। তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে এসেছিল। এ-ও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাহিনীর উভয় অংশের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ছিল। অপর অংশ বেশ কদিন পর এসে পৌঁছেছিল। এই সহযোগী বাহিনীটির মোট সেনাসংখ্যা চার হাজার ছিল। কিন্তু কোন অংশে কতজন ছিল তা জানা যায়নি। বাহিনীর প্রায় সবকজন সৈনিকই অশ্বারোহী ছিল।

দু-তিনদিন পর বাহিনীর প্রথম অংশ পৌঁছে গেল। নগরীর প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে রোমান বাহিনী যখন মুসলমানদের সহযোগী বাহিনী আসতে দেখল, তখন তাদের উপর হাতাশা ছেয়ে গেল। তাদের মনোবল যতটুকু ছিল, তাও উবে গেল এবং বাইরে বেরিয়ে আক্রমণের ধারা কমিয়ে দিল। এই আক্রমণগুলোতে আগেই মুসলমান তিরন্দাজরা তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল এবং তাদের বিপুলসংখ্যক ঘোড়া মুসলমানদের হাতে চলে এসেছিল।

অবরোধের বয়স এক মাসেরও বেশি হয়ে গেছে। এই অবস্থায় জানা সম্ভব হয়নি, ভেতরে রসদ ও পানির অবস্থা কী। কিন্তু আমর ইবনে আস (রাযি.)

অবস্থাদৃষ্টে ধরে নিলেন, নগরীতে ইতিমধ্যে বাহিনীর রসদ-পানির বেশ ঘাটটি দেখা দিয়েছে এবং এটি রোমানদের জন্য বিরাট সমস্যা তৈরি করে ফেলেছে।

একদিন আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর সালারদের বললেন, দুর্গের উপর একযোগে আক্রমণ করো এবং ফটক ভাঙার চেষ্টা চালাও। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসী আক্রমণ আন্ধা-ধোন্ধা করা যায় না। তিরন্দাজদের এতখানি কাছে চলে যেতে আদেশ দেওয়া হলো, যেখান থেকে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রোমান বাহিনীকে তিরের আওতায় আনা সম্ভব। ব্যবিলন থেকে বাহিনী আসবারও আশঙ্কা ছিল। এ ব্যাপারে যথাসময়ে তথ্য জানানোর জন্য ব্যবিলনের পথে গোয়েন্দা পাঠিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়লে তারা তথ্যটা সময়ের আগে সিপাহসালারকে পৌঁছিয়ে দেবে। তাছাড়া আমর ইবনে আস (রাযি.) তিন-চারটা গেরিলাদলও পাঠিয়ে রেখেছেন। উপযুক্ত জায়গা দেখে তারা স্থানে-স্থানে ওঁত পেতে বসে থাকবে আর যদি দেখে ব্যবিলন থেকে বাহিনী আসছে, তাহলে মওকামতো তাদের উপর ডান-বাম থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ চালাবে। হাদিদ, মাসউদ ও নওমুসলিম ফারুককে এই গেরিলা ইউনিটগুলোতে বিশেষভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। গেরিলা আক্রমণে এরা বিশেষভাবে পারদর্শী।

এদিকে আমর ইবনে আস (রাযি.) দুর্গের উপর আক্রমণের আদেশ দিলেন, ওদিকে নগরীর দু-তিনটা ফটক খুলে গেল এবং রোমান বাহিনী আক্রমণের জন্য বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো বাইরে বেরুতে লাগল। পুরোটা বাহিনীর তো আর একবারে বেরুনো সম্ভব নয়। ফটক দিয়ে একসঙ্গে দু-তিনটা ঘোড়া বেরুতে পারে। আমর ইবনে তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে গোটা বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন।

ইতিহাসে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, এই আক্রমণে আমর ইবনে আস (রাযি.) সবার সামনে ছিলেন।

যেকজন রোমান সৈন্য বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, তারা নগরীর প্রাচীর ও তীব্র বানের মতো ধেয়ে আসা মুজাহিদদের মাঝে পিষে গেল। যারা এখনও বের হচ্ছিল, তারা ফটক থেকেই ফিরে যেতে শুরু করল। মুজাহিদরা তাদের ফটক বন্ধ করার সুযোগ না দিয়ে তাদেরই পেছনে-পেছনে নগরীতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু তারা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে চলে গেল। কারণ, তাদের সংখ্যা ছিল কম। তাছাড়া সব কজন মুজাহিদ তো আর একত্রে ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। তিরন্দাজ মুজাহিদরা তাদের পজিশন সামলে নিল এবং প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রোমান সৈন্যদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল। সিপাহসালার আমর ইবনে

আস (রাযি.) স্বয়ং ফটকের কাছে চলে গেলেন এবং একটা কুড়াল নিয়ে নিজহাতে ফটকের উপর আঘাত হানলেন। প্রথম আঘাতের পর এক মুজাহিদ তাঁর হাত থেকে কুড়ালটা নিয়ে কোপাতে শুরু করলেন। দেখতে-না-দেখতেই মুজাহিদরা ফটক ভেঙে ফেলল।

এ ক্ষেত্রে সেই আতঙ্ক খুবই কাজ দিল, যেটা আগে থেকেই রোমান বাহিনীর উপর ছড়িয়ে ছিল। এবার যখন মুজাহিদরা দুঃসাহসী আক্রমণ করে বসল, তাতে ভীতি আরও বেড়ে গেল এবং নগরীতে অস্থিরতা ও হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। সেনাদের মাঝে রণেভঙ্গ দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়ে গেল। রোমান বাহিনীতে আগে থেকে চাউর ছিল, মুসলমানদের মাঝে এমন কোনো রহস্যময় শক্তি আছে যে, সংখ্যায় তারা যতই অল্প হোক কয়েকগুণ বেশি শক্তিধর শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করে ফেলে। এবার এই বাহিনী মুসলমানদের দুঃসাহসিকতা ও নির্ভীকতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

রোমান বাহিনী যদি সাহস হারানোর পরিবর্তে ফটকগুলোর সম্মুখে পা জমিয়ে দাঁড়িয়ে যেত, তাহলে অগ্রসরমান মুজাহিদদের ফটকেই কেটে ছুড়ে ফেলতে সক্ষম হতো। কিন্তু তারা হাত-পা ছুড়ে বসে পড়ল। আমর ইবনে আস (রাযি.) আদেশ জারি করলেন, কোনো সাধারণ নারী বা পুরুষের গায়ে হাত তোলা যাবে না এবং কোনো সৈনিককে জীবিত রেখো না। তিনি কোনো কয়েদি নিতে রাজী নন। বেশ কিছু সময় গণহত্যা চলতে থাকল। দুর্গ মুসলমানদের হাতে চলে এল। লড়াই শেষ হওয়ার পর কয়েকজন রোমান সৈনিক লুকিয়ে বেরিয়ে এল বা অনুসন্ধান চালিয়ে বের করা হলো। তাদের জন্য আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর মনে মায়া জাগল। তিনি আদেশ দিলেন, এদের গ্রেফতার করে নাও।

আমর ইবনে আস (রাযি.) প্রাচীরের উপরে উঠে বাইরের দিকে তাকালেন। ব্যবিলনের দিক থেকে রোমান বাহিনী এলে তাদের প্রতিহত করতে যে-মুজাহিদদের নিয়োজিত করে রেখেছিলেন, তাদের অবস্থা জানতে চেষ্টা করলেন। তারা ভালো ও নিরাপদ আছে। কোনো রোমান বাহিনী আক্রমণের জন্য আসেনি।

বাটলার কয়েকজন আরব ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, এই আক্রমণ খোদ মুজাহিদদের জন্য এতই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল যে, একে আত্মঘাতী আক্রমণ বলা ভুল হবে না। ঝুঁকিটা এত বেশি ছিল যে, এমন দুঃসাহসী বাহিনীর কোনো-কোনো মুজাহিদ সামনে এগুতে ভয় পেতে শুরু করছিলেন। তাঁদের ভাবগতিতে অলসতা ও পিছুটান স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বাটলার লিখেছেন, সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে মুজাহিদদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হলো। তিনি

সমগ্র বাহিনীতে ঘুরে-ফিরে ক্ষোভের সাথে আদেশ দিলেন, আগে বাড়ো। এক মুজাহিদ বললেন, আমরা তো আর লোহার তৈরী নই। জবাবে আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁকে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।

ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল লিখেছেন, ইতিহাসে এমন কোনো বর্ণনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। হতে পারে, অন্য কোনো লড়াইয়ে এমনটা ঘটেছিল। উম্মেদানিনের যুদ্ধে এমন ঘটনা একেবারেই ঘটেনি। অবশ্য এমন ঘটেছিল যে, কিছু সাহাবাও এই বাহিনীতে শামিল ছিলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর পুরোপুরি অনুভূতি ছিল, বাহিনীটিকে তিনি নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। ফলে তিনি সাহাবাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আপনারা আমার সঙ্গে আছেন। মহান আল্লাহ আপনাদের উসিলায় আমাদের বিজয় দান করবেন।'

এই মন্তব্য শুনে সাহাবগণ আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সঙ্গে পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দমের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের দেখে বাহিনীতে নতুন জোশ তৈরি হয়ে গেল। আর এই জোশেরই ফলে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ উম্মেদানিনের মতো দুর্গ– যেখানে বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনার সমাবেশ ছিল– জয় করে ফেললেন।

মুকাওকিস সে-সময় ব্যবিলনে ছিলেন। ইতিহাস বিস্মিয়ে হতবাক যে, উম্মেদানিনে তার বাহিনীর গণহত্যা চলছে আর তিনি এমন বিশাল বাহিনী নিয়ে ব্যবিলনে বসে আছেন! অথচ তার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিল, যদি উম্মেদানিনের উপর আক্রমণ হয়, তাহলে ব্যবিলন থেকে বাহিনী নিয়ে তিনি সেই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেবেন।

উম্মেদানিন থেকে পালিয়ে কিছু রোমান সৈনিক ব্যবিলন পৌছে গেল। তারা মুকাওকিসকে উম্মেদানিনের ঘটনার বৃত্তান্ত জানাল। এক তো উম্মেদানিনের উপর মুসলমানদের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তদুপরি ওখানে যে-বাহিনীটা ছিল, তাদের অধিকাংশ প্রাণ হারিয়েছে। যে-কজন সৈনিক লুকিয়ে ছিল, শুধু তারা-ই প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। তবে তারাও এখন মুসলমানদের কয়েদি। মোটের উপর তার অর্থ দাঁড়ায়, এই যুদ্ধে রোমানদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ইতিহাসে এসেছে, মুকাওকিস যখন ঘটনার বিবরণ শুনলেন, তখন তার শরীরটা একদম নিথর হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছু সময় মুখটা হাঁ করে বিস্ফারিত চোখে সংবাদদাতার পানে তাকিয়ে থাকলেন, যেন তার মাথায় ধারণা-ই ছিল না, মুসলমানরা উম্মেদানিন জয় করে নিতে পারে। খবরটা তার বোধশক্তিকে বেকার করে দিয়েছিল। যদি তিনি মনোবল অটুট রাখতেন এবং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা

করতেন, তাহলে তার কাছে এত সৈন্য ছিল যে, তখনই গিয়ে উম্মেদানিনকে অবরোধ করে ফেলতেন। তাতে দুর্গ জয় হতো আর না হতো, এতটুকু লাভ অবশ্যই হতো যে, মুসলমানরা উম্মেদানিনে অবরুদ্ধ হয়ে বসে থাকত।

উম্মেদানিনের আরও কিছু সৈনিক ও সাধারণ নাগরিক পালাতে সক্ষম হয়েছিল। ব্যবিলন পৌঁছে তারা ওখানকার বাহিনীকে ইসলামের সৈনিকদের নির্ভীকতার এমনসব কাহিনী শোনাল যে, সবাইকে বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত করে তুলল। সৈন্যরা যখন শুনল, মুসলমানরা তাদের বাহিনীর একজন অফিসার-সৈনিককেও জ্যান্ত রাখেনি, ভয়ে তাদের শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। ওখান থেকে পালিয়ে-আসা-সৈনিকরা বলল, মুসলমানরা জিন-ভূতের মতো দুর্গে প্রবেশ করেছিল। তাদের মানুষের আকৃতিতে দেখেও কোনো রোমান সৈন্য বিশ্বাস করতে পারছিল না, তারা মানুষ। আজকের মনস্তত্ত্ববিদ্যার পরিভাষায় বলা উচিত, ইসলামের সৈনিকরা রোমান বাহিনীর উপর মনস্তাত্ত্বিক বিজয় অর্জন করেছিল। আর এমন বিজয় আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা-ই লাভ করতে পারে।

মুকাওকিস উম্মেদানিনের বেদনা সহ্য করার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় এক গোয়েন্দা এসে সংবাদ জানাল, মুসলমানরা নীলনদ পার হয়ে পিরামিড অঞ্চল হয়ে আরও সম্মুখে এগিয়ে গেছে। এই পুরোটা অঞ্চল রুক্ষ মরুপ্রান্তর ছিল। শুনে মুকাওকিস প্রথমত অবাক হলেন, মুসলমানরা নদীটা পার হলো কীভাবে! তারপর এই ভাবনায় হারিয়ে গেলেন যে, ওরা যাচ্ছেটা কোথায়! ইতিহাসের ভাষ্যমতে তখন আতরাবুনের পর বিখ্যাত সেনাপতি থিওডোর মুকাওকিসের সাথে ছিল। থিওডোর মুকাওকিসের আস্থাভাজন সেনাপতি ছিল। দুজন বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন মুসলমানদের এবারকার টার্গেট কী হতে পারে।

মুসলমানরা কি এস্কান্দারিয়া আক্রমণ করতে যাচ্ছে? এই প্রশ্নটা সামনে রেখে দুজন আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, মুসলমানদের এই সিপাহসালার এমন ভয়ংকর বোকামিটা করবেন না। ততক্ষণে মুকাওকিস ও থিওডোর আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর রণকৌশল বুঝে ফেলেছেন। তারা তখনই একজন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন, গিয়ে দেখে আসো; মুসলমানদের গতি কোন দিকে।

অল্প সময়ের মধ্যেই তথ্য বেরিয়ে এল, মুসলমানদের গতি ফাউমের দিকে। বাস্তবতাও এটিই ছিল যে, আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর পরবর্তী টার্গেট ফাউমই ছিল। ফাউম ছিল বড়সড় একটা লোকালয়। এলাকাটা মরুভূমি ছিল বটে; কিন্তু তরিতরকারি ও গবাদিপশুর প্রাচুর্য ছিল। বাহিনীর জন্য আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর রসদ সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল।

মুসলমানদের নীলনদ পার হওয়া মুকাওকিসের জন্য বিস্ময়ের কারণ ছিল। এটি মুসলমানদের বিশেষ দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। উম্মেদানিন দখল করার পর তারা দু-তিন দিন নগরীর শৃঙ্খলা পুনর্বিন্যাসের কাজে ব্যয় করলেন এবং বাহিনীকে একটুও বিশ্রামের সুযোগ দিলেন না। উম্মেদানিন একটি সামুদ্রিক ঘাঁট ছিল, যাকে কেউ জেটি লিখেছেন, কেউ লিখেছেন বন্দর।

এই বন্দরে ছোট ও মাঝারি আকারের অনেকগুলো পালের জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট-বড় নৌকার তো কোনো শুমারই ছিল না। উম্মেদানিনের লড়াই শেষ হওয়ার আগেই হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) ক্ষুদ্র একটি ইউনিট বন্দরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব দিলেন, ওখান থেকে কোনো জাহাজ বা নৌকা যেন বের হতে না পারে এবং তাদের মাঝি-মাল্লারাও যেন উপস্থিত থাকে। এভাবে তিনি জাহাজ-নৌকার পুরো বহরটা কব্জা করে ফেললেন।

মাত্র দুদিন পর বাহিনীকে কোনো বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে আমর ইবনে আস একদম নীরবে রাতের বেলা জাহাজ ও নৌকাগুলোতে চড়ে বসলেন এবং নীলনদ পার হয়ে গেলেন। তাঁদের নামিয়ে দিয়ে জাহাজ-নৌকাগুলো ওপারে নোঙর করে বসে থাকল। ওদিকে মুকাওকিস সংবাদ পেয়ে গেলেন, মুসলমানরা ফাউমের দিকে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষার জন্য তিনি কয়েক ইউনিট সৈন্য উক্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। এলাকাটা সমতল বা মাঠের মতো ছিল না। ওখানে গভীর ও প্রশস্ত নিম্নাঞ্চলও ছিল। ছিল টিলা-টিপিও। এভাবে আত্মগোপনের চমৎকার প্রাকৃতিক ব্যাবস্থাপনা ছিল যে, গেরিলারা অতি সহজে ওঁত পাততে পারত।

মুকাওকিস বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন বটে; কিন্তু তাদের কঠোরভাবে বলে দিলেন, খবরদার! কোনো অবস্থায়ই খোলা মাঠে মুসলমানদের মুখোমুখি হয়ো না। কারণ, খোলা মাঠে লড়াই করে তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না। তিনি বললেন, আরবের মুসলমানরা মরুভূমির সন্তান। যখনই তারা মরুভূমিতে প্রবেশ করে, সঙ্গে-সঙ্গে তাদের দৈহিক ও আত্মিক শক্তি পুরোপুরি সজাগ হয়ে যায়।

* * *

মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিশরি বেদুইনরাও ছিল। প্রথম-প্রথম এসে যখন তারা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তখন তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তোমরা লোকালয়ে গিয়ে বাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহ করে আনবে। একাজটি তাদের উপর একাধিকবার সোপর্দ করা হয়েছিল এবং তারা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে কাজটি আঞ্জাম দিয়েছিল। আমর ইবনে আস (রাযি.) যখন

ফাউম গেলেন, তখনও বাহিনীর রসদের প্রয়োজন ছিল। এখানেও সিপাহ্সালার দায়িত্বটা তাদের উপর ন্যস্ত করলেন। বেদুইনরা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মরুবসতিগুলোর দিকে চলে গেল। বসতিগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ওখানে গিয়ে মরুর পরিধি শেষ হয়ে সবুজ অঞ্চল শুরু হয়ে গেছে। ওখানে ঘরে-ঘরে বিপুল পরিমাণ তরিতরকারি, ভেড়া-বকরি ও গবদিপশুর ছিল।

বেদুইনরা এবারও লোকালয়গুলোর উপর গেরিলা আক্রমণ শুরু করে দিল। কিন্তু ধারাটা আগের চেয়ে খানিক ব্যতিক্রম। এবার তারা চেষ্টা করছে, যেন তাদের হাতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটে। এলাকায় গিয়ে তারা ঘোষণা করে দিত, বাহিনীর জন্য তরিতরকারি ও গবাদিপশুর প্রয়োজন। যদি তোমরা আপনা থেকে এই জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করে না দাও, তাহলে ঘরে-ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সর্বশেষ দানাটি পর্যন্ত তুলে নিয়ে যাব; একটা পশুও তোমাদের জন্য রেখে যাব না। বেদুইনরা লোকদের এই নিশ্চয়তাও দিত যে, এটি মুসলমানদের বাহিনী, যারা মিশরে বিজয় অর্জন করবে এবং মিশরের শাসনক্ষমতা তাদের হাতে চলে আসবে। তারা এসব পল্লী-গ্রামের চিত্রই পালটে দেবে। তোমাদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এরা রোমান রাজাদের মতো রাজা নন। এরা কারও অধিকার ছিনতাই করে না। বেদুইনরা আরও বলত, মুসলমানরা তোমাদের এক-একটি শস্যদানা ও এক-একটি পশুর মূল্য পরিশোধ করে দেবে।

দেখতে-না-দেখতেই বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য ও তরিতরকারির স্তূপ জমা হয়ে গেল এবং ভেড়া-বকরি ও গবাদিপশু এতসংখ্যক এসে দাঁড়িয়ে গেল, যা বাহিনীর জন্য বেশ কদিনের জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই বেদুইনদের দ্বারা মুসলমানদের একটা উপকার তো এই হয়েছিল যে, তারা রসদ সংগ্রহ করে দিত। একাজে তারা বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি তারা যুদ্ধেও অংশ নিত। এখন তারা নিয়মতান্ত্রিক বিন্যাসে লড়াই করা শিখে ফেলেছে। ফাউম গিয়ে বাড়তি একটি উপকার এই হলো যে, ওখানেও তাদেরই মতো মিশরি বেদুইনদের বাস ছিল। উভয়ে একই জাতের হওয়াতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে শত্রু মরে করেনি। ফলে অভিযান খুব সহজেই সফল হয়ে গেল।

বেদুইনদের একটা গেরিলা ইউনিট কোনো এক লোকালয়ে গেল। ওখানে কতিপয় বেদুইন বাস করত। তারা এদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেন এই দস্যুবৃত্তি করছ? বাহিনীর বেদুইনরা বিস্তারিত বলে বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে দিল, এটি দস্যুবৃত্তি নয়। আমরা আরবের মুসলমান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছি। তারা মিশর জয় করে নেবে।

'যেহেতু তোমরাও আমাদেরই মতো বেদুইন, তাই তোমরা সাবধান করা কর্তব্য মনে করছি'– ফাউমের বেদুইনদের এক সদস্য বাহিনীর বেদুইনদের বলল– 'তোমরা এই বসতিতে এসেছ ভালো করেছ; কিন্তু এর সামনে আর যেয়ো না। সামনের বসতিগুলোতে রোমান বাহিনী এসে পড়েছে, যাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তোমরা এই গুটিকতক সৈনিক তাদের এক আক্রমণেই পিষে যাবে।'

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর বাহিনীর বেদুইনরা তাদের থেকে ব্যাপারটা বিস্তারিত জেনে নিল, ওরা এখান থেকে কত দূরে, সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা বা তাদের পজিশন ও মতিগতি কী। তথ্যগুলো তারা সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে জানিয়ে দিল। আমর ইবনে আস (রাযি.) রোমান বাহিনীর আগমন সম্পর্কে বিলকুলই বেখবর ছিলেন। এই অঞ্চলে তিনি একজন গোয়েন্দাও পাঠাননি; পাঠানোর প্রয়োজনই বোধ করেননি। তাঁর ধারণা-ই ছিল না, রোমান বাহিনী এদিকে আসতে পারে। এখন তিনি সংবাদ পেলেন, রোমান বাহিনী এসে পড়েছে। ফলে তিনি তাঁর বাহিনীকে ওখান থেকে ফিরে আসার আদেশ দিলেন। রোমানদের এই বাহিনীর সঙ্গে তিনি সংঘাতে জড়াতে চাচ্ছেন না। কারণ, তাঁর হিসাবে এটি অনর্থক লড়াই হবে। এই শক্তিটা তিনি কোনো দুর্গঘেরা নগরীর উপর ব্যয় করা ভালো ও লাভজনক মনে করছেন।

পরে মুজাহিদ বাহিনী সাময়িকের জন্য একস্থানে ছাউনি ফেলল। দু-তিনজন বেদুইন ছাউনির পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তারা মুজাহিদ বাহিনীর সাথে বেদুইন লোকদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বাহিনীর বেদুইনরা তাদের মেহমান বানিয়ে ছাউনিতে নিয়ে গেল এবং বেশ খাতির-যত্ন করল।

এর বেদুইনরাও জিজ্ঞেস করল, এই বাহিনীটা কাদের এবং তোমরা বেদুইনরা এদের সঙ্গে কেন? বাহিনীর বেদুইনরা তাদেরও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

'একটা কথা মনোযোগসহকারে শুনে রাখো'– এক বেদুইন অতিথি বলল– 'রোমান বাহিনীর বিশাল একটা দল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা দেখে এসেছি, তারা সোজা পথে আসছে না; বরং মরুভূমির নিচু অঞ্চল দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে এবং লম্বা-চওড়া টিলার আড়ালে-আড়ালে অগ্রসর হচ্ছে, যাতে তোমাদের অজান্তে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে।'

বাহিনীর বেদুইনরা এই অতিথি বেদুইনদের একজন সালারের কাছে নিয়ে গেল। সালার এদের থেকে রোমান বাহিনীর উক্ত দলটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিলেন। তারা এমনও বলে দিল, এই বাহিনীর সঙ্গে একজন সেনাপতি আছেন, যার নাম হান্না। তিনি এই অঞ্চলের বিখ্যাত সেনাপতি এবং মানুষ তাকে অনেক ভয় করে।

সালার এই তথ্যগুলো বিস্তারিতভাবে আমর ইবনে আস (রাযি..)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) তখনই বাহিনীকে ফিরে রওনা হতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বাহিনীর একটা ইউনিটকে তিনি আলাদা করে নিলেন। তাদের একজন সালারের নেতৃত্বে দিয়ে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আলাদাকৃত ইউনিটটি সেই দিকে চলে গেল, যেদিক থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে রোমান বাহিনী আসছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

এই মুজাহিদ বাহিনীটি একটা গোপন জায়গায় ওঁত পেতে বসে গেল। তারা তিন-চারটি দলে বিভক্ত হয়ে টিলা ও নিচু-নিচু জায়গায় লুকিয়ে গেল। রোমান বাহিনী– যাদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ– এদিকে আসছিল। কিন্তু ওরা জানে না, ওরা শত্রুবাহিনীর একটা ফাঁদে এসে পড়ছে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে রোমান ইউনিটটি মুসলমানদের ফাঁদে এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদের উপর প্রলয় নেমে এল। রোমান সেনাপতি হান্না কিছু বুঝে উঠবার আগে যমের মুখে চলে গেল। মুজাহিদদের প্রথম আক্রমণেই হান্না ধরাশায়ী হয়ে গেল। তারপর মুসলমানরা তার এই বাহিনীর একজন সৈনিককেও জীবিত ছাড়ল না। যারা মুসলমানদের তাদের অজান্তে হত্যা করতে এসেছিল, তারা নিজেরা মুসলমানদের ফাঁদে এসে মারা পড়ল এবং ফাউমের মরুর বালি তাদের রক্ত চুষতে শুরু করল।

* * *

পার্শ্ববর্তী কোনো লোকালয়ের বাসিন্দারা মুকাওকিসকে সংবাদ দিল, আপনার প্রেরিত ইউনিট মারা গেছে এবং সেনাপতি হান্নাও জীবন বাঁচাতে সক্ষম হননি। সংবাদটা শুনে মুকাওকিসের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তার জানা ছিল, হান্নার মৃত্যুকে মেনে নেওয়া হেরাক্ল-এর পক্ষে কঠিন হবে। কারণ, হান্না আতরাবুনেরই মতো যোগ্য ও চৌকস সেনাপতি। মুকাওকিস আরও জানতেন, বাজিন্তিয়ায় বসে হেরাক্ল যখন হান্নার মৃত্যুসংবাদ শুনবেন, তখন তিনি প্রথম প্রশ্ন করবেন, তার এই ঘটনার জবাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

হেরাক্ল-এর ভর্ৎসনা থেকে রক্ষা পেতে মুকাওকিস মুজাহিদ বাহিনীর উপর জবাবি হামলা চালাতে বেশ কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। যে-জায়গাটায় হান্না ও তার বাহিনী মারা গিয়েছিল, এই বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল, দেখল, ততক্ষণে মুসলিম বাহিনী অনেক দূরে চলে গেছে এবং তারা নীলনদের কূলে পৌঁছে গেছে। ইতিহাসে সেই লোকটার নাম পাওয়া যায় না, যে এই রোমান

বাহিনীটার কমান্ডার ছিল। সে যখন দেখল, মুসলিম বাহিনী অনেক দূরে চলে গেছে, তখন সে তার বাহিনীকে সেখান থেকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, রোমানরা মুসলমানদের সঙ্গে খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে ভয় পেত। তাদের সামনে শামের অভিজ্ঞতা ছিল। এই কমান্ডার সেই ভয়েই তার বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুকাওকিসকে গিয়ে বুঝ দিল, মুসলামানরা আমাদের দেখেই পালিয়ে গেছে এবং নীলের কিনারায় চলে গেছে। ইতিহাসে এসেছে, বাস্তবতা ছিল, খোলা মাঠে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘাত বাঁধেনি এবং জীবিত ফিরে যেতে পেরেছে বলে এই কমান্ডার ও তার সৈন্যরা খুবই খুশি হয়েছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রকৃত ঘটনা ছিল, আমর ইবনে আস (রাযি.) ওখানে লড়াই করতে চাচ্ছিলেন না এবং এতটুকুও সময় ব্যয় না করে তিনি নীলের পূর্ব তীরে উম্মেদানিন পৌঁছে যাওয়ার ভাবনায় ছিলেন। তার কারণ ছিল, একজন দূত তাঁকে সংবাদ দিয়েছিল, সহযোগী বাহিনীর অবশিষ্ট অংশও পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারা উম্মেদানিন না গিয়ে অপর একটি জায়গা হলিউবুলিসে গিয়ে ছাউনি ফেলেছে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) অতি দ্রুত সহযোগী বাহিনীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন পাছে এমন না হয় যে, তারা ফাউম পৌঁছে যাওয়ার লক্ষে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে আর মুকাওকিস ব্যবিলন থেকে বাহিনী পাঠিয়ে তার উপর আক্রমণ করে বসেন। মুকাওকিসের চেষ্টা থাকা দরকার ছিল, মুসলমানদের এই সহযোগী বাহিনীটি যেন মূল বাহিনীর কাছে পৌঁছে যেতে না পারে। আমর ইবনে আস দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী সেনানায়ক ছিলেন। এখানেও তিনি তাঁর স্বভাবজাত দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। সহযোগী বাহিনী তাঁর দিকে রওনা দেওয়ার আগেই তিনি নিজে তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। রোমানরা যদি এই বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসত, তাহলে পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে হয়ে যেত।

সামুদ্রিক জাহাজ ও নৌকাগুলো নীলের পশ্চিম তীরে মজুদ ছিল। আমর ইবনে আস বাহিনীকে তাতে তুলে দিলেন। গোটা বাহিনী পুরোপুরি নিরাপদে দরিয়া পার হল। তিনি উম্মেদানিন না গিয়ে হলিউবুলিস চলে গেলেন এবং সহযোগী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম, যাঁর বিস্তারিত কাহিনী আমরা পেছনে আলোচনা করেছি।

সমর-বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন এমন ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, মুকাওকিস ব্যবিলনে এত অধিকসংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন; কিন্তু

চমৎকার একটি সুযোগ হাতে আসা সত্ত্বেও তিনি তাকে ব্যবহার করলেন না! প্রখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক এলফার্ড বাটলার লিখেছেন, মুসলমানরা দুবার নীল অতিক্রম করেছে। একবার উম্মেদানিন থেকে ফাউমের দিকে গেছে, একবার ওদিক থেকে ফিরে পূর্ব তীরে এসেছে। এটি মোক্ষম সুযোগ ছিল, মুকাওকিস নদীতেই এই বাহিনীটির উপর আক্রমণ করে বসত। তার সৈন্যরা যদি নদীর উভয় কূলে দাঁড়িয়ে তির ও বর্শা নিক্ষেপ করত, তাহলে পরিস্থিতি মুসলিম বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত।

বাটলার আরও লিখেছেন, মুসলিম বাহিনী নদী পার হয়ে ফাউমের মরুভূমিতে চলে গিয়েছিল। সে-সময় উম্মেদানিনে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। মুকাওকিস যদি তখন উম্মেদানিন অবরোধ করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাহলে এই নগরীটা মুসলমানদের হাত থেকে অতি অনায়াসেই ছিনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তা-ও তিনি করেননি।

সামনে অগ্রসর হয়ে বাটলার আরও লিখেছেন, মুসলমানদের সহযোগী বাহিনী এল; কিন্তু ব্যবিলনে তার সংবাদটা পৌঁছেনি এমন হতে পারে না। সংবাদ অবশ্যই পৌঁছেছে। কিন্তু মুকাওকিস ও সেনাপতি থিওডোর হামলা করেননি। এই মওকাটাও তারা নষ্ট করে দিলেস। মনে হচ্ছে, রোমান বাহিনী ব্যবিলন নগরীর চার দেওয়ালের মাঝেই নিজেদের নিরাপদ ভাবছিল এবং ওখানেই গুটিসুটি মেরে থাকতে চাচ্ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সাহস আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস সহযোগী বাহিনীর কাছে পৌঁছে গেলেন। ওখানে কতগুলো প্রাচীন ভবনের ধ্বংসাবশেষ ছিল। আমর ইবনে আস (রাযি.) ওখানেই ছাউনি ফেললেন এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করতে বসে গেলেন।

ইতিহাসে এসেছে, হেরাক্‌ল যখন সংবাদ পেলেন, তার একান্ত প্রিয়ভাজন ও পরম আস্থাভাজন সেনাপতি হান্না মারা গেছে, তখন তিনি এতই ব্যথিত ও শোকাহত হলেন যে, তার দুচোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছিল। তিনি আদেশ পাঠালেন, হান্নার মরদেহটা আমার কাছে বাজিন্তিয়া পাঠিয়ে দাও। এই আদেশ মুকাওকিসের কাছে পৌঁছলে তিনি লাশটাকে মমি করে বাজিন্তিয়ার উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিলেন।

হান্নার লাশ দেখে হেরাক্‌ল চিৎকার করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলেন, মিশরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করতে আমি আমার সমুদয় সামরিক শক্তি ব্যবহার করব এবং মুসলমানদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করেই তবে শ্বাস নেব।

তিন

হলিউবুলিসের যে-জায়গাটায় আমর ইবনে আস (রাযি.) মদিনা থেকে আসা সহযোগী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, সেটি অনেকগুলো পুরাতন জীর্ণ ভবনের ধ্বংসাবশেষ এলাকা। সেটি ধ্বংসাবশেষের নগরী-ই ছিল বটে। একটা ভবনও নিরাপদ ও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে বলে দেখা যাচ্ছিল না। ওটা ছিল মরুশিয়াল, সাপ, বিচ্ছু, পেচক ও চামচিকাদের আবাস। পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা ভবনগুলোই বলে দিচ্ছে, এটি অনেকগুলো জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ও মনোরম বাড়ির একটি নগরী ছিল। এটি মিশরের হাতেগোনা কয়েকটি বৃহৎ নগরীর একটি ছিল।

হলিউবুলিস গ্রিস ভাষার শব্দ। কোনো এক প্রাচীন যুগে গ্রিসীয়রা নগরীটার এই নাম রেখেছিল। তারপর মিশর একজনের পর দ্বিতীয়জনের, দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জনের ঝুলিতে এসে পড়তে থাকল। যখন যিনি এলেন, তিনি নামটা পরিবর্তন করে আরেকটা নাম রাখলেন। এভাবে শাসক বদলের সাথে পাল্লা দিয়ে নগরীটারও নাম বদলাতে থাকল। কিন্তু শুরুতে রাখা নামটা কেউ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছতে পারলেন না। তাই আজও মানুষ তাকে এ নামেই চেনে। এখন এই নগরীতে কেউ বাস করে না। এখানে এখন কোনো বসতি নেই। কয়েকশো বছর পর যে-মানুষগুলো এই ভীতিকর ধ্বংসাবশেষে গিয়ে ছাউনি ফেলল, তারা হলেন আরবের এই কজন মুজাহিদ আর তাঁদের সঙ্গে আছে একটি বেদুইন যোদ্ধাদল। এদের এই অবস্থানও এখানে সাময়িক–ক্ষণিকের জন্য।

প্রথম রাতে যখন বাহিনী গভীর ঘুম ঘুমিয়ে ছিল, তখন টহল বাহিনীর এক মুজাহিদ একটা ধ্বংসাবশেষ থেকে একটু-একটু আলো আসছে বলে দেখতে পেলেন। তাঁর জানা ছিল, তাঁদের কোনো মুজাহিদ ভেতরে থেকে থাকবেন না। থাকতেনও যদি, এই মাঝরাতে তাঁর আলোর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হয় শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা। গোয়েন্দারা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে এসে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। তারা একজন সরল-সহজ কৃষকের বেশে আসে। আসে অচল ও বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের পোশাকে। সে কারণেই ব্যাপারটা বুঝতে মুজাহিদ ভেতরে গিয়ে দেখা জরুরি মনে করলেন।

মরুর স্বচ্ছ জোছনায় পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িটা গা-ছমছম ভয়ংকর লাগছিল। মুজাহিদ সান্ত্রী চার দিক ঘুরে-ফিরে ভেতরে যাওয়ার একটা পথ দেখে নিলেন। একটা আঁকা-বাঁকা সরু পথ, যা কিনা উপর থেকে ঢাকা, যার ফলে ভেতরটা অন্ধকার। মুজাহিদ পা টিপে-টিপে ভেতরে গেল। এবার তার মনে হলো, ছাদে বসে কোনো মানুষ কানে-কানে কথা বলছে। ওরা ডাইনি-টাইনিও হতে পারে। একটা ভীতি মুজাহিদের মনটাকে ছেয়ে ফেলল। শরীরটা তাঁর ছমছম করে উঠল। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয়ের রহস্যই হলো, তাঁরা ভীতির উপর ছেয়ে যান। ভয়-আতঙ্ককে তাঁরা কাবু করে ফেলেন। তিনি সামনের দিকে এগুতে থাকলেন। ভেতর থেকে আসা একটা আবছা আলো তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মুজাহিদ কী একটা বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। অমনি একদিক থেকে হঠাৎ একটা ঝড়োহাওয়া উঠে এল। এমন ভয়ংকর একটা ফড়ফড় শব্দ কানে এল যে, পেছনে সরতে গিয়ে মুজাহিদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেল এবং তিনি অসাড়ের মতো বসে পড়লেন। এবার আর তিনি ভয়ের উপর জয় ধরে রাখতে পারলেন না। ভয় তাঁকে চেপে ধরল। এ ঝড়-তুফান হতে পারে না। তা হলে কী এটা এখানে? নিশ্চয় কতগুলো ডাইনি বা প্রেতাত্মা হবে, যারা এই ভয়ানক শব্দটা সৃষ্টি করেছে! মুজাহিদ বাতাসের ঝাঁপটাও অনুভব করলেন। তিনি বাইরের দিকে তাকালে বুঝতে পারলেন, ডাইনি-টাইনি কিছুই নয়– বৃহৎ পালকবিশিষ্ট কতগুলো চামচিকা, যারা ছাদ ও দেওয়ালের সাথে লেপটে আছে এবং এটা তাদের বাড়ি-ঘর। তাদেরই পালকগুলো হঠাৎ এমন প্রচণ্ড বায়ু সৃষ্টি করেছিল যে, মুজাহিদ তাকে ঝড়োহাওয়ার আক্রমণ ভেবেছিলেন।

মুজাহিদ উঠে দাঁড়ালেন এবং নুয়ে-নুয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। ভেতরের আলোকরশ্মির ভেদ তাঁকে জানতেই হবে। একস্থানে ছাদটা ভাঙা ছিল। সেই ছিদ্রপথে জোছনার আলো ভেতরে আসছিল। কিন্তু আরও সম্মুখ থেকে যে-আলোটা আসছিল, তার প্রখরতা চাঁদের আলোর চেয়েও বেশি। মুজাহিদ ছাদভাঙা কংকৃট অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এবার তিনি একটা দরজা দেখতে পেলেন, যার কোনো পাল্লা নেই। দ্বার অতিক্রম করে মুজাহিদ ভেতরে ঢুকে পড়লেন। এটি একটি সুপরিসর কক্ষ, যার দেওয়ালগুলো প্রমাণ করছে, কোনো একদিন এটি রাজপ্রাসাদ ছিল এবং কোনো এক রাজা এখানে জীবন কাটিয়েছেন।

হলুদ আলোতে কক্ষটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। এক কোণে একজন লোক হাতজোড় করে বসে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। তার সম্মুখে ক্ষুদ্র একটা

প্রদীপ জ্বলছে। অদূরে নিত্যদিনকার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র পড়ে আছে। গায়ে মেটো বর্ণের পোশাক, মাথাটা নগ্ন। দুধশাদা চুলগুলো কাঁধের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু মাথার তালুতে একটাও চুল নেই– করতলের মতো নির্লোম।

মুজাহিদ বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে ধীরে-ধীরে মাথা তুলে মুজাহিদের পানে তাকাল এবং চোখের ইঙ্গিতে বলল, বসো।

'আমার জানা ছিল, তুমি আসবে'– বৃদ্ধ কাঁপা কণ্ঠে বলল– 'আমি আরবের সেই অতিথিদের অপেক্ষায় ছিলাম।... তোমরা এসে পড়েছ।... তোমরা আসবারই ছিলে।'

'আগে বলুন মুহতারাম!'– মুজাহিদ বললেন– 'আপনি কি জীবিত, নাকি কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা? আমি আপনাকে প্রেতাত্মা বলছি না। আত্মা পবিত্র হয় আর আপনার মুখাবয়ব বলছে, আপনার অস্তিত্ব পাপ থেকে পবিত্র।'

'এখনও আমি জীবিত'– বৃদ্ধ বলল– 'দীর্ঘ সময় পর আমার জবান কথা বলছে। আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না। আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না।'

'এখানে আর কেউ আসে কি?' মুজাহিদ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আসে'– বৃদ্ধ কম্পমান আওয়াজে বলল– 'এখান থেকে সামান্য দূরে দুটা গ্রাম আছে। ওখান থেকে তিন-চার দিন পর-পর এক-দুজন লোক আসে এবং আমাকে খাবার-পানি দিয়ে যায়।

'আপনি তাদের কাছে চলে যাচ্ছেন না কেন?'– মুজাহিদ জিজ্ঞেস করলেন– 'এখানে পড়ে আছেন কেন?'

'এবাদত'– মাটি ও রক্তের জগত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে বসে আছি। অনেকেই এসেছিল; কিন্তু কেউই থাকতে পারেনি। এবার তোমরা এসেছ।'

'আমার বাহিনীও কি বিদায় নিয়ে যাবে?' মুজাহিদ কৌতূহলের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন।

'না'– বৃদ্ধ বলল– তোমার বাহিনী যাওয়ার জন্য আসেনি। বরং যারা নিজেদের খোদার আসনে বসিয়েছে, তাদের বিদায় করতে এসেছে। ফেরাউন খোদা হয়ে গিয়েছিল। এখন সে কোথায়? সবাই বিদায় নিয়েছে।'

কক্ষে অস্ফুট চিড়চিড় ও ফড়ফড়ানি শোনা যেতে শুরু করল। মুজাহিদ চোখ ঘুরিয়ে উপর ও চার দিকে তাকাল। চামচিকাগুলো ফিরে এসে ছাদে এখানে-ওখানে বসছে। সরু গলিপথের মধ্য থেকেও কিছু শব্দ আসছে। পরিবেশটা খুবই রহস্যময়। মুজাহিদের বারবারই মনে হচ্ছিল, এখানে বোধহয় মৃত

মানুষদের আত্মাগুলো বাস করে। মুজাহিদ এই শুভ্র শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে আরও কিছু কথা বলবে বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার মনটা দ্রুত ধুকপুক করতে শুরু করল এবং তার সমস্ত শরীরে ভীতির এটা ঢেউ খেলে গেল। কারণ, সহসা তিনি সামনের দেওয়ালটার সঙ্গে কালো একটা সাপ দেখতে পেলেন, যার গতি তার দিকে নয়– অন্য এক দিকে।

'দেখো, দেখো সাপ!' মুজাহিদ ভয়ে লাফিয়ে বলে উঠলেন।

'আমি প্রতিদিনই দেখি'– বৃদ্ধ স্বাভাবিক গলায় ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল– 'আমরা একসঙ্গেই থাকি। সাপ শুধু সেই মানুষকে দংশন করে, যারা নিজেরা সাপ হয়ে যায়। এখানে একটা নয়– তিন-চারটা সাপ থাকে। আমি তাদের বুঝ দিয়ে রেখেছি, আমি মানুষ আর মানুষ কাউকে দংশন করে না। প্রত্যেক মানুষই নিজের অস্তিত্বে বিষ নিয়ে চলে। আদর করো; আদর পাবে। এবার বলো, তোমার বাহিনীর সেনাপতি কোথায়?'

'আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?'– মুজাহিদ জিজ্ঞাসা করলেন– তাঁর সঙ্গে দেখা আপনাকে করতেই হবে। আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া আমার দায়িত্বের অংশ। আমরা কারও উপর সন্দেহ করি না বটে; কিন্তু সন্দেহ দূর করা তো আবশ্যক। আপনার মতো বুযুর্গের উপরও আমি কোনো সন্দেহ করব না। কিন্তু আমরা বেকার মানুষগুলোকে শত্রুর চোখ-কান মনে করি। আপনি আমাদের সেনাপতির কাছে যাবেন কি?'

'আমার একটা কথা বুঝবার চেষ্টা করো বেটা!'– বৃদ্ধ বলল– 'তোমার সেনাপতি যদি ফেরাউনের মতো লোক হন কিংবা পারস্যের অগ্নিপূজারি রাজা-বাদশাদের মতো হন বা রোমসম্রাট হেরাক্‌ল-এর মতো কেউ হন, তা হলে তোমাকে আদেশ করবেন, লোকটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসো; এখানে আমাদের মাঝ বসে সে করছেটা কী। আর যদি তিনি তাদের মতো নেতা হন, আজ একশো বছর যাবত আমি যাদের অপেক্ষা করছি, তা হলে তুই যা; তাঁকে বল। দেখবে, সে নিজেই আমার কাছে এসে পড়বে। তুই গিয়ে তাকে বল, আমি তাঁরই অপেক্ষায় বসে আছি।'

বৃদ্ধের এ বক্তব্য আর বলার ধরনে মুজাহিদ এমনভাবে প্রভাবিত হলেন যে, তিনি লোকটার অনুরক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরও কৌতূহল রয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বাইরের দিকে পা বাড়ালেন।

* * *

মুজাহিদ যখন বাইরে চাঁদের স্বচ্ছ আলোতে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর কাছে মনে হতে লাগল, যেন তিনি আত্মার জগতে চলে গিয়েছিলেন। ভীতিকর এই

পরিত্যাক্ত বাড়িটা তাঁর উপর প্রচণ্ড ভয় সঞ্চার করে রেখেছে। তিনি ধ্বংসাবশেষের একেবারে ভেতরে চলে গিয়েছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন, অভিনব এই বৃদ্ধ লোকটা এ জগতের জীবিত মানুষ নয়। তিনি কর্তব্য পালনার্থে ভেতরে গিয়েছিলেন। সেজন্য লোকটাকে তিনি সন্দেহের তালিকায় নিয়ে নিলেন যে, বাইরে থেকে তার কাছে লোক আসে; কারা আসে? ওরা শত্রুর গোয়েন্দা নয় তো?

মুজাহিদ তাঁর টহলের সময়টা পার করে কমান্ডারের কাছে গেলেন এবং তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তথ্য জানালেন, এখানে ওই পরিত্যাক্ত বাড়িটায় এক বৃদ্ধ বাস করছে এবং তার কাছে আশপাশের গ্রামের কিছু লোক আসা-যাওয়া করে। মুজাহিদ কমান্ডারকে বৃদ্ধের কিছু কথাবার্তাও শোনালেন।

এখন রাতের শেষ প্রহর। ফজর নামাযের সময় হয়ে গেছে। পুরনো পরিত্যাক্ত ও জীর্ণ ভবনের এই নগরীতে আযানের ধ্বনি উঠল। ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনির প্রতিধ্বনি কানে আসতে লাগল। মনে হলো, মহান আল্লাহর নাম পরিত্যাক্ত ও জরাজীর্ণ এই প্রাসাদগুলোর মধ্যে ঘুরে-ফিরে আত্মাগুলোকে জাগিয়ে তুলছে এবং মিশরের এই মরু সাহারায় ছড়িয়ে পড়ছে।

নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেল। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) ইমামতের দায়িত্ব পালন করলেন। নামাযের পর কমান্ডার তাঁর ইউনিটের সালারকে রাতের মুজাহিদের রিপোর্ট শোনালেন। সালার রিপোর্টটা হুবহু সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কানে দিলেন। এত দূর পরদেশে ছোটখাট সংশয়গুলোকেও উপেক্ষা করা যায় না। আমর ইবনে আস (রাযি.) রাতের ডিউটির মুজাহিদকে ডেকে পাঠালেন।

মুজাহিদ সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে বৃদ্ধের ঘটনার আনুপুঙ্খ বিবরণ শোনালেন এবং সে-সময় নিজের যে-অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তাও জানালেন। আমার ইবনে আস (রাযি.) যখন জানতে পারলেন, বৃদ্ধ বলেছে, তোমাদের নেতা যদি ফেরাউন-হেরাক্ল-এর মতো রাজা না হন, তা হলে তিনি নিজেই আমার কাছে চলে আসবেন, তখন তিনি বললেন, আমি এখনই তার কাছে যাব।

'আমাকে ওখানে নিয়ে চলো'– আমর ইবনে আস (রাযি.) মুজাহিদকে বললেন এবং সালারকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বৃদ্ধের জন্য কিছু খাদ্য-পানীয়ও সাথে নাও।'

অল্পক্ষণ পর। আমর ইবনে আস (রাযি.) সহযোগী বাহিনীর সালার হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)কে সাথে নিয়ে রাতের মুজাহিদের

দিকনির্দেশনায় সেই পরিত্যাক্ত বাড়িটায় প্রবেশ করলেন, যেখানে বসে বৃদ্ধ উপাসনা করছিল। দুজন মুজাহিদের কাছে বৃদ্ধের জন্য কিছু দুধ ও খাদ্যদ্রব্য।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) যখন কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন বৃদ্ধ একটা লাঠিতে ভর করে পা টেনে-টেনে পায়চারি করছিল। পাল্লাবিহীন দুটা জানালা দ্বারা ভোরের মিষ্টি আলো কক্ষে এসে পড়ছিল। কিন্তু তার পরও কক্ষে ক্ষুদ্র একটা দীপ জ্বলছিল। বৃদ্ধ লোকগুলোকে দেখে হঠাৎ থেমে গেল।

'আল্লাহর তোমাকে শান্তিতে রাখুন'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'তুমি না বললেনও আমি তোমার কাছে চলে আসতাম।'

'তোমাকে রাজা বলে মনে হচ্ছে না'– বৃদ্ধ বলল– 'মিশরের মাটি তোমার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। এস; আমার পাশে এই মাটির উপর বসে পড়ো।'

বৃদ্ধ পা টেনে-টেনে সেই জায়গাটায় গিয়ে বসল, যেখানে রাতে উপবিষ্ট ছিল। তারপর ডান পাশের মাটিতে হাত মেরে আমর ইবনে আস (রাযি.)কে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) চোখের ইশারায় মুজাহিদদের খাদ্যদ্রব্যগুলো বৃদ্ধকে দিতে আদেশ করলেন। মুজাহিদরা খাবারগুলো তার সামনে রেখে দিলেন। এবার আমর ইবনে আস ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম বৃদ্ধের পাশে বসে পড়লেন। মুজাহিদরা পেছনে সরে খানিক দূরে গিয়ে বসলেন।

'সবার আগে নিজের ব্যাপারে কিছু বলো'– আমার ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'কবে থেকে এখানে পড়ে আছ? কী করছ এখানে? কারা আসে তোমার কাছে?'

'আগে আমাকে সেই সত্তার শোকর আদায় করতে দাও, যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই নেয়ামতগুলো তোমার হাতে পাঠিয়েছেন'– বৃদ্ধ বলল– 'তারপর আগে আমি তোমাকে এই নগরীর উত্থান-পতনের কাহিনী শোনাব, যাতে তুমি শিক্ষা নিতে পার, একটি শক্তি এমন আছে, যেটি দেখা যায় না এবং সেই শক্তিটি-ই মানুষকে উন্নতির সুউচ্চ শিখরে পৌছিয়ে অবনতির অতলান্তে ফেলে দেয়। কিন্তু এই আচরণ তিনি যে-কারুর সাথে করেন না। রাতে আমি তোমার এই লোকটাকে বলেছি, সেই ফেরাউন কোথায়, যে নিজেকে খোদা দাবি করেছিল? শোনে সিপাহসালার! তুমি যদি এই মাটির সাথে সম্মানজনক আচরণ কর, তা হলে খোদা তোমাকে আকাশের উচ্চতায় পৌছিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি বল, এই উচ্চতায় আমি নিজের বাহুবলে পৌছেছি, তা হলে এই মাটির তলায় হারিয়ে যাবে।'

'তুমি কার এবাদত কর?' বৃদ্ধের ধর্ম ও বিশ্বাস জানতে আমর ইবনে আস জিজ্ঞেস করলেন।

'নিজের'– বৃদ্ধ ঝটপট উত্তর দিয়ে দিল– 'আমি আপন সত্তার এবাদত করি।... অবাক হয়ো না সিপাহসালার! তাকে তুমি খোদা বল আর যা-ই বল, তিনি আমার মাঝেই বিদ্যমান। অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, সবাই আমাকে উপাস্য মনে করবে। আমি নিজের কথা বলছি। তুমি কি আমার এই বিশ্বাসটি পছন্দ করবে না যে, আমি কোনো মূর্তির পূজা করছি না? আমি আগুনের পূজা করছি না? নিজের গড়া কোনো দেবতার পূজা করছি না? কিন্তু আমি অনুভব করি, সেই ধর্মটি এখনও আমার সামনে আসেনি, যে আমাকে বলবে, এবাদতের উপযুক্ত কে। শুধু এটুকু জানি, তিনি যিনি-ই হোন, তাঁর অবস্থান মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না। মানুষের দৃষ্টির আয়ত্তে আসা তাঁর উচিতও নয়।'

'আমার থেকে শুনে নাও তিনি কে?'– আমার ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'সেই অদৃশ্য খোদা-ই আমাকে পাঠিয়েছেন যে, যাও, আমার বান্দাদের গোমরাহি থেকে বের করে আনো এবং তাদের বলো, আমি আমার প্রত্যেক বান্দার অস্তিত্বে বিরাজমান থাকি। আর একথাও বলো, রাজত্ব শুধুই আমার। কোনো বান্দার রাজত্ব করার অধিকার নেই। বান্দা বান্দাকে গোলাম বানাতে পারে না।'

'আমার দৃঢ়ভাবে মনে হচ্ছে, আমি তোমারই অপেক্ষায় বেঁচে আছি'– বৃদ্ধ বলল– 'আমি নই– মিশরের মাটি তোমার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ভেবো না, তোমার ব্যক্তিসত্তার অপেক্ষা ছিল। নিজেকে সেই খোদার দূত মনে করো এবং তিনি তোমাকে যে-বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছে, তার উপর চোখ রাখো। মনে করো না, এখন আর কোনো মুসা আসবেন না। ফেরাউনকে মুসা নীলনদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ফেরাউনকে নয়– ফেরাউনি মতবাদকে। তুমি নিজেকে মুসা মনে করো। কারণ, মিশর থেকে ফেরাউনি মতবাদ এখনও পুরোপুরি উৎখাত হয়নি।'

'তোমার বয়স কত?' আমর ইবনে আস (রাযি.) বৃদ্ধের আয়ু জানতে চাইলেন।

বয়সের কথা জিজ্ঞেস করো না'– বৃদ্ধ উত্তর দিল– 'মনে হচ্ছে, এই জগত যখন অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তার সঙ্গে আমিও এসেছিলাম আর এখান থেকে তখন বিদায় নেব, যেদিন এই দুনিয়াও বিদায় নেবে। যতটুকু মনে পড়ছে, আমার বয়স একশো বিশ-পঁচিশ বছরের কম হবে না। জগতের অনেক উত্থান-পতন, বিশাল-বিশাল জনবসিতর পত্তন ও ধ্বংস আমি দেখেছি।'

আমার ইবনে আস ও সমস্ত মুসলমান জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, অদৃশ্যের খবরাখাবর

একমাত্র আল্লাহই জানেন। কিন্তু তারপরও কেন জানি আমর ইবনে আস বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো বিদ্যা আছে কি?

'না'– বৃদ্ধ উত্তর দিল– 'এমন কোনো বিদ্যা আমার নেই। আমার চোখ আছে; জগত দেখেছি। আমি তা-ই বলব, যা আমি দেখেছি ও দেখছি। একজন বিপথগামী লোককে দেখে কে না বলতে পারবে, এই লোকটা ধ্বংসের খাদে পড়ে যাবে? যার কর্ম ভালো, যে মানবপ্রেম লালন করে, তার সম্পর্কে যে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে, এই ব্যক্তি উন্নতির শিখরে উঠে যাবে। আমি বুঝি, কথাটা তুমি কেন জিজ্ঞেস করেছ। এ-প্রশ্নের উপর আমি তোমাকে আগেই গিয়েছি। তোমার এখানে আমার কাছে আসা এবং এই মাটির উপর আমার পাশে বসে পড়া প্রমাণ করছে, তুমি জয়ী হবে। কিন্তু তাকে যদি তোমার নিজের জয় মনে করে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা কর, তা হলে ভবিষ্যদ্বাণী উলটে যাবে।'

* * *

'এই নগরীর ব্যাপারে কিছু বলুন।' আমর ইবনে আস জিজ্ঞেস করলেন।

'আহ এই নগরী!'– বৃদ্ধ উত্তর দিল– 'এই নগরী মর্যাদার স্মারকও, শিক্ষার উপকরণও। মনে হচ্ছে, এই নগরী ফেরাউনরা আমার চোখের সামনে আবাদ করেছিল এবং এর ভবন ও রাজপ্রাসাদগুলোতে নিজেদের গোটা রাজত্ব ও শক্তির সবটুকু সৌন্দর্য ও সুষমা ভরে দিয়েছিল। এই নগরীর নাম রেখেছিল তারা 'মদীনাতুশ শাম্‌স' (সূর্যনগরী)। এই নগরীর যৌবন ও উত্থানের কাহিনী আমাকে আমার এবং তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষরা শুনিয়েছেন। আমার পিতা ও দাদা ধর্মনেতা ছিলেন। ধর্মনেতা হওয়ার মর্যাদা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। কিন্তু সামনে অগ্রসর হয়ে আমি বিশ্বাসের পাঁকে আটকে গেছি এবং বেশ কিছু কাল এমনভাবে কাটালাম, যেন বুঝতেই পারছিলাম না, এবাদত করলে কার করব। এটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমাকে আমি এই নগরীর উপাখ্যান শোনাচ্ছি।...

'ইউনানিরা এখানে কখন ও কীভাবে এসেছিল, সেকথা আমি বলব না। শুধু এটুকু বলব, এই নগরী বিভিন্ন জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ইউনানের বিখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন (প্লেটো), আরাস্তু (এ্যারিস্টটল) ও সাকরাত (সক্রেটিস) এই নগরীতে এসেই এমন অগাধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। এই অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁরা এখান থেকেই অর্জন করেছিলেন। একটি মজার কথা শোনো সিপাহসালার! যখন ফেরাউনদের পতন শুরু হলো, তখন থেকে এই নগরীর উন্নতির অভিযাত্রাও শুরু হলো। ফেরাউনি মতবাদের যখন মুমূর্ষূ অবস্থা, তখন এই নগরীতে নানা ধর্মের উপাসনালয় তৈরি হতে লাগল।

মিনার ও গম্বুজ চোখে পড়তে শুরু করল এবং তাতে নগরীর সৌন্দর্য বেড়ে গেল। বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং সমগ্র মিশর ও তার আশাপাশের রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছেন।...

'পারস্যের অগ্নিপূজকরা এখানে এসে উপাসনালয় বানাল। কিন্তু রোমানরা এসে তাদের মিশর থেকে তাড়িয়ে দিল এবং সঙ্গে করে খ্রিস্টবাদ নিয়ে এল। মিশরের অধিবাসীরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিতে শুরু করল এবং অগ্নিপূজক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়গুলোর জায়গায় তাদের উপাসনালয় তৈরি হতে শুরু করল।...

'এখান থেকে এই নগরীর ভাগ্যলিপি উলটোপায়ে চলতে শুরু করল। এখানকার অবস্থা ছিল, এখানে যারা-ই যে বোধ-বিশ্বাস প্রচার করত, মানুষ তা-ই বরণ করে নিত। কিন্তু রোমানরা এখানে তরবারির জোরে খ্রিস্টবাদের প্রসার ঘটাল। তাদের সেই ধারা আজও অব্যাহত। এমনটা মনে করো না, এখানে আমি এই পরিত্যাক্ত ভবনে বসে আছি আর বাইরের কোনো খবর রাখি না। দেশের প্রতিটি কোনায় যেখানে যা-কিছু ঘটে, সব খবর আমার কাছে চলে আসে। রোমরাজা হেরাক্ল খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। কিন্তু নিজেই সে এই ধর্মটির চেহারা বিকৃত করে ফেলেছে এবং নিজে একটা খ্রিস্টবাদ তৈরি করে নিয়ে তাকে মানুষের উপর চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর সেই কাজটা করতে গিয়ে সে নির্যাতনের যে-স্টিমরোলার চালিয়েছে, শুনলে তোমার গা শিউরে উঠবে। হাজার-হাজার মানুষ তার ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।...

'রোমানরা এখানে এসেই এই নগরী থেকে ধর্মীয় উপাসনায়গুলো ধ্বংস করা শুরু করে দিল। সুন্দর-সুন্দর মূর্তিগুলো তারা তুলে নিয়ে গেল। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, কোনো একটি মিনার তাদের কাছে ভালো লাগল আর অমনি সেটি তারা অক্ষত ও যেমনটা তেমন উপড়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ– যেগুলো এখানকার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল– নিয়ে গেল। কিছু পুড়ে ফেলল আর বাকিগুলো রোম পাঠিয়ে দিল। মোটকথা, এখানকার যা-কিছু তাদের ভালো লাগল, তা-ই তুলে নিল এবং রোম উপসাগরের ওপারে পাঠিয়ে দিল। কথাটা তুমি এভাবেও বলতে পার যে, রোমানরা এমন সুদর্শন নগরীটার সেই দশা ঘটিয়েছিল, যেমন হাল শকুন-শিয়ালরা মৃত প্রাণীর করে থাকে।...

'যখন তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উৎসটি রুদ্ধ করে দিল, তখন এই নগরীর ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেল। বাইরে থেকে বিদ্যানুরাগীদের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

ইউনানিরা এই নগরীর নাম রেখেছিল হলিউবুলিস। কিন্তু রোমানরা সেই নাম বদল করে রাখল 'আইনুশ শাম্‌স'। এখন মানুষ একে আইনুশ শাম্‌স-এর ধ্বংসাবশেষ নামে ডাকে। তুমি চেয়ে দেখো সিপাহসালার! আজ এই নগরীর রংচটা প্রাচীর, হেলেপড়া ছাদ আর পোকায়-খাওয়া দরজা-জানালাগুলো এর হৃত গৌরবের জন্য কাঁদছে। তোমাকে আমি এই নগরীর নয়- এর রাজা-বাদশাদের উত্থান-পতনের কাহিনী শোনাচ্ছি।...

'এই উপাখ্যান থেকে আমি নির্যাস বের করেছি এবং তারই আলোকে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছি, একটি বাহিনী আসছে, যারা ঝড়োহাওয়ার মতো সবকিছু উড়িয়ে ও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং একটি নতুন বিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করবে। উত্থান তারই অর্জিত হবে, যে এমন একটি বিশ্বাস নিয়ে আসবে, যেটি কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়- বরং তাঁর সৃষ্টি, যিনি মানুষেরও স্রষ্টা। তোমার বাহিনী ঝড়ের গতিতে এখানে এসে পৌঁছেছে। আমি সবই শুনেছি। এ-ও জানি, রোমানদের মোকাবেলায় তোমার শক্তি নেই বললেনই চলে। কিন্তু ভেবে দেখো- হয়ত ভেবেছও, তোমার সঙ্গে এমন কোনো শক্তি আছে, যে রোমানদের সামরিক শক্তিকে পিষে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেসব জয়ের কারণে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে যেয়ো না, এখন তো কেবল জয়ই জয়। একটি দুর্গকে তখনই আপনার ভাববে, যখন তার গায়ে তুমি নিজের পতাকা উড়াবে। এ-ও মনে রেখো, তুমি নিজে আসনি; তোমাকে পাঠানো হয়েছে।'

'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমরা আল্লাহ বলি'- আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন- 'আমরা ইহজাগতিক মর্যাদা বা স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করি না। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর বার্তাকে সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে লড়াই করি। আমাদের লক্ষ্য মানবতার মুক্তি।'

'যাও; জয় তোমারই।'

সিপাহসালার আমর ইবনে আস ও সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম বৃদ্ধের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সিপাহসালার আদেশ জারি করলেন, আমরা যে-কদিন এখানে আছি, এর পানাহার আমাদের দায়িত্বে থাকবে।

* * *

ওদিকে ব্যাবিলনে মুকাওকিসের দরবারে হুলস্থুল চলছে। তিনি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, মুসলমানরা আরও সামনের দিকে চলে আসুক; তখন ঘিরে ফেলে তাদের তিনি নিঃশেষ করে দেবেন। কিন্তু এই কৌশল তার পুরোপুরি ব্যর্থ হলো এবং আতরাবুনের মতো সেনাপতি মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারাল। সবচেয়ে বড় যে-ক্ষতিটা হলো, তা ছিল, রোমান সৈন্যরা এত অধিক সংখ্যক মারা গেল,

মুকাওকিস যার কল্পনাও করেননি। পাশাপাশি যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল, তারা যুদ্ধ করার স্পৃহা ও মনোবল হারিয়ে ফেলল।

এই বাহিনীতে সেই ইউনিটটিও ছিল, যারা শামে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই না করে পালিয়ে এসেছিল। এসে তারা এখানকার সৈনিকদের শুনিয়েছিল মুসলমান কীরূপ সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। এবার তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেল। বুঝল, যেমন শুনেছি, মুসলমান তার চেয়েও বেশি নির্ভীক, তার চেয়েও অধিক সাহসী। ফলে এই বাহিনী মানসিকভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল।

মুকাওকিস অপর যে-আঘাতটা পেয়েছিলেন, তা হলো, সম্রাট হেরাক্ল মুসলমানদের অব্যাহত জয়ের দায় তার উপর চাপিয়েছিলেন এবং তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে কঠোর বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই বার্তার উত্তরে মুকাওকিস হেরাক্লকেও অনুরূপ বার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং শামের পরাজয়ের দায়ভার তার কাঁধে রেখেছিলেন। এ-অভিযোগ-পালটা অভিযোগের ফলে হেরাক্ল ও মুকাওকিসের মাঝে মনকষাকষি তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

মুকাওকিস সম্রাট হেরাক্ল-এর মনোনীত প্রধান বিশপ কায়রাসের পরামর্শে নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ একব্যক্তির মাধ্যমে কিবতি খ্রিস্টানদের প্রধান পুরোহিত বিনয়ামিনের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলেন, আপনি কায়রাসের সঙ্গে দেখা করে মুসলমানদের এই অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার একটা পথ বের করুন।

বিনয়ামিন প্রকৃত খ্রিস্টবাদের জন্য নিবেদিত ধর্মনেতা ছিলেন। আসল খ্রিস্টবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে কাজ করছিলেন। এই মিশনে তার এক ভাই জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ পেয়ে এবং নিশ্চিত হয়ে বিনয়ামিন মুকাওকিসের দূতের সঙ্গেই রওনা হয়ে গেলেন। মুসলিম বাহিনী যখন উম্মেদানিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, বিনয়ামিন ততক্ষণে ব্যবিলনে কায়রাস ও মুকাওকিসের কাছে পৌঁছে গেছেন।

কায়রাস ও মুকাওকিস পরম যত্ন ও মর্যাদার সাথে বিনয়ামিনকে স্বাগত জানালেন। মুকাওকিস আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, এই সাক্ষাৎ হবে পুরোপুরি গোপনে এবং বিনয়ামিন যদি এই বৈঠককে ব্যর্থও করে দেয়, তবু তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না; বরং তাকে নিরাপত্তার সাথে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঐতিহাসিকভাবে বিনয়ামিন ও কায়রাসের এই সাক্ষাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুসলমানদের জয়ের কারণ ছিল, কিবতি খ্রিস্টানরা তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং গোপন অভিযানের মাধ্যমে তারা রোমান বাহিনীর অনেক ক্ষতিসাধন করেছিল। কিন্তু এটি পুরোপুরি অতস্য

ও ভিত্তিহীন কথা। মিশরে ইসলামের সৈনিকরা জয়লাভ করেছিল শুধুই আল্লাহর সাহায্যে।

বিনয়ামিন যখন ব্যবিলন পৌঁছলেন, তখন মুকাওকিস বললেন, তোমরা দুজন আলাদা বসে কথা বলো; তোমাদের আলাপে আমি কোনো হস্তক্ষেপ করব না। কায়রাস ও মুকাওকিসের লক্ষ্য ছিল, কিবতি খ্রিস্টানরা রোমান বাহিনীর সাথে এসে যোগ দিক। কায়রাস বিনয়ামিনের সামনে এ-বিষয়টি-ই উত্থাপন করল এবং বলল, খ্রিস্টবাদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং ইসলামের উত্থান প্রতিহত করতে হবে।

বিনয়ামিন বললেন, হেরাক্‌ল যত দিন জীবিত আছেন, তত দিন নিজেও তার খ্রিস্টবাদ থেকে হাত গোটাবেন না, অন্য কাউকেও তা থেকে হাত গোটাতে দেবেন না। কায়রাস বললেন, হেরাক্‌ল এখন আর কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। মুকাওকিস এমনও বলেছেন যে, যদি হেরাক্‌ল অযাচিতভাবে হস্ত ক্ষেপের চেষ্টা করেন, তা হলে তাকে কোণঠাসা করে দেওয়া হবে; এমনকি প্রয়োজন হলে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যার ফলে তিনি মিশর থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। আর তখন তার খ্রিস্টবাদের অনুসরণ করার মতো তিনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

মুকাওকিস এ দুই ধর্মনেতাকে আলাদা বসিয়ে আলাপে জুড়িয়ে দিলেন। কিন্তু নিজে কী ভাবছেন কাউকে বললেন না। তিনি হেরাক্‌লকে বিলবিস দুর্গের পতনের খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর শোনালেন, মুসলমানরা নীল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং আতরাবুনের পর তার আরও এক প্রিয়ভাজন ও মূল্যবান সেনাপতি হান্নাও প্রাণ হারিয়েছেন। হেরাক্‌ল-এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে মুকাওকিসের জানা ছিল। মুকাওকিসের এটাও অভিযোগ ছিল যে, হেরাক্‌ল বাজিন্তিয়া থেকে মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠাচ্ছেন না। এতগুলো পরাজয়ের পর মুকাওকিসের আশঙ্কা ছিল, হেরাক্‌ল তাকে মিশরের গভর্নরির পদ থেকে বরখাস্ত করে দেবেন। পাশাপাশি এই ধারণাও বদ্ধমূল ছিল যে, হেরাক্‌ল কিবতি খ্রিস্টানদের শত্রুতা ধরেই রাখবেন এবং নিজের তৈরী খ্রিস্টবাদ পরিত্যাগ করবেন না আর তারই ফলে যেকোনো সময় কিবতিরা বিনয়ামিনের ইঙ্গিতে বিদ্রোহ করে বসবে।

কায়রাস ও বিনয়ামিন আলাদা বসে কথা বলছে। মুকাওকিস তার সেনাপতি থিওডোরকে ডেকে পাঠালেন। থিওডোর মুকাওকিসের পরম আস্থাভাজন ব্যক্তি। কখনও কোনো গোপন বিষয় নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে পরামর্শ

করেন। মুকাওকিস ও থিওডোর দুজনের একজনও নতুন আর কোনো পরাজয়ের সংবাদ শুনতে রাজী নয়।

'থিওডোর!'– মুকাওকিস বললেন– 'বিনয়ামিন ও কায়রাসকে আমি আলাদা বসিয়ে দিয়েছি। তারা কথা বলছে। কিন্তু আমি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, হেরাক্‌ল যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাথার উপর বহাল আছেন, ততক্ষণ আমরা কোনো সফলতা লাভ করতে পারব না। অবশেষে একদিন মুসলমানরা সমগ্র মিশরে ছেয়ে যাবে আর হেরাক্‌ল তার দায় আমাদের মাথায় চাপাবেন।'

'আমি সবই জানি'– থিওডোর বলল– 'পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কেই আমি অবগত। বলুন, এই সমস্যার সমাধান কী এবং আমাদের কী করতে হবে।'

'হেরাক্‌লকে পদচ্যুৎ করতে হবে'– মুকাওকিস বললেন– 'কিন্তু এখানে সেনাবাহিনীতে তার সমর্থক আছে। ওরা তো আমাদের দুজন থেকে; বিশেষ করে আমার থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। অবশ্য আমরা তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারি। আর এই পন্থাটি-ই সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ হবে।'

সেনাপতি থিওডোর মাথাটা নত করে ফেললেন, যেন তিনি গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেছেন। মুকাওকিস বেশ কিছু সময় তার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। অবশেষে থিওডোর মাথা তুললেন এবং ধীরে-ধীরে মাথাটা বারকয়েক উপর-নিচ নাড়ালেন, যার অর্থ হলো, আমি আপনার চিন্তার সঙ্গে একমত।

কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, আবার কঠিনও'– থিওডোর বললেন– 'অবশ্য এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। আচ্ছা, এর ব্যবস্থাটা কী হতে পারে?'

'ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি'– মুকাওকিস বললেন– 'দুজন লোক ঠিক করেছি। তাদের সঙ্গে এমন একটি রূপসী ও চৌকস মেয়ে যাবে, যেরূপ সুন্দরী নারী হেরাক্‌ল জীবনে কখনও দেখেননি। এই মেয়েটা আমি হেরাক্‌ল-এর কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠাচ্ছি। এ কাজের জন্য আমি বিপুল অর্থ বরাদ্দ রেখেছি। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা আমি পাকাপোক্ত করে রেখেছি।'

'মেয়েটার উপর কি আস্থা রাখা যায়?'– থিওডোর জানতে চাইলেন– 'আপনার কথা থেকেই বুঝতে পারছি, মেয়েটার বয়স অল্প হবে। ওখানে গিয়ে ও ভয় পেয়ে যাবে না তো আবার?'

'হত্যা খঞ্জর বা তরবারি দ্বারা হবে না'– মুকাওকিস বললেন– 'হেরাক্‌ল-এর মদের সঙ্গে বিষ মিশাতে হবে, যা এই মেয়েটা অতি অনায়াসেই করতে পারবে। আমি কাজটা ওকে বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি হেরাক্‌ল কীভাবে মদ পান করে এবং সেই সময়টায় কী করে আর মেয়েটা কীভাবে সুযোগ সৃষ্টি করে

একটুখানি বিষ তার গ্রাসে ঢেলে দেবে। যে-বিষ আমি তাকে দেব, তা এতই তীব্র যে, তার কয়েকটা কণা মদের মধ্যে পড়ে গেলেই কাজ হয়ে যাবে।'

'সতর্কতা তো আপনি অবলম্বন করবেনই'– থিওডোর বললেন– 'একটি সতর্কতা সবচেয়ে বেশি অবলম্বন করা আবশ্যক যে, এই যে-দুজন লোক সঙ্গে যাবে, তাদের যেন কেউ চিনতে না পারে।'

মুকাওকিস বললেন, এ-বিষয়টিও আমি গুরুত্বের সাথে মাথায় রেখেছি। আমি তাদের অতিশয় সাধারণ মানুষের পোশাকে পাঠাব। মেয়েটাকেও একজন দরিদ্র ঘরানার মেয়ের বেশে পাঠাব এবং তার মুখে নেকাব থাকবে। মুকাওকিস থিওডোরকে জানালেন, প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর আমি তাদের তিনজনকেই পুনর্বার রিহার্সেল করিয়েছি। পরিকল্পনাটা পরম বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য থিওডোর মুকাওকিসকে ধন্যবাদ জানালেন ও বাহবা দিলেন।

তারপর তারা দুজনে বাইবেলে হাত রেখে অঙ্গীকার করলেন, এই গোপন পরিকল্পনাটিকে গোপনই থাকতে দেবেন এবং কেউ কাউকে ধোঁকা দেবেন না।

এদিকে বিনয়ামিন ও কায়রাস খ্রিস্টবাদের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। বিনয়ামিন শুধু হেরাক্‌ল-এর ব্যাপারটায় নিশ্চয়তা চাচ্ছিল। মুকাওকিস তাকে নিশ্চয়তা দিলেন, হেরাক্‌ল এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন। তিনি একথাও বললেন যে, হেরাক্‌ল-এর কাছে খ্রিস্টবাদের চেয়ে নিজের রাজত্ব ও ক্ষমতা বেশি প্রিয়। তার মিশর দরকার– ধর্ম নয়। কায়রাস তো এ ব্যাপারে তাকে আগেই নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছে।

থিওডোর ছাড়া আর কারও জানা ছিল না, কীসের উপর ভিত্তি করে মুকাওকিস বিনয়ামিনকে হেরাক্‌ল-এর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।

বিনয়ামিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন, এ সিদ্ধান্তের কথা আমি আমার উপদেষ্টাদের জানিয়ে দেব; তারপর কিবতিরা ফৌজের সঙ্গে শামিল হয়ে যাবে। না-ও যদি হয়, অন্তত তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না এবং মুসলমানদের সামান্যও সহযোগিতা করবে না।

* * *

মুসলিম বাহিনী আইনুশ শাম্‌স-এর পরিত্যাক্ত নগরীতে অবস্থান নিয়ে আছে। তাদের সহযোগী বাহিনী এসে পৌঁছেছে। এবার সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পালা। তিনি বেশি সময় অপেক্ষা করার মতো সিপাহসালার নন। কিন্তু বাহিনীতে আহত সৈনিকদের সংখ্যা প্রচুর। তাদের চিকিৎসা চলছে। আশা আছে, দিনকতকের মধ্যেই তারা সেরে উঠবেন

এবং যুদ্ধ করার উপযোগী হয়ে যাবেন। গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তও নিতে হবে পরবর্তী অগ্রাভিযান কোন দিকে হবে।

আইনুশ শাম্‌স-এর পরিত্যাক্ত এই নগরীর অবস্থান খানিক উঁচুতে এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে বেশ উপযোগী। দুশমন হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে এই নগরীর উচ্চতা উপকারে আসতে পারে। তাছাড়া ওখানে পানির এমন প্রাচুর্য আছে, যা শেষ হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। বাহিনীর সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যও আছে পর্যাপ্ত।

একদিন আমর ইবনে আস (রাযি.) যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও অন্যান্য সালারদের ডেকে পাঠালেন।

'আমার বন্ধুগণ!'– আমর ইবনে আস (রাযি.) সালারদের উদ্দেশ করে বললেন– 'এবার ব্যবিলনের দুর্গঘেরা নগরী আমাদের সম্মুখে। কিন্তু ওখানে যে-বাহিনী আছে, তার কোনো শুমার নেই। প্রথমত, বিজিত দুর্গগুলো থেকে পালিয়ে-আসা-সৈন্যরা ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুকাওকিস বিপুলসংখ্যক সৈন্য এই নগরীতে এনে জড়ো করেছেন। ফলে স্পষ্ট যে, নগরীটা আমাদের অবরোধ করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ যদি আমার দু'আ কবুল করেন, তা হলে রোমানরা বাইরে এসে খোলা মাঠে লড়াই করবে। তোমরাও দু'আ করো আমার বন্ধুরা! আল্লাহ যেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দেন, যা রোমানদের দুর্গ থেকে বাইরে নিয়ে আসে।'

'আল্লাহ তো আমাদের কোথাও নিরাশ করেননি'– হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'রোমানদের দুর্গ থেকে বাইরে এসে লড়াই করা আমাদের পক্ষে হিতকর হয়, তা হলে আল্লাহ সেই পরিস্থিতিও তৈরি করে দেবেন।'

'এ কথাটিও অন্তরে বসিয়ে নাও আমার বন্ধুগণ!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'এখন আমরা মিশরের জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছি। এখন যদি আমরা কোথাও ফসকে যাই, তা হলে আমাদের স্থান হবে হয় পরজগত কিংবা শাম। আমার একটি মূলনীতি আছে; আমি কোথাও বসে-বসে শত্রুর অপেক্ষা করি না। এখনও আমি সেই নীতির ব্যতিক্রম করব না। আমি শত্রুর মাথার উপর চড়ে বসে থাকতে চাই। এই নীতি-ই আমাকে প্রতিটি রণাঙ্গনে সাফল্য দান করেছে।'

এদিকে ব্যবিলনে মুকাওকিস ও থিওডোর কয়েকজন সেনাপতিসহ বসে মুসলমানদের পরাজিত করার পরিকল্পনা ঠিক করছেন। মুকাওকিস বললেন, এই আরবরা যদি ব্যবিলনও নিয়ে যায়, তা হলে আমাদের আর কোথাও পা রাখার জায়গা থাকবে না।

আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীকে উদ্দেশ করে কোনো একস্থানে বলেছিলেন, আমরা যদি কোথাও থেকে পিছপা হয়ে যাই, তা হলে মনে রেখো, শত্রুদেশে আমরা কোথাও আশ্রয় পাব না এবং আমাদের পালাবারও কোনো জায়গা থাকবে না। এখন ব্যবিলনে বসে মুকাওকিসও তার সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলছেন, আমরা যদি ব্যবিলন থেকে বিতাড়িত হয়ে যাই, গোটা মিশরে কোথাও আমরা পা জমিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ পাব না। খোদ আমাদেরই লোকেরা আমাদের আশ্রয় দেবে না।'

'আমি মুসলমানদের চাল বুঝে ফেলেছি'– সেনাপতি থিওডোর বললেন– 'যা কিনা আতরাবুনের মতো অভিজ্ঞ সেনাপতিও বুঝতে পারেননি। আরব বাহিনীর সিপাহসালার প্রথম আক্রমণ থেকেই এই নীতির অনুসরণ করে আসছেন যে, নিজেদের সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিয়ো না, আক্রমণে বেশি বিলম্ব করো না, এক জায়গায় বসে থেকো না এবং শত্রুর উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ো, যেন তারা সেই আক্রমণকে অতর্কিত মনে করে। এটিই সেই কারণ, যার জন্য আরবরা প্রতিটি রণাঙ্গনে বিজয় লাভ করে চলছে। এদিকে আমরা দুর্গবন্ধ হয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকছি। অবরোধে আমরা যে-রণনীতি অবলম্বন করেছি, তা হলো, এক-একটি বা দু-দুটি ইউনিট বাইরে বের হয়ে আরবদের উপর আক্রমণ করছি। আরবরা আমাদের এই কৌশল বুঝে ফেলেছে এবং তার দ্বারা তারা যে-স্বার্থ উদ্ধার করেছে, তা তো আপনাদের সকলের সামনেই রয়েছে।

'তুমি যা করতে চাচ্ছ, খুলে বলো।' মুকাওকিস বললেন।

'আমি চাচ্ছি, আমরা দুর্গবন্ধ হয়ে লড়ব না'– থিওডোর বললেন– 'আরবদের আমরা এতখানি সময়ই দেব না যে, তারা এসে ব্যবিলন অবরোধ করবে। তাদের সিপাহসালারের একটি নীতি হলো, শত্রুর মাথার উপর চড়ে বসে থাকো, যাতে তারা মনে না করে, আমরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন এই নীতিরই অনুসরণ করতে চাই। আপনি হয়ত শোনেননি, মিশরের মানুষ আমাদের কাপুরুষ ও দুর্বল ভাবতে শুরু করেছে যে, আমরা দুর্গের চার দেওয়ালের ভেতরে অবরুদ্ধ থেকে প্রতিরক্ষার যুদ্ধ লড়ি। এই অপবাদ আমাদের সহ্য করা উচিত নয়। এখন আমাদের বাইরে গিয়ে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করা দরকার।

এ দু'আটি-ই সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) করছিলেন। তিনি তাঁর দু-তিনজন গোয়েন্দা ব্যবিলন পাঠিয়ে রেখেছিলেন, যারা অন্যান্য বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে পালিয়ে-যাওয়া-নাগরিকের বেশে ওখানে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করলেন। এই গোয়েন্দারা-ই ব্যবিলনের নাগরিকদের মাঝে

এই আবহটা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আমাদের সেনাবাহিনী কাপুরুষ ও দুর্বল; তারা দুর্গের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করতে ভয় পায়। আল্লাহ সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর দু'আ কবুল করলেন। মুকাওকিস বললেন, বাহিনীকে নগরীর বাইরে গিয়ে খোলা মাঠে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করা হোক এবং পরিকল্পনার কোনো একটি দিকও যেন দুর্বল না থাকে।

* * *

দুদিন পরই সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন, আগামী কাল সকালে ফজর নামাযের পর আমরা ব্যবিলনের উদ্দেশে রওনা হব এবং নগরীটা অবরোধ করে ফেলব। এমনটি আশা করার কোনোই কারণ ছিল না যে, রোমানরা দুর্গের বাইরে এসে লড়াই করবে। কিন্তু যোহরের নামায থেকে অবসর হওয়ামাত্র ব্যবিলন থেকে এক গোয়েন্দা এসে সংবাদ জানালেন, রোমানরা দুর্গ থেকে বের হয়ে খোলা মাঠে এসে লড়াই করবে। তিনি ব্যবিলনের বাহিনীকে খোলা মাঠে মহড়া করতেও দেখেছেন। তিনি এ তথ্যও নিয়ে এসেছেন যে, এখন আর মুকাওকিস ও থিওডোর অবরোধে আসবেন না; বরং ব্যবিলন থেকে দূরে এসে মুসলিম বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করবেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) তখনই তাঁর সালারদের তলব করলেন এবং সুসংবাদের ধারায় রিপোর্টটি শোনালেন। সালারগণ সংবাদটি শুনে অনেক খুশি হলেন। তাঁদের পুরোপুরি আশা ছিল, খোলা মাঠের যুদ্ধে রোমান বাহিনীকে তাঁরা টিকতে দেবেন না। আমর ইবনে আস (রাযি.) সর্বাগ্রে সেই জায়গাটি নির্বাচন করলেন, যেখানে এনে রোমান বাহিনীকে তাঁর লড়াতে হবে। তারপর সালারদের যুদ্ধের বিন্যাস বুঝিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, রোমান বাহিনী নগরী থেকে বের হয়ে কোনো স্থানে আমাদের চ্যালেঞ্জ করার আগেই দ্রুত পথ চলে নিজেদের পছন্দের জায়গায় পৌঁছে যেতে হবে। তারপর রোমান বাহিনী ওখানে আসতে বাধ্য হবে।

ঈশার নামাযের পর ব্যবিলন থেকে আরেক গোয়েন্দা এলেন। তিনি সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে সংবাদ জানালেন, আজ দুপুরে রোমান বাহিনী নগরী থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং তাদের গতি আইনুশ-শামসের দিকে। এই গোয়েন্দা রোমানদের বাহিনীর সংখ্যাও জানালেন, যা কিনা মুজাহিদদের সংখ্যা থেকে কয়েক গুণ বেশি।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) ঈশার নামাযের ইমামত করলেন। সালাম ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন :

'এ-ই প্রথমবার রোমান বাহিনী খোলা মাঠে আসছে এবং তাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তোমরা কখনও সংখ্যার পরোয়া করনি। আমরা কি বিশ্বাস করি না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন, যিনি সংখ্যায় আমরা এত অল্প হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে নীলনদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন? ইসলামের সৈনিকগণ! একটি কথা আমি আগেও কয়েকবার বলেছি; এখনও বলব যে, রণাঙ্গন থেকে যদি আমাদের পা উপড়ে যায়, তা হলে আমরা একজনও জীবন নিয়ে ফিরতে পারব না। মিশরের মাটিতে আমাদের নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। ইসলামের জন্য মিশরের দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।'

এই ভাষণের পর আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন, আমরা সকালে ফজর নামাযের পর-পরই রওনা হব। বাহিনীকে তিনি রাতেই অবহিত করে রেখেছেন, রোমানরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং তারা খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে।

ইতিহাস বলছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর যুদ্ধরীতি ও রণকৌশল ঠিক হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাযি.)-এর অনুরূপ ছিল। যারপরনাই ভয়ানক ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিহাসনির্মাতা এ দুই সিপাহসালার একই রকম ছিলেন। আমর ইবনে আস সালারদের সেনাবিন্যাস বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আরও একটি পদক্ষেপ নিলেন। পাঁচ-পাঁচশো জানবাজের দুটি ইউনিট তিনি আলাদা করে নিলেন। একটির নেতৃত্ব খারেজা ইবনে হুযাফা আর অপরটির নেতৃত্ব মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের হাতে অর্পণ করলেন। এরা দুজনই সাহাবি ছিলেন এবং সহযোগী বাহিনীর সঙ্গে এক-একটি ইউনিটের সালারের মর্যাদা নিয়ে মদিনা থেকে এসেছেন।

আইনুশ-শামস ও ব্যবিলনের মধ্যবর্তী এলাকায় কিছু অঞ্চল ছিল পাহাড়ি, যেখানে প্রশস্ত অনেকগুলো গুহাও ছিল। এলাকাটার নাম বনুওয়ায়েল। আমর ইবনে আস একটি জানবাজ ইউনিটকে বনুওয়ায়েলের গুহাগুলোর দিকে পাঠিয়ে দিলেন আর অপরটিকে বলে দিলেন, তোমরা উম্মেদানিনের সন্নিকটস্থ পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকো।

এই দুটি ইউনিটকে রাতেই রওনা করিয়ে দেওয়া হলো, যেন শত্রুবাহিনী জানতে না পারে।

ফজর নামাযের পরপরই অবশিষ্ট বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তারা যেখানে গিয়ে পৌঁছল, সেই জায়গাটার নাম এখন আব্বাসিয়া। সেকালে বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলটি মরুভূমি ছিল। যথারীতি নানা বেশে আগেই গোয়েন্দা পাঠিয়ে রাখা হয়েছিল।

ওদিকে রোমানরাও গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিল, যারা গিয়ে থিওডোরকে সংবাদ দিল, মুসলিম বাহিনী আব্বাসিয়ার দিকে আসছে। খবরটি শুনে থিওডোর খুবই

আনন্দিত হলেন। তিনি তার সেনাপতিদের বললেন, আমার বিশ্বাস ছিল, মুসলমানরা আইনুশ শামসের পরিত্যাক্ত নগরীর অঞ্চলের বাইরে আসবে না এবং তাদের মেরে-পিটে তাড়ানো আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হবে।

থিওডোর তার বাহিনীকে ওখানেই থামিয়ে দিলেন।

'রোমসাম্রাজ্যের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকগণ!– থিওডোর উচ্চকণ্ঠে ও আবেগময় ভাষায় তার বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন– 'শত্রুরা এ যাবত তোমাদের কাপুরুষ ও দুর্বল মনে করে আসছে। এখন তারা তোমাদের মুখোমুখি লড়াই করতে আসছে। তাদের সংখ্যা তোমাদের অর্ধেকও নয়। আজ তোমরা প্রমাণ করে দেখাও কাপুরুষ কারা। যদি তোমরা এই ময়দান থেকে পিছনে সরে যাও, তা হলে এই উর্বর ও প্রাচুর্যময় দেশটি থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়ে যাবে। রোমসাম্রাজ্য রোম-উপসাগরের ওপারেই কোণঠাসা হয়ে যাবে। তারপর মুসলমানদের দাসত্ববরণ কিংবা রোম-উপসাগরে ডুবে মরা তোমাদের ভাগ্যলিপি হয়ে যাবে। তোমরা শপথ নাও, আজ এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের কেটে মরুভূমিতে ফেলে দেবে।'

ইতিহাসে এসেছে, সমগ্র বাহিনী গগনবিদারী আওয়াজ তুলে সেদিন খোদার নামে শপথ নিয়েছিল, তারা হয় বিজয় অর্জন করবে, নাহয় জীবন দিয়ে দেবে।

* * *

রণাঙ্গন আইনুশ-শাম্স ও ব্যবিলন থেকে দূরে নয়। সূর্য যখন মাথার উপর উঠে এল, ততক্ষণে দুদিককার বাহিনী মুখোমুখি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আমর ইবনে আস (রাযি.) মাঝের ইউনিটগুলোর সম্মুখে ঘোড়ার পিঠে বসা। ওদিকে রোমান সেনাপতি থিওডোরও তার বাহিনীর মধ্যখানে অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর আদেশে তাঁর এক দেহরক্ষী অশ্বারোহী সমানের দিকে এগিয়ে গেল এবং রোমান বাহিনীকে উদ্দেশ করে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানাল, আক্রমণ তোমরা শুরু করো, যাতে তোমাদের মনে আক্ষেপ না থাকে, আরবরা তোমাদের সুযোগ দেয়নি।

এই ঘোষণা শেষ হতে-না-হতেই রোমান সেনাপতি থিওডোর আক্রমণের আদেশ দিয়ে দিলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী উভয় পার্শ্বের ইউনিটগুলো আরও অধিক ডানে-বাঁয়ে চলে গেল। সিপাহসালার দেখলেন, রোমান বাহিনী একটা জটলার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পূর্ব থেকেই তিনি এমনটিই আশা রাখছিলেন এবং মুজাহিদদের সেই অনুপাতেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর উভয় পার্শ্বের ইউনিটগুলো যখন বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেই অনুপাতে রোমান সৈনিকদেরও ছড়িয়ে যেতে হলো। আমর ইবনে আস এটিই চাচ্ছিলেন। আমর ইবনে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে রোমান বাহিনীর মুখোমুখি চলে গেলেন এবং নিজের ইউনিটগুলোকে বললেন, তোমরা লড়াই করতে-করতে পেছনের দিকে সরে আসো, যাতে শত্রুবাহিনী আরও সামনের দিকে চলে আসে।

ইতিহাস এই যুদ্ধের নাম দিয়েছে 'আইনুশ-শামসের লড়াই'। মন্তব্য করেছে, মিশরে যতগুলো লড়াই হয়েছিল, সবগুলোর মধ্যে এটি-ই ছিল সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী ও ঘোরতর। জায়গাটা ছিল এমন মরুভূমি, যেখানে বালির সঙ্গে মাটিও ছিল। ফলে এত বেশি ধূলি উত্থিত হলো যে, উভয় বাহিনীরই সৈন্যরা তাতে হারিয়ে গেল এবং শত্রু-বন্ধু পার্থক্য করা দুষ্কর হয়ে গিয়েছিল।

মুজাহিদদের যে-ইউনিটগুলো ডানে-বাঁয়ে চলে গিয়েছিল, তাদের সালার তাদের দুশমনের পার্শ্বে নিয়ে গেলেন এবং উভয় পার্শ্ব থেকে আক্রমণ চালালেন। তার ফলে শত্রুবাহিনীর সেনারা কর্তিত ও ধরাশায়ী হতে লাগল। এ কৌশলে আরেকটি উপকার এই হলো যে, উভয় বাহুর চাপে রোমান বাহিনী ভেতরেই জড়ো হয়ে যেতে বাধ্য হলো, যার ফলে তাদের নড়াচড়া করার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। বিপুলসংখ্যক সৈন্য অল্প জায়গায় ঠেসে যেতে বাধ্য হলো। তাদের ঘোড়াগুলো সম্মুখ-পেছন ও ডান-বাম থেকে একটা অপরটার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল।

বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনাকে কাবু করতে এমন কৌশলই অবলম্বন করতে হয়। সুবিজ্ঞ সেনাধিনায়ক আমর ইবনে আস (রাযি.) এখানে এই কৌশলটি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু শত্রুসেনার সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, মনে হতে লাগল, তারা মুসলিম সেনাদের উপর ছেয়ে যাবে। থিওডোরও ভালো-ভালো কৌশলই ঠিক করছিলেন এবং তার আদেশ-নিষেধ অতি দ্রুততার সঙ্গে অপরাপর সেনাপতিদের পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল।

এভাবে কোণঠাসা ও অসহায় হতে দেখে থিওডোর তার বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে নিলেন এবং পুনরায় ছড়িয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল, রোমান বাহিনী যে-শপথ নিয়েছিল, তা পূরণ না করে ছাড়বে না। থিওডোর পুনরায় আক্রমণ চালালেন। এবারকার আক্রমণ সফল হতে যাচ্ছে বলেই মনে হলো। তিনি মুজাহিদদের বিস্তৃতি অনুপাতে নিজের বাহিনীকেও ছড়িয়ে দিলেন।

ধূলি-বালির মাঝে লুকিয়ে-লুকিয়ে আকাশের সূর্যটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এখন তার অবস্থান পশ্চিম আকাশে। এতক্ষণে মুজাহিদরা তাঁদের সেনাপতিদের

নেতৃত্বে পুনরায় সেই পজিশন অর্জন করে নিলেন যে, রোমানরা আবারও ভেতরের দিকে গুটিয়ে গেল। এই অবস্থায় হঠাৎ পেছন থেকে তাদের উপর যেন কেয়ামতের বিভীষিকা ছুটে এল।

এরা বনুওয়ায়েলের গুহাগুলোতে লুকিয়ে থাকা সেই নির্বাচিত পাঁচশো জানবাজ, যারা ওখানে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। সিপাহসালার আমর ইবনে আস দূত পাঠিয়ে তাঁদের নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। তাঁরা উল্কার মতো ছুটে এসে পেছন থেকে রোমান বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসলেন।

রোমানরা বুঝে ফেলল, এরা মুসলমানদেরই আরেকটি বাহিনী, যারা পেছন থেকে এসেছে। থিওডোরের ভাষণ আর শপথ রোমান বাহিনীর যে-ভীতি-আতঙ্ককে চাপা দিয়ে রেখেছিল, মুসলিম বাহিনীর অভাবিত এই আক্রমণ তা আবারও জাগিয়ে তুলল। রোমান বাহিনীর মনে চরম হতাশা ও কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলমান-ভীতি তাদের পুনরায় ঝাঁপটে ধরল।

রোমান বাহিনী সাহস হারিয়ে ফেলল এবং হুড়মুড় করে রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে রুদ্ধশ্বাসে উম্মেদানিনের দিকে পালাতে শুরু করল। তাদের মাঝে চরম হতাশা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সারিবদ্ধতা ও বিন্যাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারা ভয়-পাওয়া-মেষপালের মতো উম্মেদানিনের দিকে বেরিয়ে গেল।

যেইমাত্র তারা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অতিক্রম করতে শুরু করল, অমনি নির্বাচিত মুসলিম জানবাজদের অপর দলটি বেরিয়ে এল এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, এবার রোমানরা বুঝে ফেলল, মুসলমানদের একটি নয়– তিনটি বাহিনী। রোমানদের কোনো বিন্যাস ছিল না এবং তারা সেনাপতিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। তারা এতই সন্ত্রস্ত ছিল যে, আত্মরক্ষার লড়াইও তারা লড়ল না। কেবলই পিছু হটার আর জীবন রক্ষার্থে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তটস্থ ছিল। আরব জানবাজরা তাদের এমন গণহারে হত্যা করল যে, কোনো রোমান তাদের সেই আক্রমণ থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল কিনা বলা মুশকিল।

এটি হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাযি.)-এর সেই বিশেষ রণকৌশল ছিল, যার মাধ্যমে তিনি এর চেয়েও বেশিসংখ্যক রোমান সৈন্যকে অসহায় ও কোণঠাসা করে ধ্বংস করে দিতেন।

পালিয়ে-যাওয়া বহু রোমান সৈন্য ব্যবিলন দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। ব্যবিলনের সৈন্যরা তাদের কাছ থেকে আইনুশ-শাম্‌স যুদ্ধের কাহিনী শুনল। পূর্ব থেকে আতঙ্কগ্রস্ত বাহিনীটি আরও আতঙ্কিত হয়ে ওখান থেকে পালাতে শুরু করল। নীলনদের কূলে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য বিপুলসংখ্যক নৌকা বাঁধা ছিল। তারা

ওগুলোতে গিয়ে চড়ে বসল এবং মাঝি-মাল্লাদের বাধ্য করে নদীর ওপার চলে গেল।

মুকাওকিস ব্যবিলনেই ছিলেন। তিনি তার বাহিনীর এই পরিণতি দেখছিলেন। কিন্তু তার অসহায়ত্বের অবস্থা এমন ছিল যে, জীবন রক্ষার এই কসরত ও বিশৃঙ্খলার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাহিনীর এই মানসিক অবস্থার মধ্যে যদি তিনি তাদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করতেন, তা হলে নিজবাহিনীর হাতে জীবন হারাতে হবে এমনও আশঙ্কা বিরাজ করছিল।

আমর ইবনে আস (রাযি.) যদি ব্যবিলনের উপর আক্রমণ চালাতেন, তা হলে হয়তবা তিনি এই দুর্গটিও নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু গোয়েন্দারা তাঁকে আগেই তথ্য জানিয়ে রেখেছিল, রোমানরা একদল সৈন্যকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বিপুলসংখ্যক সৈন্য ব্যবিলনে প্রস্তুত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। এটি মুকাওকিস ও থিওডোরের সতর্কতামূলক আয়োজন ছিল। তাদের অনুভূতি ছিল, বাহিনী তাদের পিছপাও হতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে মুসলমানরা ব্যবিলনের উপর আক্রমণ চালাতে পারে। সেজন্য তারা ব্যবিলনেরও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছিলেন। আমর ইবনে আস ভেবে-চিন্তে ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যবিলনের উপর শক্তি ব্যয় করার চেয়ে বাইরে যেসব রোমান সৈন্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আশ্রয়ের খোঁজে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ধরে-ধরে তাদের খতম করা-ই বেশি ভালো হবে।

কয়েকজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, কয়েকজন সেনা-অফিসার এস্কান্দারিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। যেসব রোমান সৈন্য মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল, কোনো ঐতিহাসিকই তাদের সংখ্যা লিখেননি। শুধু লিখেছেন, এ যুদ্ধে রোমানদের জীবনহানির কোনো শুমার ছিল না।

ইসলামের সৈনিকরা আরও এক-দুটি দুর্গ বিনাযুদ্ধে নিয়ে নিলেন। কিন্তু তাঁদের আসল জয় ছিল, রোমানদের গোটা বাহিনীর উপর মুসলমানদের আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা যুদ্ধের সাহস ও মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল।

* * *

হেরাক্ল মুকাওকিসকে ক্ষমা করবেন সেই সম্ভাবনা একদম তিরোহিত হয়ে গেল। শহর-নগর ও দুর্গ-কেল্লার কথা আলাদা। মুসলমানরা এ যাবত যে-বিজয় অর্জন করে ফেলেছে, তাতে নীলনদের উভয় তীরও তাদের আধিপত্যে এসে পড়েছে। মুকাওকিস হেরাক্লকে নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছিলেন, আরবের এই বদ্দুদের তিনি নীল পর্যন্ত পৌছতেই দেবেন না। আইনুশ-শামস-এর যুদ্ধের ফলে

রোমান বাহিনী যেভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়েছে, তাতে ফাউমের সমগ্র অঞ্চল শূন্য হয়ে গেছে। আমর ইবনে আস (রাযি.) এগিয়ে গিয়ে সেগুলো সব দখল করে নিলেন।

ফাউমের আলোচনা বিগত অধ্যায়ে এসেছে। অঞ্চলটি এতই বিশাল ও বিস্তৃত ছিল যে, মিশরের একটি প্রদেশের মর্যাদা তার অর্জিত ছিল। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নির্দেশে এই প্রদেশের বড়-বড় শহরগুলোতে মুসলমানদের গভর্নরগণ পৌঁছে গেছেন এবং তাঁরা ওখানকার নাগরিকদের কাছ থেকে ট্যাক্স উসুল করতে শুরু করেছেন। ইতিহাসে এসেছে, জনসাধারণের উপরও মুসলমানদের এমন প্রভাব বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তারা কোনো প্রকার আপত্তি না করে ট্যাক্স দিতে শুরু করে দিল। ইতিহাসে একথাও এসেছে যে, জনসাধারণের মাঝে একটি কথা ছড়িয়ে পড়েছিল, বিজেতা মুসলমানরা রোমান বাহিনীর অফিসার ও প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ধরে শিকলে বেঁধে ফেলছে এবং পরে তাদের সিপাহসালারের সামনে নিয়ে হাজির করছে আর তিনি তাদের শাস্তি দিচ্ছেন। এ প্রদেশে যাঁদের গভর্নর ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হলো, আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁদের কঠোর ভাষায় আদেশ দিলেন, নাগরিকদের থেকে যার-যার অবস্থা অনুপাতে ট্যাক্স উসুল করবে এবং কেউ যেন কোনো প্রকার অভিযোগ আরোপের সুযোগ না পায়।

হেরাক্‌ল-এর কাছে এই পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছানো মুকাওকিসের কর্তব্য ছিল। হেরাক্‌ল-এর প্রতিক্রিয়াও যে খুবই কড়া হবে তাও মুকাওকিসের জানা ছিল। মুকাওকিস ইতিমধ্যেই দেখেছেন, হেরাক্‌ল শামের পরাজয় ও সেখান থেকে পিছুহটার সব দায় তার মাথায় রেখেছেন। তিনি হেরাক্‌ল-এর নামে বার্তা লেখালেন এবং পত্রখানা একজন দূতের হাতে দিয়ে তাকে বাজিন্তিয়ার উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিলেন।

* * *

লোকদুটো মেয়েটাকে নিয়ে এস্কান্দারিয়া পৌঁছে গেল। ওখান থেকে সামুদ্রিক জাহাজে করে বাজিন্তিয়া পৌঁছে যাবে। তারা নিজেরা সাধারণ মানুষের পোশাক পরেছে এবং মেয়েটাকেও একজন হতদরিদ্র নারীর বেশ ধরিয়ে দিয়েছে। তার মাথা ও মুখমণ্ডল এমনভাবে ঢাকা যে, চোখদুটো ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এস্কান্দারিয়া পৌঁছে তারা জানতে পারল, জাহাজ দুদিন পর রওনা হবে। তারা দুদিনের জন্য একটা সরাইখানায় উঠে গেল।

সরাইখানাটা বন্দরের সন্নিকটেই ছিল। এখানে সাধারণত জাহাজের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ যাত্রীরা এসে আশ্রয় নিত। যখন একটি জাহাজ প্রস্তুত হয়ে যেত,

তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন বা অন্য কোনো কর্মকর্তা এসে ঘোষণা দিত, জাহাজ কাল অমুক সময় রওনা হবে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও কমকর্তা-কর্মচারীরা সরাইখানায় এসে খানা খেত।

বাজিন্তিয়ার দিককার রোম-উপসাগরের উপকূলগামী নৌজাহাজ প্রস্তুত হচ্ছিল। এক দিন আগে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন সরাইখানায় এলেন। তিনি দেখতে এসেছেন, এখানে কতজন যাত্রী আছে। যাত্রীরা সংবাদ পেল, জাহাজের ক্যাপ্টেন এসেছেন। তারা সবাই বাইরে বেরিয়ে এল।

ঘটনাচক্রে ক্যাপ্টেন মেয়েটাকে দেখে ফেললেন। সে-সময় তার মুখের উপর নেকাব ছিল না। ক্যাপ্টেন মেয়েটার রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানতে পারলেন, এই মেয়েটাও তার জাহাজের যাত্রী হচ্ছে।

সেকালে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা জাহাজে নিজেদের রাজা মনে করতেন এবং সাধারণত তারা খুবই অসচ্চরিত্র ও অপরাধপ্রবণ হতেন। মেয়েটার উপর এই ক্যাপ্টেনের কুদৃষ্টি আটকে গেল।

ক্যাপ্টেন চলে গেলে কিছুক্ষণ পর জাহাজের অপর এক কর্মকর্তা সরাইখানায় এল এবং অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মাঝে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সে মেয়েটার সঙ্গী পুরুষদুজনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলল, যেন সাক্ষাৎটা এমনিতেই হয়ে গেছে। অথচ, সে ক্যাপ্টেনের পাঠানো লোক এবং আয়োজনটা মেয়েটাকে ফাঁসানোর জন্য করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সাথে এই মেয়েটা কে? তোমাদের সঙ্গে কেন এসেছে? তারা বলল, এ আমাদের সহযাত্রী; আমাদের সঙ্গে যাবে। কর্মকর্তা বলল, এই বয়সের মেয়েরা জাহাজে যেতে পারে না। অন্য কোনো জাহাজ নিলেও একে আমরা নেব না। তোমরা পরবর্তী জাহাজের অপেক্ষা করো। মাসখানেক পরই আরেক জাহাজ এখান থেকে নোঙর তুলবে।

শুনে লোকদুজন বিচলিত হয়ে উঠল। এত দিন অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। তারা মিশরের গভর্নরের আদেশ পালন করছে এ তেমন কোনো বিষয় নয়। হেরাক্ল-এর সঙ্গেও তাদের এমন কোনো শত্রুতা নেই যে, তাকে তাদের হত্যা করতেই হবে। লক্ষ্য তাদের সেই উপঢৌকন, যা কিনা এই মিশনটি বাস্তবায়ন করতে পারলে তাদের হাতে আসবার কথা। এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা তারা করতে পারবে না। অন্যথায় এর মধ্যে মুকাওকিস তার সিদ্ধান্ত পালটেও ফেলতে পারেন। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখন কোন দিকে মোড় নেয়, তাও তো বলা যায় না। কাজেই যে করেই হোক তাদের এ জাহাজে করেই যেতে হবে এবং মেয়েটাকে

নিয়েই যেতে হবে। তারা জাহাজ-কর্মকর্তাকে স্বার্থের টোপ দিল। বলল, যেভাবে হোক আমাদের নিয়ে যাও; আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। বলো, আমাদের কী করতে হবে।

'খুবই কঠিন কাজ'– জাহাজ-কর্মকর্তা ঘুষের রেট বাড়ানোর লক্ষ্যে বলল– 'একে পুরুষের পোশাক পরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এত দীর্ঘ সফরে একে ক্যাপ্টেনের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে। ক্যাপ্টেন খুবই নির্দয় ও নির্মম মানুষ। ধরা পড়ে গেলে একে তুলে নদীতে ফেলে দেবেন।'

'তারা ঘুষের রেট বাড়িয়ে দিল এবং অনুনয়ের সাথে বলল, জাহাজে একে লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের। আপনি শুধু একে সাথে নেওয়ার অনুমতি দিন। কিন্তু তারা জানতে চাইল না, মেয়েটাকে আমরা কেন নিতে পারব না? মেয়েমানুষ জাহাজের যাত্রী হতে পারে না? এটা কার আদেশ? তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর সেই ঐশ্বর্য সওয়ার হয়ে ছিল, যা কিনা তাদের পাওয়ার কথা।

অবশেষে জাহাজ-কর্মকর্তা দাবি অনুসারে উৎকোচ নিয়ে তাদের বলল, তোমাদের কোনো পোশাক থাকলে বের করো। তারা এক স্যুট পোশাক বের করে দিল। কর্মকর্তা কক্ষের দরজা বন্ধ করে মেয়েটাকে পোশাকগুলো পরাল। তারপর তার মাথা ও মুখের কিছু অংশ এমনভাবে ঢেকে দিল, যেমন করে মানুষ মরুভূমির সফরের সময় কিংবা এমনিতেই ঢেকে নেয়। অবশেষে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে যাচাই করে জাহাজ-কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন, এখন আর একে কেউ চিনতে পারবে না।

'কিন্তু আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি'– জাহাজ-কর্মকর্তা বলল– 'জাহাজে আমি মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখার পুরোপুরি চেষ্টা করব। কিন্তু ক্যাপ্টেন যদি টের পেয়ে যান কিংবা তিনি যদি মেয়েটাকে দেখে ফেলেন, তখন আর আমার কিছু করার থাকবে না। তার থেকে একে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের।

* * *

পরদিন যাত্রীরা বন্দরে গিয়ে জাহাজে চড়তে শুরু করল। এরা দুজনও মেয়েটাকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে সঙ্গে করে জাহাজে উঠে গেল। জাহাজের একজন লোকও দেখল না, অল্প বয়সের একটা মনকাড়া সুন্দরী মেয়ে জাহাজে উঠে গেছে। ভাড়া উসুলকারী ভাড়া আদায় করে নিল। দ্বিতল জাহাজটা বেশ বড়সড় ছিল। অনেক যাত্রীরও সমাগম; আবার জায়গাও প্রচুর। একজায়গায় জাহাজের মালপত্র পড়ে ছিল এবং বাড়তি পালগুলোও ওখানে পেঁচিয়ে রাখা ছিল।

যাত্রীরা যার-যার জায়গা বেছে নিচ্ছে এবং আপন-আপন মালামাল গুছিয়ে রাখছে। এমন সময় যে-কর্মকর্তা এদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল, সে এসে মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পাল রাখার স্থানে খানিক গভীর জায়গা ছিল। কর্মকর্তা মেয়েটাকে ওখানে বসিয়ে দিল এবং পালের একটা অংশ তার উপর ছড়িয়ে দিল। এখন আর মেয়েটাকে কারুর দেখবার কোনোই জো নেই।

মেয়েটা সরল-সোজা কোনো গ্রাম্য নারী নয় যে, কোনো বাদ-প্রতিবাদ না করে ভেড়া-বকরির মতো যেখানে বেঁধে রাখবে, সেখানেই পড়ে থাকবে। এক অতিশয় চতুর ও প্রবঞ্চক বাইজি-নর্তকী মায়ের কন্যা ও। এই কচি বয়সেই সেয়ানা-সেয়ানা পুরুষদের আঙুলের ইশারায় নাচানোর বিদ্যা অর্জন করেছে। মেয়েটার সবচেয়ে বড় ও কার্যকর অস্ত্র হলো দৈহিক সুষমা, তারুণ্য আর সেই প্রশিক্ষণ, যা সে তার মায়ের কাছ থেকে লাভ করেছে। সে কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করল, জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছতে কদিন সময় লাগবে?

'স্বাভাবিক হিসাবে দশ থেকে বারো দিন লাগবার কথা'– কর্মকর্তা উত্তর দিল– 'কিন্তু তা নির্ভর করে বাতাসের উপর। বাতাস যদি অনুকূল থাকে আর জোরালো হয়, তা হলে জাহাজও দ্রুত চলবে। অন্যথায় পনেরো-বিশ দিনও লেগে যেতে পারে। আর যদি মাঝনদিতে ঝড়ের কবলে পড়ে যাই, তা হলে বলা মুশকিল ঝড় জাহাজকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে।'

'তার মানে কি এই যে, এতগুলো দিন আমাকে এখানেই লুকিয়ে বসে থাকতে হবে?' মেয়েটি বিমর্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'না'– কর্মকর্তা উত্তর দিল– 'প্রথম কথা হলো, এ পোশাকে তোমাকে কেউ চিনতেই পারবে না। ফলে সারাক্ষণ লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন হবে না। এখন তো এনে আমি তোমাকে জায়গাটা চিনিয়ে দিলাম যে, যখন প্রয়োজন হবে, এখানে এসে লুকোবে। দ্বিতীয়ত, ক্যাপ্টেন সব সময় বাইরে ঘোরাফেরা করেন না; দিনের বেলা কিছু সময় ঘুমান। তখন আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে জাহাজের ছাদে পাঠিয়ে দেব আর তুমি নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াবে।'

মেয়েটিকে ওখানে বসিয়ে রেখে লোকটি সরাসরি ক্যাপ্টেনের কাছে চলে গেল এবং বলল, আপনার শিকার এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেনকে সে মেয়েটির অবস্থানের জায়গাটা চিহ্নিত করে দিল। ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে কিছু পুরস্কার দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন।

জাহাজের নোঙর উঠে গেল। কর্মচারীরা জাহাজের পাল উড়িয়ে দিল। জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে খোলা সমুদ্রের দিকে এগুতে শুরু করল।

দিনভর দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যাবেলা সূর্যটা সমুদ্রের মাঝে ডুবতে শুরু করেছে। এখন আর ডাঙার কোনো নাম-চিহ্নও চোখে পড়ছে না। যেদিকেই চোখ যাচ্ছে শুধু পানি আর পানি। মেয়েটা সারাটা দিনে দু-তিনবার বের হলো এবং জাহাজের ছাদে উঠে সমুদ্রের মনকাড়া দৃশ্য উপভোগ করল। এটা তার জীবনের প্রথম নৌভ্রমণ। সে নিজের লোকদের কাছে বসা ছিল। এমন সময় জাহাজের সেই কর্মকর্তা এসে বলল, পানাহার সেরে এক্ষুনি জায়গামতো চলে যাও এবং রাতটা ওখানেই কাটাও। সে মেয়েটিকে নিশ্চয়তা দিল, ওখানে তোমার ধরা খাওয়ার কোনোই ভয় নেই।

নিজের লোকদের সাথে বসে খানা খেয়ে মেয়েটি লুকানোর জায়গায় চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

যাত্রীরা সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জাহাজের রাতের ডিউটির জনাকয়েক কর্মকর্তা-কর্মচারী সজাগ আছে শুধু। ক্যাপ্টেন তার ক্যাবিন থেকে বের হলেন এবং সোজা সেই জায়গাটায় চলে গেলেন, যেখানে মেয়েটা গুটিয়ে-রাখা-পালের আড়ালে লুকিয়ে শুয়ে আছে। ক্যাপ্টেন মেয়েটার পায়ে আলতো খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুললেন। মেয়েটা হঠাৎ বিড়বিড়িয়ে উঠে বসল।

'কে তুমি?'– ক্যাপ্টেন প্রভাবদীপ্ত কণ্ঠে ও শাসনের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন– 'এখানে শুয়ে আছ কেন?'

'আমি জাহাজের যাত্রী'– মেয়েটি উত্তর দিল– 'এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর হঠাৎ চোখ লেগে গেল।'

ক্যাপ্টেন মেয়েটার বাহু ধরে তুলে দাঁড় করালেন এবং মাথার কাপড়টা সরিয়ে দিলেন। মেয়েটার গুটিয়ে রাখা লম্বা চুলগুলো খুলে গেল এবং কাঁধ ও পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়ল। তার পরিধানে পুরুষালি পোশাক ছিল বটে; কিন্তু কণ্ঠ তো পুরুষোচিত বানানো যায় না।

'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ!'– ক্যাপ্টেন রাগান্বিত গলায় বললেন এবং মেয়েটাকে টেনে বের করে আনলেন– 'একা, নাকি সঙ্গে কেউ আছে?'

ক্যাপ্টেনের জানা ছিল, মেয়েটার সঙ্গে দুজন পুরুষ মানুষ আছে। কিন্তু বোঝাতে চাচ্ছেন, তিনি কিছুই জানেন না এবং কর্তব্যের তাগিদে এমনিতেই এখানে এসেছেন।

মেয়েটি বলল, আমার সঙ্গে দুজন পুরুষ আছে। কিন্তু জাহাজেরই একলোক ভাড়ার অতিরিক্ত উৎকোচ নিয়ে পুরুষের পোশাকে তাকে জাহাজের যাত্রী হতে দিয়েছে সেকথাটা চেপে গেল।

'আমি তোমাকে সমুদ্রে ফেলে দেব।' ক্যাপ্টেন একটা টান মেরে মেয়েটাকে নিজের কাছে নিয়ে নিলেন।

মেয়েটি নিজের রূপ-যৌবন সম্পর্কে অবহিত ছিল। পুরুষের দুর্বলতার জায়গাটাও তার চেনা ছিল। ক্যাপ্টেন যেইমাত্র ঝটকা মেরে তাকে কাছে টেনে নিল, সঙ্গে-সঙ্গে সে জেনে-বুঝে ক্যাপ্টেনের বুকের সঙ্গে লেগে গেল এবং নিজের একটা বাহু তার গলার উপর ছেড়ে দিল। তারপর একটা গণ্ড ক্যাপ্টেনের একটা গালের সঙ্গে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমাকে আলোতে নিয়ে দেখো'– মেয়েটি বলল– 'এমন দামি জিনিস কোনো পাগলই কেবল সমুদ্রে ফেলে দিতে পারে।'

ক্যাপ্টেন তো এসেছিলেনই এ মতলবে। তিনি মেয়েটাকে বাহুতে ধরে নিজের ক্যাবিনে নিয়ে গেলেন। এই মেয়েটিকে তিনি সরাইখানায় দেখেছিলেন। কিন্তু দেখেছিলেন দূর থেকে শুধু চেহারাটা। এবার একান্ত কাছে থেকে ভালো করে দেখলেন। তার চমকদার রেশমি চুল দেখে ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলেন এর মূল্য কত। এমন নারী সাধারণত রাজা-বাদশাদের হেরেমেই দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েটা একদম স্বাভাবিক; চেহারায় ভয়ের কোনোই ছাপ নেই।

'দেখো মেয়ে!'– ক্যাপ্টেন বললেন– 'এটা মৃত্যুর বয়স নয়। আমি ঝুঁকি বরণ করে নিচ্ছি। এই সফরে তুমি আমার কক্ষে থাকবে। তোমার জন্য আমি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর আইন অমান্য করছি।'

ক্যাপ্টেন মদের বোতল ও গ্লাস বের করলেন। নিজেও পান করতে লাগলেন এবং মেয়েটিকেও দিলেন। মেয়েটি অবলীলায় মদের গ্লাসে চুমুক দিল। মেয়েটি রাতটা ক্যাপ্টেনের কক্ষে কাটিয়ে দিল।

সকালে ক্যাপ্টেন মেয়েটির সঙ্গী পুরুষদের কাজে গিয়ে তাদের শাসালেন, তোমরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। কিন্তু মেয়েটা এতই সরল-সহজ ও নিষ্পাপ যে, ওর জন্য আমার মায়া ধরে গেছে। অন্যথায় পরবর্তী বন্দরে পৌঁছেই আমি ওকে গ্রেফতার করিয়ে নিতাম এবং শাস্তির সম্মুখিন করতাম। তারপর বললেন, এখন মেয়েটাকে আমি নিজেই লুকিয়ে রাখব। লোকদুজন চুপচাপ রইল– কোনো কথা বলল না। মেয়েটি জাহাজে কোথায় কীভাবে থাকছে সেই ভাবনা ভাববার গরজই তারা বোধ করল না।

মেয়েটি তিন-চার দিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কাটাল। পুরুষালি পোশাক খুলে এখন সে মেয়েলি পোশাকই পরছে। ক্যাপ্টেন তাকে অত্যন্ত উন্নত মানের খাবার খাওয়াচ্ছেন এবং রাতে মদও পান করাচ্ছেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মেয়েটি পুরোপুরি স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম হয়ে গেছে।

তিন-চার দিন পর রাতে মেয়েটি মদ খানিক বেশিই পান করল। মধ্যবয়সী ক্যাপ্টেন বেশ প্রাণবন্ত ও ফুর্তিবাজ মানুষ। আমোদের এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে নানা অশালীন আচরণ করতে-করতে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, তোমার মতো রূপসী মেয়ে আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।

'তুমি আমার শুধু রূপ দেখেছ'– মেয়েটি উন্মত্ত কণ্ঠে বলল– 'যখন শুনবে হেরাক্‌ল খুন হয়ে গেছে, তখন জানতে পারবে, আমি শুধু সুন্দরী-ই নই– যার খুশি জীবনও নিতে জানি– তিনি রোমসম্রাট হেরাক্‌লই হন না কেন।'

ক্যাপ্টেন খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তার ধারণা ছিল, কথাটা মেয়েটি রসিকতা করে বলেছে। তার হাসির তোড়ে মেয়েটির কণ্ঠ স্বাভাবিক হয়ে এল।

'মনে করছ, আমি মজাক করছি, না?'– মেয়েটি বলল– 'আমি সম্রাট হেরাক্‌লকে বিষ পান করাতে যাচ্ছি। ওই যে দুজন লোক আমার সঙ্গে আছে; ওরা আমার দেহরক্ষী। কাজ সমাধা করে যখন আমি মিশর ফিরে আসব, তখন গিয়ে আমার সম্পদের ভাণ্ডার দেখে এসো, যা কিনা আমি মিশরের গভর্নরের কাছ থেকে উপঢৌকন পেতে যাচ্ছি।'

কথাটা ক্যাপ্টেনকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন, মেয়েটা এ কী বলল! ছিলেন তিনি মদের নেশায় বুঁদ; কিন্তু মধ্য বয়সে মদ তার জ্ঞানের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। মেয়েটা চতুর ও প্রবঞ্চক বটে; কিন্তু তারুণ্য এখনও তাকে পোক্ত হতে দেয়নি। আর মদ তার বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অপরিপক্বতার কারণে ভেতর থেকে তার গোপন তথ্যটা বিবেকের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন অনুভব করলেন, কথাগুলো সে মদের নেশায় বলছে না; বরং ব্যাপার একটা এখানে আছে অবশ্যই। ফলে তিনি তথ্যটা ভালোভাবে বের করে নিতে চাইলেন।

'সম্রাট হেরাক্‌লকে হত্যার করার সাধ্য কারুর নেই'– ক্যাপ্টেন টোপ ফেললেন– 'আমার নিজেরও মন চাচ্ছে, সম্রাট লোকটাকে মেরে ফেলি। কিন্তু আমার মাঝে এতখানি সাহস নেই যে, আমি তার কাছে পৌঁছে যাব।'

'আমি যাচ্ছি'– মেয়েটি বলল– 'তুমি দেখো; আমি কীভাবে পৌঁছে যাই।'

'কীভাবে যাবে?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন।

'তুমি সরাইখানায় আমাকে একজন সাধারণ গরিব নারীর পোশাকে দেখেছিলে'– মেয়েটি বলল– 'ওটা আমার আসল পোশাক ছিল না। আসল পোশাক আমার ব্যাগে আছে। ওটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে, আমি কোন স্তর ও কোন মানের মেয়ে। আমার সঙ্গে যে-দুজন পুরুষ আছে, তারাও সাধারণ মানুষ নয়। এখন তারা যে-পোশাকে আছে এটা তাদের ছদ্মবেশ। তারা মুকাওকিসের একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক। মানুষের চোখ এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা এই বেশ ধারণ করেছি।'

'কিন্তু আমি ভাবছি'– ক্যাপ্টেন বললেন– 'তোমরা হেরাক্‌ল পর্যন্ত পৌঁছবে কীভাবে?'

'খুব সহজেই পৌঁছে যাব'– মেয়েটি উত্তর দিল– 'ওরা দুজন হেরাক্‌ল-এর সম্মুখে আমাকে মুকাওকিসের পক্ষ থেকে উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করবে। মুকাওকিস আমাকে হেরাক্‌ল-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। আমি তার মদের সঙ্গে সামান্য বিষ মিশিয়ে দেব।'

'বিষ কোথায় পাবে?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন।

'সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছি'– মেয়েটি উত্তর দিল– 'বিষ আমাদের মালপত্রের সাথেই আছে।'

এভাবে মেয়েটি তারুণ্যের নির্বুদ্ধিতা ও মদের আধিক্যের ক্রিয়ায় এমন একটা ঝুঁকিপূর্ণ মিশনের তথ্য ফাঁস করে দিল। ক্যাপ্টেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আরও কথা বের করে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, মেয়েটা বেশি মদপানের কারণে বেফাঁস কথা বলছে না; বরং তার মুখ থেকে সঠিক তথ্যই বের হচ্ছে।

এই মেয়েটি ও তার সঙ্গের পুরুষ লোকদুটির দুর্ভাগ্য আর সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, এই ক্যাপ্টেন লোকটি রোমান ও হেরাক্‌ল-এর সমর্থক ছিল। ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, যে করে হোক এই তথ্য তিনি হেরাক্‌ল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবেন এবং এদের ধরিয়ে দিয়ে তার থেকে পুরস্কার লাভ করবেন।

পরদিন সকালে তিনি মেয়েটির সঙ্গী পুরুষদুজনকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে নিজের লোকদের আদেশ দিলেন, এদের ধরে নিয়ে যাও এবং হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে আটকে রাখো। জাহাজে এমন এক-দুটি কক্ষ ছিল, যেখানে জাহাজের কর্মচারীদের কেউ গুরুতর কোনো অপরাধ করলে বেঁধে রাখা হতো। ক্যাপ্টেনের আদেশে এদের ধরে সেখানে নিয়ে আটকে রাখা হলো।

ক্যাপ্টেন প্রথমে ভেবেছিলেন, মেয়েটিকেও কয়েদখানায় ফেলে রাখবেন। কিন্তু পরে মাথায় চিন্তা এল, তিনজন একত্র হলে বসে-বসে কৌশল আঁটবে আর ওখানে গিয়ে বলবে, ক্যাপ্টেন মিথ্যা বলছে; আমাদের ফাঁসাতে এই বিষ তিনি

নিজে আমাদের মালপত্রের মধ্যে রেখেছেন। কারণ হিসেবে দেখাবে, ইনি আমাদের এই মেয়েটিকে তার কক্ষে রাখতে চেয়েছিলেন আর আমরা তাতে বাঁধা দিয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি মেয়েটিকে হাতে নিয়ে নেব এবং তারই মুখে বলাব, আমাকে গভর্নর মুকাওকিস আমাকে এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। ক্যাপ্টেন অতিশয় ধূর্ত ও অভিজ্ঞ মানুষ। তার সামনে মেয়েটির চালাকি হার মানতে বাধ্য হলো। তিনি মেয়েটির মন জয় করে নিলেন এবং তার পরিকল্পনার সঙ্গে একাত্ম বানিয়ে নিলেন। এ পর্যন্ত আসতে ক্যাপ্টেনকে ছ-সাত দিন সময় ব্যয় করতে হলো। তবে তিনি পুরোপুরি সফল হলেন। মেয়েটিকে তিনি আশ্বস্ত করে তুললেন, সম্রাট হেরাক্ল থেকে আমি তোমাকে এত পরিমাণ পুরস্কার পাইয়ে দেব যে, মুকাওকিসের উপঢৌকনের কথা তুমি ভুলেই যাবে। আরও আশা দিলেন, তুমি চাইলে হেরাক্ল তোমাকে বিবাহ করে রানিও বানিয়ে নিতে পারেন। এহেন লোভনীয় ও সুদর্শন স্বপ্নে বিমোহিত হয়ে মেয়েটি ক্যাপ্টেনের সামনে কাত হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন মেয়েটিকে প্রস্তুত করে নিলেন, হেরাক্ল-এর সামনে অকপটে সে পুরো ঘটনার বিবরণ দেবে।

জাহাজ রোম-উপসাগরের বন্দরে গিয়ে ভিড়ল। এমন বড়-বড় নৌজাহাজের ক্যাপ্টেনদের একটি সীমানা পর্যন্ত কিছু আইনগত অধিকার থাকত, যা-কিনা আজও আছে। ক্যাপ্টেন মেয়েটির সঙ্গী পুরুষদ্বয়কে বন্দিদশা থেকে বের করে আনালেন। নিজেরও চারজন লোক নিলেন। তারপর বাহনের ব্যবস্থা করলেন। অবশেষে জাহাজের এটা-ওটা কাজ সমাধা করে তাদের নিয়ে বাজিন্তিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

ওখান থেকে বাজিন্তিয়ার দূরত্ব অনেক। পথে অন্তত দুটি যাত্রাবিরতি দিতে তো হয়ই।

ক্যাপ্টেন আসামিদের সমস্ত মালামাল নিজের কব্জায় নিয়ে নিলেন। মেয়েটি তার মালামালের মধ্য থেকে বের করে বিষের পুরিয়াটা তাকে দেখিয়েছিল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে তিনি আবার সেটা যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলেন। পুরুষদুজন যথারীতি শিকলে বাঁধা। তারা ক্যাপ্টেনের কাছে অনুনয়-বিনয় করল, আমাদের ছেড়ে দিন; আমরা মেয়েটাকে এখানেই ফেলে অন্যত্র চলে যাব। কিন্তু ক্যাপ্টেনের মনটা বড় শক্ত। তদুপরি হেরাক্ল থেকে পুরস্কার লাভের আশাও তিনি লালন করছিলেন। পুরস্কার পান আর না পান একাজের ফলে সম্রাট হেরাক্ল-এর সুদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবেন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ক্যাপ্টেন দুটা ঘোটকযানের ব্যবস্থা করলেন। একটাতে মেয়েটিকে নিয়ে তিনি নিজে বসলেন আর অপরটাতে নিজের চার ব্যক্তির সঙ্গে আসামিদুজনকে বসিয়ে দিলেন। দুটো গাড়ি বাজিন্তিয়ার উদ্দেশে ছুটতে শুরু করল।

* * *

তারা চার দিনের মাথায় বাজিন্তিয়া পৌঁছে গেল। গাড়ি থেকে নেমে ক্যাপ্টেন সোজা হেরাক্‌ল-এর মহলে চলে গেলেন এবং ভেতরে সংবাদ পাঠালেন, অমুক নৌজাহাজের ক্যাপ্টেন অত্যন্ত জরুরি এক কাজে এসেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে খবরটা হেরাক্‌ল-এর কাছে পৌঁছানো হলো।

খানিক আগে মিশর থেকে বার্তা নিয়ে দূত এসেছিল। ক্যাপ্টেনকে বলা হলো, যখন যাবেন, কথা খুবই সাবধানে বলবেন। কারণ, সম্রাটের মন-মেজাজ ভালো নয়।

সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মন-মেজাজ ভালো থাকবার কথাও নয়। কারণ, এই যে মিশর থেকে দূত এসেছিল, লোকটা মুকাওকিসের পক্ষ থেকে এসেছিল। সংবাদ এনেছে, আইনুশ-শামসের খোলা মাঠে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে রোমানরা পরাজয় বরণ করেছে। বার্তায় রোমানদের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণও ছিল। তাতে মুসলমানদের সফলতার যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুসলমানরা নীলনদের উভয় কূলের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে এবং নৌযানের গোটা বহর তাদের কব্জায় চলে গেছে।

অনেকক্ষণ পর ক্যাপ্টেনকে ভেতরে তলব করা হলো। হেরাক্‌ল তাকে দেখামাত্র গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী নিতে এসেছ? তোমার জাহাজ কি ডুবে গেছে? নতুন একটা জাহাজ বানিয়ে দিতে হবে?

'না; মহামান্য সম্রাট!'– ক্যাপ্টেন কাঁপা গলায় উত্তর দিলেন– 'আমি কিছু নিতে আসিনি– কিছু দিতে এসেছি। আমার জাহাজ নিরাপদই আছে। আমি রোমসাম্রাজ্যকে নিমজ্জন থেকে রক্ষা করতে এসেছি।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি বলো।' হেরাক্‌ল রোষকষায়িত লোচনে বললেন।

'মিশরের গভর্নর মুকাওকিস আপনার জন্য অতিশয় রূপসী একটি তরুণী মেয়ে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন'– ক্যাপ্টেন মনে সাহস সঞ্চয় করে বললেন– 'কিন্তু মেয়েটা এসেছে আপনার মৃত্যুর বিরাট এক মনকাড়া দেবদূত হয়ে। আপন রূপ ও চিত্তাকর্ষী দেহলতার সাথে আপনার জন্য বিষের পুরিয়াও নিয়ে এসেছে। আদেশ হলে আমি তাকে ও তার সঙ্গে আসা দুজন লোককে আপনার সামনে হাজির করি।'

'এক্ষুনি হাজির করো– জলদি করো।' সম্রাট হেরাক্‌ল আদেশ দিলেন।

ক্যাপ্টেন দ্রুত বের হয়ে ঝটপট মেয়েটাকে নিয়ে আবার ভেতরে প্রবেশ করলেন।

মেয়েটি এখন সেই পোশাকে, যেটি তার আসল পোশাক। সম্রাট হেরাক্‌ল চোখা তুলে তাকালেন। অমনি তার আঁখিযুগল মেয়েটির মুখাবয়ব ও দেহসুষমায় আটকে গেল। তিনি দেখতেই থাকলেন। আর সব রাজা-বাদশাদের মতো সম্রাট হেরাক্‌লও নারীপাগল পুরুষ ছিলেন।

'রোমসম্রাটকে বলো, তোমাকে কে এবং কেন পাঠিয়েছেন।' ক্যাপ্টেন মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললেন।

মেয়েটি সম্রাট হেরাক্‌লকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সবিস্তারে পুরো ঘটনার বিবরণ দিল। মুকাওকিস তাকে কার মাধ্যমে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাকে কী কাজ অর্পণ করেছেন এবং কী পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন সবই বলল।

'ওদের হাজির করো।' সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মনের কুণ্ডে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

পায়ে বেড়ি আর হাতে হাতকড়াপরিহিত দুজন লোক খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

'তোমরা কি এই মেয়েটার দেহরক্ষী হয়ে এসেছ?'– হেরাক্‌ল জিজ্ঞাসা করলেন এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন– 'যদি মিথ্যা বল আর আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা কর, তা হলে আমি তোমাদের মস্তক উড়িয়ে দেব। এবার উত্তর দাও।'

দুজনই আপন-আপন মাথা উপর-নিচ দুলিয়ে স্বীকার করে নিল, হ্যাঁ; আমরা দুজনই এর প্রহরী হয়ে এসেছি। এর মাধ্যমে আপনাকে বিষ পান করানোর কথা ছিল।

হেরকাল আগে থেকেই ক্ষুব্ধ। মুকাওকিস পরাজয়ের সংবাদ পাঠিয়ে তাকে অগ্নিশর্মা বানিয়ে রেখেছিল। ছিলেনও তিনি ফেরাউনি চরিত্রের রাজা– দয়া-মায়া কী জিনিস জানতেনই না।

'মহামান্য রোমসম্রাট!'– দুজনের একজন ম্লান কণ্ঠে বলল– 'মুকাওকিসের আদেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না। অন্যথায় তিনি আমাদের জল্লাদের হাতে তুলে দিতেন। এদিকে আপনি আমাদের শিরচ্ছেদ করতে চাচ্ছেন। আমরা আপনার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা মিশর ফিরব না।'

'তোমরা আমার জীবন নিতে এসেছিলে'– হেরাক্‌ল ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বললেন– 'আর আমি তোমাদের জীবন ক্ষমা করব! আমি জানি, তোমরা পুরস্কারের লোভে আমাকে বিষ পান করাতে এসেছিলে।'

সম্রাট হেরাক্‌ল হাতে তালি বাজালেন। বাইরে থেকে দুজন রক্ষী ছুটে এল। হেরাক্‌ল বললেন, এই পুরুষদুজনকে... আর এই মেয়েটাকেও নিয়ে যাও এবং জল্লাদের হাতে তুলে দাও। তারপর এদের লাশগুলো দূরে কোথাও ফেলে দাও।

আদেশ শুনে মেয়েটির কণ্ঠ চিরে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন এবং হেরাক্‌ল-এর কাছে আবেদন জানালেন, তথ্যটি এ মেয়েটিই তো আমাকে দিয়েছিল; আপনি একে ক্ষমা করে দিন।

'এ একটা সুদর্শনা নাগিনী'– হেরাক্‌ল বললেন– 'মুকাওকিস থেকে পুরস্কার নিয়ে আমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাকে ধোঁকা দিয়েছে। বয়স আর রূপ-সৌন্দর্যের বিবেচনায় এ আমার হেরেমে থাকার যোগ্য। কিন্তু যেকোনো সময় আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে।... নিয়ে যাও এদের।'

পলকের মধ্যে তিনজন রক্ষী ভেতরে প্রবেশ করল এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন কয়েদিকে ধরে ও টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল। মেয়েটা আর্তস্বরে চিৎকার করতে-করতে বেরিয়ে গেল, যা ধীরে-ধীরে ম্লান হতে-হতে একসময় দূরে চলে গেল। জল্লাদ এক-এক করে তিনজনের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ'– হেরাক্‌ল বললেন – 'কেন বাঁচিয়েছ?'

'এ কারণে যে, আমি আপনার সমর্থক ও হিতকামী'– ক্যাপ্টেন বললেন– 'বড় ওস্তাদির মাধ্যমে আমি ওর থেকে এ তথ্য বের করেছি।'

'আমি তোমাকে আমার জীবনের মূল্য পরিশোধ করব।' হেরাক্‌ল বললেন এবং আবারও তালি বাজালেন।

একব্যক্তি ভেতরে এলে হেরাক্‌ল অপর একজনের নাম উল্লেখ করে বললেন, ওকে এক্ষুনি আসতে বলো। লোকটি অনতিবিলম্বে এসে হাজির হলো। বোধ করি, হেরাক্‌ল-এর কোনো মন্ত্রী বা পদস্থ কোনো কর্মকর্তা হবেন। হেরাক্‌ল তাকে বললেন, এই ক্যাপ্টেনকে এত পরিমাণ পুরস্কারে ভূষিত করো। লোকটি ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল।

সে-সময় সম্রাট হেরাক্‌ল-এর যে-মানসিক অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া ছিল, তাতে ধারণা করা যেত, তৎক্ষণাৎ তিনি মিশরে আদেশ পাঠাবেন, মুকাওকিসকে

পদচ্যুৎ করে কারাগারে নিক্ষেপ করো কিংবা এক্ষুনি তাকে বাজিন্তিয়া পাঠিয়ে দাও। হেরাক্ল-এর মতো সম্রাটের ব্যাপারে এমন আশা করার কোনোই যুক্তি ছিল না যে, মুকাওকিসের এই আচরণ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু একজন কাহিনীকারের বরাতে ঐতিহাসিক ইবনুল হাকাম লিখেছেন, ক্যাপ্টেনকে বিদায় জানিয়ে হেরাক্ল গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ পর দু-তিনজন উপদেষ্টা ও এক-দুজন সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। সবাই এসে উপস্থিত হলে তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনালেন। সবার উপর নীরবতা ছেয়ে গেল।

'আমাকে পরামর্শ দাও'– হেরাক্ল বললেন– 'বলো, আমার কী করা উচিত।'

'এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম হবে না।' এক উপদেষ্টা বলল।

অবশিষ্ট সবাই তাকে সমর্থন করল। তারপর তারা পালাক্রমে মুকাওকিসের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করল এবং সর্বসম্মতক্রমে পরামর্শ দিল, এখানে এনে জনসম্মুখে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক।

'না'– হেরাক্ল ভিন্ন কথা বললেন– 'মৃত্যুদণ্ড নয়; আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব এবং অপদস্থ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। এই শাস্তি মৃত্যুর চেয়েও বেশি কঠোর হবে যে, ক্ষমতার এমন একটি সম্মানজনক পদ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে তাকে লাঞ্ছনার জীবন কাটাতে হবে। আমি তাকে গভর্নরির আসন থেকে নামিয়ে ভিখারী বানিয়ে দেব, যাতে এখন যারা তাকে সম্মানের চোখে দেখছে, তারা তার পানে থুতু ছিটাতে পারে। এমন একটা পরিস্থিতি সে নিজেই তৈরি করছে যে, হয় সে আরবদের হাতে প্রাণ হারাবে কিংবা ওরা তাকে যুদ্ধবন্দি বানিয়ে হত্যা করবে অথবা সে নিজেই আমাকে এমন সুযোগ এনে দেবে যে, আমি তাকে দেশান্তর করে দেব। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, সে একের-পর-এক পরাজয় বরণ করে চলছে। অর্ধেক ফৌজ ইতিমধ্যেই হত্যা করিয়ে ফেলেছে। মুসলমান নীলনদের উভয় কূলের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। আমি তাকে ক্ষমা করব না এবং সে জানতেই পারবে না, তার হত্যাপরিকল্পনা আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে এবং তার প্রেরিত লোকগুলো আমার জল্লাদের হাতে পৌছে গেছে।'

মুকাওকিস ব্যবিলনে বসে হেরাক্ল-এর মৃত্যুসংবাদের প্রহর গুণছেন আর ইসলামি বাহিনীর সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) মিশরের একটার-পর-একটা অঞ্চল দখল করে চলছেন। মুকাওকিসের সফলতা স্রেফ এটুকু অর্জিত হয়েছে যে, বিনয়ামিনের কথায় কিবতি খ্রিস্টানরা রোমান বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করেছে।

চার

মিশরের গভর্নর মুকাওকিস ও তার সেনাপতি থিওডোর ব্যবিলন দুর্গে বসে চরম উৎকণ্ঠার সাথে হেরাক্ল-এর মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষা করছেন। তাদের ধারণা অনুযায়ী এত দিনে সংবাদটা চলে আসার কথা। দিনের-পর-দিন যাচ্ছে আর দুজনের ব্যাকুলতাও বেড়ে চলছে।

তারা এমনও পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছেন, যখন পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে যাবে, তখন হেরাক্ল-এর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরপরই মিশরে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেবেন। এরা দুজন মূলত কিবতি খ্রিস্টান ছিলেন, যারা হেরাক্ল-এর খ্রিস্টবাদকে বরণ করে নেননি। সম্রাট হেরাক্ল তাদের এই বিশ্বাস এজন্য সহ্য করে নিয়েছিলেন যে, মুকাওকিস মিশরের গভর্নর আর থিওডোর আতরাবুনের পর সবচেয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ সেনাপতি। তা ছাড়াও হেরাক্ল জানতেন, মিশরের কিবতি খ্রিস্টানদের মাঝে থিওডোরের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা আছে। মুকাওকিস ও থিওডোরের বন্ধুত্ব সম্পর্কেও হেরাক্ল অবহিত ছিলেন। এ দুজনের অসন্তোষকে তিনি ভয় পেতেন।

এখন তো অনেক দিন কেটে গেছে। দুজনের মনে সংশয় জাগতে লাগল, পরিকল্পনা তাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে।

'একথাটা ভুলো না'– থিওডোর বললেন– 'এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে আমরা যে-মেয়েটাকে পাঠিয়েছি, ও মূলত একটা বেশ্যা নারী। আমার ধারণা, হেরাক্ল-এর হেরেম ওর মনে ধরে গেছে। আর যেহেতু তার বয়স কম; আবার অপরূপা সুন্দরীও, সেজন্য হেরাক্লও তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছেন এবং মেয়েটা তার প্রতারণার জালে আটকে গেছে। ও ধরে নিয়েছে, রোম ও মিশরের রাজত্ব আজীবনের জন্য তার হাতে চলে এসেছে এবং এখন সে রানি হয়ে যাবে।'

'এই সন্দেহ আমিও করছি'– মুকাওকিস বললেন– 'কিন্তু এমনও হতে পারে যে, মেয়েটা সুযোগই পায়নি।'

দুজন গভীর চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, একজন গোয়েন্দা এস্কান্দারিয়া পাঠাতে হবে। সে তথ্য নেবে, ওরা কোন জাহাজে এবং কবে রোম-উপসাগরের ওপারে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিল। থিওডোর পুরোপুরি

নিশ্চয়তা ব্যক্ত করলেন, মেয়েটা আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস করেনি। যদি এমন হতো, তা হলে এত দিনে আমরা হেরাক্‌ল-এর কয়েদি হয়ে যেতাম কিংবা আমাদের জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হতো।

এবার প্রশ্ন দাঁড়াল, কাকে পাঠানো যায় এবং একাজের জন্য কাকে আস্থার সঙ্গে দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। গোয়েন্দাও এমন দরকার, যে কিনা বাজিন্তিয়া গিয়ে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর প্রাসাদের ভেতরের খবরাখবর বের করে আনার যোগ্যতা ও সাহস রাখে এবং ওখানে তার ভালো পরিচিতি আছে। এক হলো সাধারণ গোয়েন্দা। আরেক দল আছে অফিসার ও কর্মকর্তা শ্রেণি। রাজা, সেনাপতি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গোয়েন্দা অফিসারদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকে। মুকাওকিস ও থিওডোর অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একজন গোয়েন্দা অফিসার বেছে নিলেন। সেও তলে-তলে কিবতি খ্রিস্টান।

গোয়েন্দাকে ডেকে তারা দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, আমরা একটা মেয়েকে গোয়েন্দাগিরির জন্য বাজিন্তিয়া পাঠিয়েছিলাম। মিশরের এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে সম্রাট হেরাক্‌ল কেন সাহায্য পাঠাচ্ছেন না এবং আদৌ তিনি সাহায্য পাঠানোর চিন্তা করছেন কিনা আমাদের জানার প্রয়োজন ছিল। মেয়েটার সঙ্গে দুজন পুরুষও দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল, তারা মেয়েটাকে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সামনে উপস্থাপন করবে এবং বলবে, মুকাওকিস একে আপনার জন্য উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।

গোয়েন্দা অফিসারের জন্য এটি কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না যে, মুকাওকিস হেরাক্‌ল-এর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছেন। তার জানা ছিল, সম্রাট হেরাক্‌লও মিশরে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছেন, যারা তাকে তথ্য দিচ্ছে, এখানে তার গভর্নর মুকাওকিস ও সেনাপতি থিওডোর কী করছেন, তারা কোন লক্ষ্য ও কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, তাদের গতিবিধি কী। এমতাবস্থায় এরাও যদি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর ভাব-গতি জানবার চেষ্টা করে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

গোয়েন্দা অফিসার বলল, যদি আমাকে বলতেন, তা হলে কোনো অভিজ্ঞ গোয়েন্দার মাধ্যমে আমি এ কাজটি ভালোভাবে করে দিতে পারতাম আর এখন আপনাদের এর জন্য কোনো টেনশন করতে হতো না।

'আমাদের একাজটি যদি না-ও হয়, তবু কোনো সমস্যা বা আক্ষেপ নেই'– মুকাওকিস বললেন– 'এ তেমন কিছু নয়। ব্যাপারটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম শুধু। ভয়ের ব্যাপার হলো, মেয়েটা হেরাক্‌ল-এর ওখানে গিয়ে এবং রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকে প্রভাবিত হয়ে আমাদের গোপন তথ্যাদি ফাঁস করে

দেয় কিনা। আর পুরুষদুজনের তো ফিরে আসবার কথা! কিন্তু আজ অবধি এল না!'

গোয়েন্দাকে প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবং বলে দেওয়া হলো, আগে এস্কান্দারিয়া গিয়ে খবর নাও। যদি জানতে পার, তারা অমুক দিন অমুক জাহাজে করে গেছে, তা হলে বাজিন্তিয়া চলে যাও এবং সেখান থেকে তথ্য নাও। মেয়েটা ও তার সঙ্গী পুরুষরা কোন পোশাকে ও কোন বেশে গেছে, গোয়েন্দাকে তাও বলে দেওয়া হলো।

কর্তব্য বুঝে নিয়ে গোয়েন্দা অফিসার সেদিনই সন্ধ্যায় ব্যবিলন থেকে এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

* * *

গোয়েন্দা পালের নৌকায় করে এস্কান্দারিয়া পৌঁছে গেলেন। ওখানে যেতে নৌকা-ই তার সবচেয়ে দ্রুতগামী বাহন ছিল। নীলনদের প্রবাহও সেদিকেই ছিল। বাতাসও ছিল অনুকূল। এস্কান্দারিয়ায় একটামাত্র সরাইখানা ছিল, রোম-উপসাগর পার হতে এসে যাত্রীরা যেখানে সাময়িকের জন্য আশ্রয় নিত। গোয়েন্দা যাত্রীর বেশে সেখানে গিয়ে উঠল।

মেয়েটি ও তার সঙ্গী পুরুষদুজন কোন দিনগুলোতে এস্কান্দারিয়া পৌঁছেছিল, গোয়েন্দাকে তা বলে দেওয়া হয়েছিল। গোয়েন্দা সরাইখানার মালিক, কর্মচারীবৃন্দ প্রমুখের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা শুরু করল। কিন্তু সবার কাছ থেকে একটি-ই উত্তর পাওয়া গেল, এখানে কত মানুষ আসে, কত মানুষ যায়; কার খবর কে রাখে? অনেকের সঙ্গে নারীও থাকে। আপনি কোন মহিলার কথা জিজ্ঞাসা করছেন, আমরা তা বলব কী করে?

অবশেষে বিচক্ষণ এক কর্মচারীর কিছু একটা মনে পড়ে গেল। গোয়েন্দা তাকে মেয়েটার বিবরণ দিলে এবং তার পোশাক ও আকার-গঠন বললে সে জানাল, মেয়ে যদি এটা-ই হয়, তা হলে আমি তাকে দেখেছি।

কর্মচারী বলল, আমি এজন্য অবাক হয়েছি যে, পোশাক-আশাকে মেয়েটা অতি সাধারণ ছিল; কিন্তু সরাইখানায় কক্ষ নিয়েছিল আলাদা। এখানে তো ভালো-ভালো মানুষরা দিনকতকের জন্য থাকতে এসেও অর্থ বাঁচানোর জন্য বড় কক্ষে আশ্রয় নেয়। কিন্তু ওরা তিনজন এমন একটি কক্ষ নিয়েছিল, যেটি বড়-বড় বিত্তশালীরা ছাড়া কেউ নেয় না। আমি প্রথমে একবার তদের কক্ষে গিয়েছি। তারপর বেশ কবার খাবার নিয়ে সেই কক্ষে আমার যাওয়া হয়েছিল। মেয়েটা সবসময় নেকাবে আবৃতা থাকত। কিন্তু একবার বোধহয় অসাবধানতাবশত

নেকাবটা মুখ থেকে সরে গিয়েছিল আর অমনি তার মুখের উপর আমার চোখ পড়েছিল। মেয়েটা খুবই রূপসী ছিল।

গোয়েন্দা নিশ্চিত হয়ে গেল, মেয়ে এটা-ই। কাজেই ওরা কবে এস্কান্দারিয়ার বন্দর ত্যাগ করেছিল তথ্য পাওয়া গেল। তারা যে-জাহাজে করে গিয়েছিল, গোয়েন্দা তার ও তার ক্যাপ্টেনের নামও জেনে নিল। এবার তার বাজিন্তিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার পালা।

সাধারণ যাত্রীদের জন্য পরবর্তী জাহাজের অপেক্ষা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু গোয়েন্দারা সরকারি কর্মচারী। তদুপরি এই গোয়েন্দা একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার। তার জন্য সরকারি ব্যবস্থা হয়ে গেল। বড়-বড় পালতোলা নৌকা সব সময় প্রস্তুত থাকে। গোয়েন্দা ঘাটে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল এবং বলল, আমি ডিউটিতে যাচ্ছি এবং এক্ষুনি রোম-উপসাগর পার হতে হবে। তাকে তৎক্ষণাৎ একটা নৌকা দিয়ে দেওয়া হলো, যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঝি-মাল্লা ছিল।

* * *

গোয়েন্দা বাজিন্তিয়া পৌঁছে গেল এবং ওখানকার গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসারের সঙ্গে দেখা করল। দুজনে আগে থেকেই ভালো সম্পর্ক ছিল। আরও কয়েকজন অফিসার এসে আলোচনায় যোগ দিল। কুশলবিনিময়ের পর গোয়েন্দা বলল, আমরা তথ্য পেয়েছি, দু-তিনজন মুসলমান গোয়েন্দা এখানে এসে পড়েছে; আমি তাদের ধরতে এসেছি।

মুকাওকিসের গোয়েন্দা অফিসারদের সাথে এটা-ওটা কথা বলতে থাকল। বাজিন্তিয়ার অফিসাররা তার কাছে মিশরের যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইল। গোয়েন্দা বলল, সম্রাট হেরাক্ল কিবতি খ্রিস্টানদের উপর যে-নিপীড়ন চালিয়েছেন, তার ফলাফল এখন সামনে আসছে। কিবতিরা না আমাদের বাহিনীকে কোনো সহযোগিতা দিচ্ছে, না দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কিছু করছে। এমনটি তাদের ধর্মগুরু বিনয়ামিনের নির্দেশের পরও তারা কোনো সাড়া দিচ্ছে না।

গোয়েন্দা বিভাগের এই অফিসাররা সবাই ছিল রোমান। তারা অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল যে, মিশর রোমসাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। তারাও সম্রাট হেরাক্ল-এর নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল। কথায়-কথায় একজন বলল, মাসদুয়েক আগে হেরাক্ল একটা

রূপসী তরুণী মেয়ে এবং তার দুজন সঙ্গী পুরুষকে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে শিরচ্ছেদ করিয়েছেন। কেউই বলতে পারছে না, তার কারণ কী ছিল।

তথ্যটা শুনে মুকাওকিসের গোয়েন্দা চমকে উঠল এবং খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জানতে চেষ্টা করল, তারা কারা ছিল এবং কোথা থেকে ধরে আনা হয়েছিল। উত্তর পেল, মিশর থেকে একটা নৌজাহাজ এসেছিল। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের নিয়ে এসেছিল। আনার সময় পুরুষদুজনের হাতে হাতকড়া আর পায়ে বেড়ি ছিল। গোয়েন্দা আরও তথ্য পেল, এর জন্য হেরাক্ল জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বিপুল পরিমাণ পুরস্কারও দিয়েছেন।

'হতে পারে, তারা মুসলমান গোয়েন্দা'– হেরাক্ল-এর এক গোয়েন্দা অফিসার বলল– 'হতে পারে, তারা-ই সেই মুসলমান গোয়েন্দা, আপনি যাদের পেছনে এসেছেন।'

'এই মতের সঙ্গে আমি একাত্ম হতে পারছি না'– আরেক অফিসার অভিমত ব্যক্ত করল– 'তারা যদি গোয়েন্দা-ই হতো, তা হলে সম্রাট হেরাক্ল তাদের আমাদের হাতে তুলে দিতেন, যাতে আমরা তাদের থেকে তথ্য নিতে পারি।'

মুকাওকিসের গোয়েন্দা আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নিল এবং নিশ্চিত হয়ে গেল, এ-ই সেই মেয়ে, এরা-ই সেই দুজন পুরুষ, মুকাওকিস যাদের পাঠিয়েছিলেন।

গোয়েন্দা সেখান থেকে মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

কয়েক দিনের স্থলপথ এবং পরে সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে গোয়েন্দা মুকাওকিসের কাছে ফিরে গেল এবং তাকে রিপোর্ট দিল। মুকাওকিস ও থিওডোর ভেবে কূল পেলেন না, হেরাক্ল ওদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন কেন! তারা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করলেন বটে; কিন্তু পাশাপাশি আশ্বস্তও হলেন যে, তাদের ভেদ ফাঁস হয়নি। যদি হতো, তা হলে এত দিনে হেরাক্ল তাদের হত্যা করিয়ে ফেলতেন।

মুকাওকিসের সামনে এই একটা-ই ইস্যু নয় যে, হেরাক্লকে হত্যা করাতে হবে। তার মাথায় তো আরবের মুসলমানরা জেঁকে বসে আছেন, যারা মিশরে একটার-পর-একটা দুর্গ জয় করে চলছেন। তারা নীলনদও পার হয়ে এসেছেন এবং পরে ফাউমের সমগ্র অঞ্চল দখলে নিয়ে ট্যাক্স ও জিযিয়া ইত্যাদি কর উসুল শুরু করে দিয়েছেন। মুকাওকিস কোনোমতেই বুঝতে পারছেন না, হেরাক্ল জরুরি সহযোগী বাহিনী পাঠাচ্ছেন না কেন। শামের যুদ্ধে যখন তার বাহিনী প্রাণ হারাচ্ছিল এবং কেবলই পেছনে সরে আসছিল, তখন তো তিনি মিশর থেকে

সহযোগী বাহিনী চেয়ে নিয়েছিলেন, যার কমান্ডার ছিল তারই পুত্র কুস্তুন্তিন। কিন্তু এখন তিনি পুত্রকে বাজিন্তিয়ায় বসিয়ে রেখেছেন! ব্যাপারটা কী? মুকাওকিস এ প্রশ্নের উত্তর এই গোয়েন্দা অফিসার থেকে পেয়ে গেছেন।

গোয়েন্দা মুকাওকিসকে জানাল, আমি সম্রাট হেরাক্ল-এর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্ত রীণ পরিস্থিতিও জেনে এসেছি। হেরাক্ল বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এখন তার স্থলাভিষিক্তির টানাপড়েন মাথা জাগাতে শুরু করেছে।

এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা, গোয়েন্দা যার বিবরণ দিল। হেরাক্ল পুত্র কুস্তুন্তিনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং পুত্রদের মধ্যে একমাত্র তাকেই গুরুত্ব দিতেন। তার প্রধান কারণ হলো, কুস্তুন্তিন সেনাপতি ছিল এবং একাজে তার বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতা ছিল। যে-কারুর মাথায় বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, হেরাক্ল-এর স্থলাভিষিক্ত কুস্তুন্তিনই হবে। কিন্তু দাবিদার আরও একজন ছিল।

এই দাবিদার হেরাক্ল-এর অপর এক স্ত্রীর পুত্র। এই স্ত্রী তার শুধু স্ত্রী-ই নন–রানিও বটে। আবার রানিও এমন যে, রোমসাম্রাজ্যের তার আদেশ-নিষেধ কার্যকর। বরং একথা বললেও ভুল হবে না যে, সম্রাট হেরাক্ল-এর উপর তার রাজত্ব চলে। খুবই চতুর ও ধূর্ত এক মহিলা। নাম মরতিনা। তার পুত্রের নাম হারকলিউনাস। মরতিনা তার এই ছেলেটাকে সম্রাট হেরাক্ল-এর স্থলাভিষিক্ত ও রোমসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বানাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু হারকলিউনাস কুস্তুন্তিনের মতো যুদ্ধবাজ স্বভাবের ছেলে নয়। সে শুধুই রাজপুত্র। তার যোগ্যতা শুধু এটুকু যে, সে রানির গর্ভজাত। রানি বরং তাকে রণাঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তার যুদ্ধের মাঠে অবতীর্ণ হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, যুদ্ধের সাথে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না।

সম্রাট হেরাক্ল রানি মরতিনাকে খানিক ভয় পেতেন। সম্ভবত তার একটি কারণ ছিল নিজের বার্ধক্য। আরেকটি কারণ ছিল, মরতিনা রোমান বাহিনীর বড়-বড় সেনাপতিদের নিজের মুঠোয় নিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের এত ভোগ-বিলাসিতার সুযোদ দিতেন যে, তারা রানির মুঠোয় থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করত। উপরে-উপরে তাদের আনুগত্য হেরাক্ল-এর সঙ্গে ছিল বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা রানি মরতিনার সন্তোষ ও সুদৃষ্টি অর্জনে উদগ্রীব ছিল।

হেরাক্ল অতিশয় নিপীড়ক রাজা ছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি রানি মরতিনাকে খুন কিংবা গুম করিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তার জানা ছিল, তার প্রতিশোধে কোনো-না-কোনো দিক থেকে তার উপর আক্রমণ আসবেই, যা তিনি সামাল দিতে পারবেন না। প্রতিশোধের আশঙ্কা স্বীয় পুত্র হারকলিউনাসের পক্ষ থেকেও

ছিল। অগত্যা তিনি চুপচাপ পরিস্থিতি অবলোকন করছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন।

প্রখ্যাত মিশরি ইতিহাসবিদ হাসনাইন হাইকেল ইউরোপীয় ও আরব ঐতিহাসিকদের বরাতে লিখেছেন, রানি মরতিনা বাধ্যর্কের অজুহাতে হেরাক্লকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেলতে তার সবটুকু শক্তি ব্যয় করে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হননি। এই প্রচেষ্টার ধরন কী ছিল ইতিহাসে তার বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে, মুসলমানরা যখন মিশরের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন রানি মরতিনা হেরাক্লকে জোরালোভাবে চাপ দিয়েছিলেন, আপনি কুস্তুন্তিনকে বাহিনী দিয়ে অবিলম্বে মিশরের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিন। অন্যথায় মিশর আপনার হাত থেকে বেরিয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মরতিনা কুস্তুন্তিনের ভূয়সী প্রশংসাও করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মিশরকে আরবদের হাত থেকে একমাত্র কুস্তুন্তিনই রক্ষা করতে পারে।

মরতিনা খুবই চতুর ও চৌকস নারী ছিলেন। কিন্তু হেরাক্লও কম ধূর্ত ছিলেন না। তিনি বুঝে ফেলেছেন, তার রানি কুস্তুন্তিনের বীরত্বের যে-স্তুতি শোনাচ্ছে, তার মর্ম হলো, কুস্তুন্তিন মিশর গিয়ে মুসলমানদের হাতে জীবনটা হারিয়ে ফেলুক আর তার পুত্র হারকলিউনাসের জন্য রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাক। ফলে হেরাক্ল একটা-না-একটা অজুহাত দেখিয়ে তার এই পরামর্শ এড়িয়ে গেলেন।

তারপর মিশর থেকে যখনই যে-খবর গেল, সবগুলোই ছিল হতাশাজনক দুঃসংবাদ। এবার মরতিনা হেরাক্ল-এর উপর জোর দিতে শুরু করলেন, আপনি নিজে বাহিনী নিয়ে মিশর চলে যান; অন্যথায় মুকাওকিস মিশরটা আরবদের দিয়ে বসবে। এখানেও মরতিনার উদ্দেশ্য ছিল, কুস্তুন্তিন না মরুক; হেরাক্ল নিজে মরে যাক কিংবা মিশরের পাঁকে এমনভাবে আটকে যাক যে, তিনি নিজে রোমসম্রাটের সিংহাসন দখল করে নেবেন। কিন্তু হেরাক্ল তার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন।

মুকাওকিসের গোয়েন্দা তথ্য দিল, সম্রাট হেরাক্ল তার রানি থেকে সিংহাসন বাঁচাতে এবং পুত্র কুস্তুন্তিনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে না নিজের মিশর আসছেন, না কুস্তুন্তিনকে পাঠাচ্ছেন। তার অর্থ ছিল, হেরাক্ল মিশরের সমস্ত দায়িত্ব মুকাওকিসের উপর ফেলে দিয়েছিলেন।

মুকাওকিস এই গোয়েন্দা অফিসারকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

* * *

ওদিকে সম্রাট হেরাক্‌ল বুঝে ফেলেছেন, মুকাওকিস এবং তারই নিজের বানানো প্রধান বিশপ কায়রাসও তার শত্রু হয়ে গেছেন। এদিকে মুকাওকিস নিশ্চিত হয়ে গেছেন, হেরাক্‌ল তার সাহায্যে কিছুই করবে না। তিনি সেনাপতি থিওডোরের সঙ্গে কথা বললেন। থিওডোর তাকে চূড়ান্তরূপে জানিয়ে দিলেন, মিশরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এখন শুধুই আমাদের। হেরাক্‌ল-এর পানে তাকিয়ে থাকা বোকামি বই কিছু নয়। অবশেষে দুজন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, আমরা সম্রাট হেরাক্‌লকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি জানাতে থাকব। কিন্তু মিশরের লড়াই চালাব পুরোপুরি নিজেদের মতো করে; হেরাক্‌ল-এর কোনো আদেশ-নিষেধই আমরা শুনব না। কিন্তু তাকে যে আমরা জেনে-বুঝে অমান্য করছি, তা তাকে বুঝতে দেব না। কখনও যদি তিনি এর জন্য আমাদের জবাবদিহি করেন, তা হলে উত্তর দেব, আপনার আদেশ যখন মিশরের এসে পৌঁছেছিল, ততক্ষণে পরিস্থিতি অনেক বদলে গিয়েছিল; আপনার আদেশ পালন করার সুযোগই আমরা পাইনি।

এখানে একটি কথা বলে রাখা জরুরি মনে করছি। তা হলো, ইসলামের ব্যাপারে মুকাওকিসের দৃষ্টিভঙ্গি অপরাপর অমুসলিম রাজা-বাদশাদের মতো উগ্র, অপমানজনক ও নির্মম ছিল না। ইসলাম ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে তার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইরানের কেসরা, রোমের কায়সার, হীরা ও গাসসানের রাজা, আরবের দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তা ও মিশরের গভর্নর মুকাওকিসের নামে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই বার্তাগুলোতে তিনি এদের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইরানের কেসরা যারপরনাই ঔদ্ধত্যের সাথে বার্তাটি ছিড়ে টুকরো-টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং বার্তাবাহী দূতকে অপমান করে দরবার থেকে বের করে দিয়েছিল। এ-খবর শুনে নবীজি বলেছিলেন, কেসরার সাম্রাজ্যও এভাবে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

অন্যদের প্রতিক্রিয়াও অবমাননাকর ছিল। কিন্তু মুকাওকিস আল্লাহর রাসূলের বার্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, যথারীতি উত্তর দিয়েছিলেন এবং এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, যার ফলে সবাই বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিল। বার্তা নিয়ে তার কাছে যিনি গিয়েছিলেন, তিনি হলেন সাহাবি হযরত হাতেব (রাযি.)। মুকাওকিস হযরত হাতেব (রাযি.)কে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্বাগত জানান এবং পুরোপুরি মনোযোগের সাথে নবীজির পত্রখানা পাঠ করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুকাওকিস হযরত হাতেব (রাযি.)কে আলাদা বসিয়ে নবীজি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং পরে বার্তার উত্তর লেখেন।

জবাবি পত্রে মুকাওকিস লিখেছিলেন, আমি জানতাম, এখনও একজন নবীর আগমন অবশিষ্ট আছে। আমার ধারণা ছিল, এই নবী শামে আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু এখন জানতে পারলাম, তিনি আরবের রুক্ষ ও কঠিন মাটিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। নবীজির নবুওতের উপর কোনো আপত্তি আছে এমন কোনো আভাস মুকাওকিসের পত্রে ছিল না। বরং তিনি লিখেছেন, কিবতি খ্রিস্টানদের এ ব্যাপারে তিনি কিছু বলবেন না। অবশ্য এ কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে, আরবের মুসলমানরা মিশরের মাটিতে অবতরণ করবে এবং মিশরের উপর তাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

বার্তার সঙ্গে মুকাওকিস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুটি সুন্দরী তরুণী মেয়ে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন এবং উন্নত জাতের একটা খচ্চরও দিয়েছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের একজনকে নিজে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদায় আসীন করেছিলেন। ইনি হলেন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাযি.)। তাঁরই গর্ভ থেকে নবীপুত্র হযরত ইবরাহীম (রাযি.) জন্মলাভ করেছিলেন।

ইসলামের ব্যাপারে এমন সন্তোষ ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করার অর্থ কক্ষনো এই ছিল না যে, মুকাওকিস গোটা মিশর বা মিশরের একটি অংশ ইসলামের সৈনিকদের হাতে তুলে দেবেন। আরবের মুসলমানরা মিশরের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্ত্বেও তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং মোকাবেলা করেও যাচ্ছিলেন। তিনি তার বাহিনীর প্রতিজন সৈনিকের কানে-কানে বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছিলেন, ইসলামের এই বান রুখতে হবে। কিন্তু চিন্তাধারায় তিনি একটা নরম জায়গাও রেখেছিলেন যে, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। অবশ্য মুখে বলতেন, মুসলমানদের মিশর থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে।

এখন তিনি যখন মুসলমানদের বিদ্যুদ্গতি, ধ্বংসাত্মক অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের ধারা দেখলেন এবং সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মতিগতিও বুঝতে পারলেন। ফলে তিনি প্রধান সেনাপতি থিওডোর ও অন্যান্য সেনাপতিদের বলে দিলেন, এখন আমি পুরোপুরি নিজের পলিসি অনুযায়ী লড়াই করব এবং আমি যা ভালো মনে করি তা-ই করব। সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কোনো কথা-ই আমি শুনব না।

* * *

ইসলামের সৈনিকদের সফলতা শুধু এটুকু ছিল না যে, তাঁরা একের-পর-এক জয় ছিনিয়ে নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছেন। আসল বিজয় ছিল, তাদের এই প্রলয় সম্রাট হেরাক্‌ল-এর রাজকীয় শৃঙ্খলায় এমন কম্পন ধরিয়ে দিয়েছিল যে,

তার গভর্নর, তার সেনাপ্রধান ও একান্তভাবে তারই নিয়োজিত প্রধান ধর্মজাযক তার শত্রু হয়ে গেছেন। তিনি নিজে– যিনি ছিলেন দ্বিতীয় ফেরাউন– আপন ঘরে নিজেরই রানিকে ভয় করতে শুরু করেছেন। আপন সংসারে তার এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি না নিজে মিশর যাওয়ার ঝুঁকি বরণ করে নিতে পারছিলেন, না পুত্র কুস্তন্তিনকে বাহিনী দিয়ে পাঠানোর সাহস পাচ্ছিলেন।

ইতিহাস আজও পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক যে, সত্যিকার অর্থেই মুষ্টিমেয় এই মুজাহিদ বাহিনীটি এত বিশাল শক্তির মোকাবেলায় এমন সাফল্য কী করে অর্জন করল! ঐতিহাসিকরা শুধু এটুকু লিখেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এটি একটি মোজেযা ছিল। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, এমন মোজেযা তো চাইলেই বসে-বসে দেখানো যায় না। আল্লাহ তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ তাদেরই দান করেন, যারা নিজেদের জীবন, সম্পদ ও সর্বস্ব তাঁর পথে কুরবান করে দেয়। এটি ঈমানের মজবুতির একটি দলিল ছিল এবং এই জয় মূলত ইসলামের সত্যতার বিজয় ছিল।

হেরাক্‌ল যে-পরিণতিতে উপনীত হচ্ছিলেন, তাকে আল্লাহর লানত বললে সঠিকই বলা হবে। কুরআনের কয়েকটি আয়াতে এসেছে, যে-কাফেররা আল্লাহবিশ্বাসীদের উপর নিপীড়ন চালাবে, তাদের পরিণাম খুবই শোচনীয় ও লাঞ্ছনাকর হবে। সেইসঙ্গে আল্লাহ সুসংবাদও প্রদান করেছেন যে, যেসব ঈমানদার কাফেরদের এই নিপীড়নের মোকাবেলায় অটল ও দৃঢ়পদ থাকবে, আল্লাহ তাদের সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী সুখ দান করবেন এবং দুরাচারদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন।

সম্রাট হেরাক্‌ল ইসলাম গ্রহণ না করেও যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের অনুগত থাকতেন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তরে যে-মানবপ্রেম ছিল, সেই মানবপ্রেম লালন করতেন, তা হলে বোধহয় তার পরিণতি এমন শোচনীয় হতো না। কিন্তু তিনি খ্রিস্টবাদের আসল চেহারা মুছে ফেলে নিজের মতো করে একটা ধর্ম তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর সেই ধর্মকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে প্রজাদের উপর চালিয়েছিলেন নিমর্ম নির্যাতনের স্টিমরোলার। আল্লাহর অভিশাপের পাহাড়ের তলে চাপা পড়ে বিলীন হয়ে যায় তো এমন লোকেরাই।

* * *

মুকাওকিসের জন্য ব্যবিলনের আশেপাশে ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে তার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। হেরাক্‌ল-এর পক্ষ থেকেও তার আশঙ্কা ছিল, হয়ত তিনি জেনে ফেলেছেন, মেয়েটাকে আমি তাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলাম। গোয়েন্দার রিপোর্টটা পুরোপুরি শুনে মুকাওকিস সেনাপ্রধান থিওডোরকে বললেন, ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অপরহরণ করিয়ে ব্যবিলন

নিয়ে আসা দরকার। কারণ, সঠিক তথ্য তার কাছ থেকেই জানা যাবে। থিওডোর দায়িত্বটা মাথায় তুলে নিলেন। দেখে-বুঝে তিনি এমন দুজন সৈনিককে বেছে নিলেন, যাদের পক্ষে এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। তাদের উক্ত জাহাজ ও তার ক্যাপ্টেনের নাম বলে দেওয়া হলো এবং কঠোরভাবে সাবধান করে দেওয়া হলো যে, তাকে এস্কান্দারিয়া থেকে এমনভাবে নিয়ে আসতে হবে, যেন কারও মনে সংশয়ও জাগতে না পারে, লোকটাকে খারাপ উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছে।

তারা সেদিনই এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

মুকাওকিস মিশরের রাজা। একজন প্রজাকে তুলে আনা একজন রাজার পক্ষে কোনো কাজের মধ্যেই পড়ে না। তার আসল কাজ তো বিরাট একটা বিপদের রূপ ধারণ করে তাকে বেকায়দায় ফেলে রেখেছে। তিনি ব্যবিলন দুর্গে অবস্থানরত ছিলেন। এই দুর্গে সৈন্যের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কয়েকটা বিষয় তার জন্য সমস্যা তৈরি করে রেখেছিল। ব্যবিলনের সীমানার পরেই যে-অঞ্চলটার শুরু, তার নাম ছিল তখন ফাউম। এই এলাকাটা মুসলমানদের দখলে চলে এসেছিল। ওখানে রোমানদের যেসব সৈন্য ছিল, তাদের কিছু ব্যবিলনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকিরা নাকিউস দুর্গে গিয়ে উঠেছিল। মুকাওকিস এ আশায় প্রহর গুণছিলেন যে, ফাউমের কিবতি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং বিদ্রোহ করবে। মুসলমানরা এ অঞ্চলই নয় শুধু; আশপাশের অন্য আরও কয়েকটি প্রদেশের বড়-বড় কয়েকটি শহর দখল করে ফেলেছিলেন।

এ অঞ্চলের বেশির ভাগ নাগরিকই ছিল কিবতি খ্রিস্টান। মুজাহিদদের সংখ্যা এতই অল্প ছিল যে, আমর ইবনে আস (রাযি.) বিজিত এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলোতে মাত্র অল্প কজন মুজাহিদ রেখে এসেছেন। তাঁদের কাজ ছিল এলাকার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কিবতিরা যদি বিদ্রোহ করে বসত যে, আমরা কর দেব না, তা হলে এই গুটিকতক মুজাহিদের পক্ষে তাদের দমন করা সম্ভব হতো না। তারপরও এমন কী কারণ ছিল যে, তারা বিদ্রোহ করল না? তাদের পুরোহিত তো তাদের বলেই দিয়েছিলেন, মুসলমানদের এই প্লাবনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও এবং রোমান বাহিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াও!

এখানে সেই মহান নামটি-ই সামনে আসছে– আল্লাহ। এটি আল্লাহরই করুণা ছিল। কিন্তু অলৌকিক ঘটনার মতো এই করুণা আল্লাহ তাদের উপর করেন, যারা আল্লাহ দীন ও ঈমানের জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন এবং সংখ্যা ও উপকরণের দিকে না তাকিয়ে হিমালয়ের দৃঢ়তা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মাঠে নেমে

আসেন। যখন এই অঞ্চলগুলো বিজিত হলো এবং রোমান বাহিনীর সর্বশেষ সৈন্যটি পর্যন্ত পালিয়ে গেল, তখন জনসাধারণের মাঝে ভীতি ও হতাশা ছড়িয়ে পড়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। মানুষ জানত, বিজেতারা বিজিতদের উপর করুণা দেখায় না। লুটমার হয়, খুনখারাবি হয়, যুবতী মেয়েদের নিজস্ব মালিকানা মনে করা হয়। কিন্তু এই মুসলমান বিজেতারা ওখানকার নাগরিকদের অবাক করে দিল। কেমন মজার ব্যাপার যে, মুজাহিদদের সাথে তাদের নারীরাও ছিল। তারা অতি অনায়াসে এমন-এমন সমস্যা সমাধান করে ফেলল, যা কিনা বিশাল-বিশাল বাহিনীকেও আঞ্জাম দিতে হিমশিম খেতে হয়।

এই মুসলিম নারীরা বিজিত অঞ্চলে গিয়ে-গিয়ে ওখানকার নারী-পুরুষ সবাইকে অভয় দিল, তোমাদের পালাতে হবে না এবং সবাই যার-যার ঘরে এমনভাবে বসে থাকো, যেন কিছুই ঘটেনি। পুরুষরা ঘোষণা করে ফিরছিলেন, কাউকে অকারণে উত্যক্ত করা হবে না, কারও উপর অবিচার করা হবে না। মেয়েরা প্রয়োজনে যথারীতি ঘর থেকে বের হতে পার এবং বিজেতাদের নিজেদের ভাই ও প্রহরী মনে করো। আমরা তোমাদের শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি।

ঐতিহাসিক ইবনুল হাকাম লিখেছেন, মুকাওকিসের আশার বিপরীতে ফাউম প্রদেশের জনগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিবর্তে উলটো মনে-প্রাণে তাদের বরণ করে নিল। নেতারা ঘোষণা করে দিল, জয় শেষ পর্যন্ত ইসলামেরই হওয়ার ছিল। তোমরা এদের সাদরে বরণ করে নাও। কিবতিরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল, হেরাক্ল-এর হিংস্রতা ও নিপীড়নের দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ থেকে আমাদের শান্তির জীবন শুরু হলো।

তা হলে এসব কী ছিল? ব্যাপারটা হলো, মানুষের ধন-সম্পদ, সোনা-রুপা, তাদের সুন্দরী মেয়েদের প্রতি মুসলমানদের কোনো আসক্তি ছিল না। তারা আপন নারীদের সঙ্গে নিয়ে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কারণ, এটি মহান আল্লাহর বিধান।

শঙ্কা সেই মিশরি বেদুইনদের তরফ থেকে ছিল, যারা ইসলামি বাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু, না; তারাও কোনো নাগরিকের সঙ্গে অসদাচরণ করেনি। কারণ, তারা গনিমতের অংশ পুরোপুরি পেয়ে যেত এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদই ভালো। তারা পশ্চাদপদ চিন্তাধারার মানুষ ছিল। ছিল কুসংস্কারের পূজারিও। তাদের বোঝানোর জন্য বলা হয়েছিল, যারা লুটপাট করে, নারীর গায়ে হাত তোলে, তারা যুদ্ধের মাঠে মারা যায় আর তাদের লাশ শিয়াল-শকুনরা খেয়ে ফেলে। তাদের আরও বোঝানো হয়েছিল, হেরাক্ল মিশর আসতে ভয় পাচ্ছেন কেন? কেনইবা তিনি একের-পর-এক

পরাজয়ের শিকার হচ্ছেন? তার একটি-ই কারণ। তা হলো, তিনি নিরস্ত্র ও দুর্বল নাগরিকদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছিলেন। এটি এমন একটি যুক্তি ছিল, যেটি বেদুইনদের হৃদয়ে বসে গিয়েছিল।

ওখানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল যে, এখন রোমান বাহিনীর সৈন্যদের অন্তরে ইসলামের সৈনিকদের ভয় ঢুকে গেছে আর জনতার হৃদয়ে তাদের ভালবাসা ঘর করে নিয়েছে। কেমন যেন মিশরের জনগণ মুসলমানদের প্রীতি ও মমতার জালে আটকে গেছে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর লক্ষ্য এখন ব্যাবিলন দুর্গ, যাকে তিনি অবরোধে নিয়ে রেখেছেন। কিন্তু দুর্গ জয় করা বাহ্যত অসম্ভবই মনে হচ্ছে। এজন্য নয় যে, মুজাহিদদের সংখ্যা কম; বরং তার কারণ হলো, দুর্গটা সত্যিকার অর্থেই অজেয়। কিন্তু তারপরও আমর ইবনে আস অবরোধ করলেন কেন? তার কারণ তিনি সালারদের কাছে ব্যক্ত করেছেন, অবরোধ এজন্য জরুরি যে, দুর্গে যেসব সৈন্য আছে, তাদের অস্থির করে রাখতে হবে। আরেকটি কারণ হলো, রোমানরা যাতে না বোঝে, মুসলমানরা এই দুর্গটাকে অজেয় মনে করছে। মোটকথা, আমর ইবনে আস (রাযি.) শত্রুর মাথার উপর চড়ে থাকতে চাচ্ছিলেন।

ব্যাবিলন দুর্গ কতখানি মজবুত ছিল? আজও প্রাচীন মিশরে ঘুরে-ফিরে দেখুন; দেখবেন, ব্যাবিলন দুর্গের কয়েকটা দেওয়াল ও গোটাকতক বুরুজ দাঁড়িয়ে আছে। সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঢুকে পড়ুন এবং আল্লাহর পানে ধ্যান করুন। তারপর সেই মুজাহিদদের কথা স্মরণ করুন, যাঁদের আমলে এই দুর্গ একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে প্রতাপের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাঁরা কাফেরদের এই চ্যালেঞ্জকে আল্লাহর নামে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই কল্পনা মাথায় আনতেই আপনি কানাঘুষা শুনতে পাবেন, যেন ইসলামের জন্য নিবেদিত সেই মর্দে মুজাহিদদের আত্মারা কানে-কানে আপনাকে জিহাদের কাহিনী শোনাচ্ছে।

আত্মাদের কানাঘুষা সে-ই শুনতে পায়, যার নিজের আত্মা সজাগ এবং সেই আত্মায় আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান। আজ ওখানকার অবস্থা হলো, এখন ফেরাউন নেই বটে; কিন্তু শাসকদের মাঝে ফেরাউনি চরিত্র বিদ্যমান। আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান কিংবা যারা জিহাদের কথা বলতে চান, তাদের মৌলবাদী, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অনেককে হত্যাও করা হচ্ছে। মিশর এখন নামেই শুধু মুসলিম রাষ্ট্র। শাসকদের নামও ইসলামি; কিন্তু হৃদয়ে তাদের আল্লাহর চেয়ে ইসরাইলের ভালবাসা প্রবল।

ব্যবিলনের দুর্গ আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে যখন পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে দণ্ডায়মান ছিল, তখন তার প্রাচীরগুলো এত উঁচু, বুরুজগুলো এত মজবুত ছিল যে, সে পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব ছিল। প্রাচীরগুলো উচ্চতায় ছিল ষাট পা আর চওড়াও ছিল আঠারো পা। মজবুত এতখানি ছিল যে, কোথাও কোনো ছিদ্র বা ফাটল ধরানোর কল্পনাও করা যেত না। প্রাচীরের উপর যে-বুরুজগুলো ছিল, সেগুলো যেমন ছিল মজবুত, তেমনি উঁচু। উপরে উঠে দাঁড়ালে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এলাকা চোখে পড়ত। নীলনদের দৃশ্য দর্শকদের মাতোয়ারা করে তুলত।

দুর্গের এক কোল ঘেঁষে নীলনদ এমনভাবে অতিক্রম করেছে, যেন ওদিককার প্রাচীর নদীতেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান ফটকের মুখ নদীর দিকে। ফটকটি হয় লোহার তৈরী, নাহয় তার গায়ে লোহার পাত বসানো আছে। ওই দিকটায় অনেকগুলো নৌকার একটা বহর সব সময় প্রস্তুত থাকে। ওখান থেকে একদম সম্মুখে নীলনদ বেশ চওড়া হয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। নদীর ঠিক মধ্যখানে একটা সুপরিসর শুষ্ক ভূমি, যেখানে একটা মজবুত দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে। এ দুর্গের নাম রাওজা। এখানে সেনাবাহিনীর একটা অংশ সব সময় বিদ্যমান ও প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজনের সময় এ বাহিনী নৌকায় চড়ে ব্যবিলন পৌঁছে যায় এবং তাদের প্রতিহত করা অবরোধকারীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে শেষ পর্যন্ত অবরোধ ব্যর্থ হয়ে যায়।

ব্যবিলন দুর্গে এত অধিকসংখ্যক কূপ বিদ্যমান যে, পানিসংকটের প্রশ্নই জাগে না। প্রাচীরের বাইরে দুর্গের আশপাশে ফসলাদির ক্ষেত ও ফলফলাদির বাগানের সমারোহ, যার ফলে কখনও খাদ্যের অভাব দেখা দেয় না। দুর্গকে অধিকতর শক্ত ও দুর্ভেদ্য বানাতে ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচার আশপাশে অতিশয় চওড়া ও গভীর একটা পরিখা খনন করা হয়েছে, যাতে নদীর পানি আসা-যাওয়া করছে।

নদীর দিককার ফটক ছাড়াও আরও একটি ফটক ছিল। ওখানে একটা পুল তৈরি করে রাখা ছিল, যেটি প্রয়োজনের সময় পরিখার উপর বসিয়ে দেওয়া হতো। যারা অতিক্রম করার তারা পরিখা পার হয়ে গেলে আবার সেটি সরিয়ে ফেলা হতো। শত্রুর পক্ষে এই পরিখা অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল।

সিপাহাসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) ব্যবিলন দুর্গে গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন। তারা অবরোধের আগেই ফিরে এসেছিল। তারা তথ্য দিল, দুর্গে বিপুলসংখ্যক সৈন্য আছে। নীলনদের মাঝখানে যে-দুর্গটা আছে, সেখানেও সৈন্যের কোনো অভাব নেই। এরা সবাই রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা এমন সৈনিক, যারা মুসলমানদের ভয়ে তটস্থ। কিন্তু সংখ্যায় তারা এত বিপুল যে,

একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুদ্র কোনো বাহিনীকে পিষে ফেলতে সক্ষম এবং প্রাচীরের আশ্রয়ে থেকে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ারও ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তারপরও ইসলামের সৈনিকরা দুর্গটা অবরোধ করে ফেললেন।

* * *

দিনকতক পরই মুকাওকিসকে সংবাদ জানানো হলো, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ধরে আনা হয়েছে। মুকাওকিস তখনই ক্যাপ্টেনকে হাজির করতে আদেশ দিলেন।

'যদি বেঁচে থাকতে চাও, তা হলে সত্য বলো'– মুকাওকিস ক্যাপ্টেনকে বললেন– 'তুমি একটি মেয়ে ও দুজন পুরুষকে হাতে হ্যান্ডকাপ আর পায়ে বেড়ি পরিয়ে এস্কান্দারিয়া থেকে বাজিন্তিয়া নিয়ে গিয়েছিলে এবং হেরাক্‌ল-এর হাতে তুলে দিয়েছিলে। কেন?'

সহসা ক্যাপ্টেনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। মনে হলো, যেন মুখটা তার বোবা হয়ে গেছে, যেন কোনো কথা না বলেই তিনি অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন।

'আমি তোমাকে হত্যা করব না'– মুকাওকিস বললেন– 'তোমার এই বিশাল জাহাজটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলব, পায়ে বেড়ি পরিয়ে তোমাকে খোলা মাঠে ফেলে রাখব আর তুমি মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা করে জীবন কাটাবে।'

ক্যাপ্টেন জেনে ফেললেন, সবই ফাঁস হয়ে গেছে। সাধারণ কোনো বিচারকের সামনে নন– স্বয়ং মিশরের শাসনকর্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই অনুভূতিও তার ছিল, যিনি চাইলে মুহূর্তের মধ্যে তাকে হত্যা করিয়ে ফেলতে পারেন। কোনো উত্তর না দিয়ে ক্যাপ্টেন মুকাওকিসের পায়ের উপর পড়ে গেলেন এবং মাথা ঠুকে ক্ষমা চাইতে শুরু করলেন। মুকাওকিস তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এবার ক্যাপ্টেন সব কথা খুলে বললেন। শেষে বললেন, আমি কাজটা পুরস্কারের লোভে করেছি। তা ছাড়া সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সমর্থক বিধায় তার এই পরিণতি মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মুকাওকিসের শুধু জানবার ছিল, তিনি হেরাক্‌ল-হত্যার যে-পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, সেই তথ্য হেরাক্‌ল জেনে ফেলেছেন কিনা। এই তথ্য তাকে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকেই পাওয়ার ছিল, যা তিনি পেয়ে গেছেন।

এ সময় সেনাপতি থিওডোরও মুকাওকিসের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। দুজনই মনে-মনে বিস্মিত হলেন, আজ অবধি এর জন্য হেরাক্‌ল কোনো ব্যবস্থা নিলেন

না কেন? ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে হেরাক্‌ল এ ব্যাপারে কী চিন্তা করেছেন, কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা তো তিনি জানেন না।

ভাগ্যের ফয়সালার জন্য মুকাওকিস ক্যাপ্টেনকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি থিওডোরের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন। মুকাওকিস বললেন, লোকটা যেহেতু সত্য বলে দিয়েছে, তাই তাকে ক্ষমা করে দেই।

'না'– থিওডোর অভিমত ব্যক্ত করলেন– 'যদি একে মুক্ত করে দেন, তা হলে এ সবার আগে যে-কাজটা করবে, তা হলো, বাজিন্তিয়া গিয়ে হেরাক্‌লকে বলে দেবে, আমরা তার থেকে ভেতরের কথা জেনে নিয়েছি। তার ফলে হেরাক্‌ল আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কাজেই একে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে সঠিক হবে না।'

মুকাওকিস আদেশ জারি করলেন, একে জল্লাদের হাতে তুলে দাও। বাইরে থেকে ক্যাপ্টেনের আর্তচিৎকার ভেসে এল, যা ধীরে-ধীরে ম্লান হতে-হতে জল্লাদের কাছে গিয়ে পুরোপুরি থেমে গেল।

* * *

অবরোধ চলাকালে এক গোয়েন্দা মুজাহিদ– যিনি তখনও পর্যন্ত ব্যবিলন দুর্গের ভেতরেই ছিলেন– বেরিয়ে এলেন। ব্যবিলনে তিনি বিশেষ এক বেশ ধারণ করে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি নৌকায় করে নগরীর কয়েকজন লোকের সঙ্গে মাঝনদিতে অবস্থিত দ্বীপের রাওজা দুর্গে চলে গেলেন। সম্ভবত সরকারি কোনো কাজে কিছু লোকের এই দুর্গে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল আর তার জন্য ছদ্মবেশী এই গোয়েন্দা মুজাহিদ নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন।

রাতের বেলা মুজাহিদ চুপিসারে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নদীতে নেমে পড়লেন। সে-সময় নদীতে জোয়ারের ভাব ছিল এবং ওই জায়গাটায় নদী বেশ চওড়া ছিল, যেটি সাঁতার কেটে অতিক্রম করা যার-তার কাজ ছিল না। কিন্তু এই মুজাহিদ সাঁতার কেটেই নদীটা পার হয়ে এলেন এবং কূলে এসে ডাঙায় না উঠে কিনারে-কিনারে সাঁতরে সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেলেন, যেখানে ইসলামি বাহিনীর অবরোধ ছিল। আপন বাহিনীতে পৌঁছেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন এবং কিছুসময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দুঃসাহসী এই গোয়েন্দা মুজাহিদ সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে তথ্য দিলেন, রাওজা দুর্গে বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। আরও জানালেন, মুকাওকিস সমগ্র বাহিনীকে সমবেত করে ভাষণ দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, নদীতে জোয়ারের লক্ষণ শুরু হয়ে

গেছে। এক থেকে দেড় মাস সময়ের মধ্যে নদীতে এতখানি স্ফীতি ও স্রোত এসে পড়বে যে, তখন আর কারুর নদীতে নামবার সাহস থাকবে না। তাতে আমাদের উপকার হবে, তখন নদীর দিক থেকে আমাদের দুর্গ একদম নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট দিকগুলোর পরিখা পানিতে এতখানি ভরে যাবে যে, আরবের এই মুসলমানরা তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

মুকাওকিস আরও বলেছেন, এই জোয়ার দেড় থেকে দুমাস অব্যাহত থাকার পর ভাটার টান শুরু হবে। এক মাসে নদীর গতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। আর ততক্ষণে এস্কান্দারিয়া থেকে বিশেষ সাহায্য এসে পড়বে। নৌপথই ছিল এস্কান্দারিয়া থেকে সাহায্য আসার সহজ ও সোজা পথ। মুকাওকিস বললেন, নদীতে ভাটার টান ধরতে-ধরতে মুসলমানদের মনোবলেও ভাটা এসে পড়বে। তখন আমরা তাদের অনায়াসে পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হব।

গোয়েন্দা মুজাহিদ আরও জানালেন, মুকাওকিস তার বাহিনীকে পুরস্কারের লোভও দেখিয়েছেন। তারা ছিল বেতনভোগী সৈনিক। মুকাওকিস তার বাহিনীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা যদি মুসলমানদের পিছু হটিয়ে দিতে পার, তা হলে আমি তোমাদের প্রতিজন সৈনিককে তিন মাসের বেতন দ্বিগুণ দেব। আর যারা বিশেষ বীরত্বের প্রমাণ দেবে, তাদের অতিরিক্ত পুরস্কার দ্বারা লাল করে দেব।

গোয়েন্দা মুজাহিদ নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন, বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি বটে; কিন্তু তাদের মনোবল অতখানি মজবুত নয়, যতখানি থাকার কথা। তিনি আরও জানালেন, যেসব সৈন্য আমাদের মোকাবেলায় এসেছে এবং পালিয়ে গেছে, তারা তো 'মুসলমান' শব্দটি-ই শোনামাত্র চুপসে যায়। রোমান বাহিনীর এই অবস্থার বিবরণ পরিষ্কার ভাষায় ইতিহাসেও এসেছে। তারা নিজেদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতা আড়াল করতে মুজাহিদদের সম্পর্কে লোমহর্ষক কাহিনী শোনাত। কারও-কারও কথায় মনে হতো, আরবের এই মুসলমানরা জিন-ভূত বা এ জাতীয় ভয়ংকর কোনো জীব।

গোয়েন্দার এ রিপোর্টের একটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট ছিল, নীলনদে জোয়ার আসছে। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর জন্য এটি কোনো নতুন খবর ছিল না। তবুও রিপোর্টে তিনি নতুন কিছু তথ্য পেয়ে গেছেন। তিনি জানতেন, জোয়ারের মওসুম শুরু হয়ে গেছে এবং নীলনদ ফুঁসছে। মুকাওকিস বলেছেন, এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে-করতে মুসলমানরা আশাহত হয়ে যাবে। কিন্তু আমর ইবনে আস (রাযি.) নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপাতে প্রতিক্রিয়া

ব্যক্ত করলেন। অবরোধের মাঝে ঘুরে-ফিরে তিনি স্থানে-স্থানে মুজাহিদদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) মুজাহিদদের গোয়েন্দা-রিপোর্টের সারাংশ শুনিয়ে বললেন, এতখানি দীর্ঘ সময়ে দুর্গবাসীরা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। এই সময়টায় আমরা তাদের অস্থির করে রাখব। তারপর দুর্গের উপর যথারীতি আক্রমণ চালাব।

'ইসলামের সৈনিকগণ!'– আমর ইবনে আস (রাযি.) সংক্ষেপে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন– 'এই পরিখা যদি এর চেয়েও বেশি চওড়া, এর চেয়েও অধিক গভীর হতো, তবু তোমাদের পথ আটকাতে পারত না। রোমানরা দাবি করছে, তাদের এই দুর্গ এত মজবুত, এত দুর্ভেদ্য যে, একে জয় করার সাধ্য কারও নেই। ইসলামের জন্য নিবেদিত মুসলিম সৈনিকগণ! জগতের কোনো দুর্গ তোমাদের ঈমান ও জিহাদের জযবার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। মহান আল্লাহর একটি ঘোষণা মনে রাখো যে, চেষ্টা তোমরা করো; ফল আমি দেব। তোমরা আমার পথে হরকত করো; আমি তোমাদের বরকত দেব।'

ব্যবিলন দুর্গে থিওডোর ছাড়াও আরও একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন, যার নাম আরব ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন আয়রাজ। কিন্তু বাটলার লিখেছেন, এ নামটি মূলত ছিল জর্জ; বিকৃত হয়ে আয়রাজ হয়েছে। নীল ক্রমান্বয়ে ফুঁসছে। স্রোতও তীব্র-থেকে-তীব্রতর হচ্ছে। দুর্গের তিন পাশের পরিখাগুলো পানিতে ভরে গেছে। মুজাহিদদের উপর দুর্গের পাঁচিল থেকে মিনজানিকের সাহায্যে ছোড়া পাথর আসতে শুরু করেছে।

মুজাহিদগণও তার উত্তর দিতে শুরু করলেন। তাঁরাও মিনজানিকের সাহায্যে দুর্গের উপর পাথর ছুড়তে শুরু করে দিলেন। দূরে তির পৌঁছানোর জন্য তাঁরা বড়-বড় ধনুক তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিরন্দাজ মুজাহিদরা সেগুলো নিয়ে পরিখার কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেখান থেকে পাঁচিলে রোমানদের উপর তির ছুড়তে শুরু করে দিলেন। ওদিকে নীলের উচ্ছ্বাস বাড়তে থাকল আর এদিকে উভয় পক্ষে তির ও পাথর ছোড়াছুড়ির গতিও তীব্র হতে থাকল। এভাবে দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন কাটতে থাকল।

দুর্গের পাঁচিল থেকে আসা প্রস্তর মুজাহিদদের কোনোই ক্ষতি করতে পারল না। কিন্তু মিনজানিকের সাহায্যে দুর্গের অভ্যন্তরে ছোড়া মুজাহিদদের পাথর নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। প্রতিটি ঘরেরই অধিবাসীদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে গেল, এই বুঝি বড় একটা পাথর এসে আমার ঘরের উপর পতিত হয়ে ছাদটা

গুড়িয়ে দিল! রোমান সৈন্যদের মনোবল এমনিতেই টলটলায়মান ছিল। দুর্গে প্রস্তরবর্ষণ শুরু হওয়ার পর তারা আরও হীনবল হয়ে যেতে লাগল।

দেড় থেকে পৌনে দুমাস সময় কেটে গেল এবং নীলনদে ভাটার টান শুরু হয়ে গেল।

* * *

৬৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুকাওকিস তার বাহিনী ও ব্যাবিলনের জনসাধারণের মনোভাব জানতে পরিসংখ্যান নিলেন। তাতে তার মনে সংশয় জন্মে গেল, মুসলমানরা যদি এই বিশেষ ধারায় দুর্গের উপর আক্রমণ করে বসে, তা হলে মোকাবেলায় এই বাহিনী টিকতে পারবে না এবং জনসাধারণ এমন ও হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ফেলবে, যা সৈন্যদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে বরং সমঝোতা করে নেওয়া-ই কল্যাণকর হবে। মুকাওকিস খুবই গুরুত্বের সাথে আগে থেকেই ভাবছিলেন, যদি মুসলমানদের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলতে পারতাম! কিছু নিয়ে হলেও যদি তারা সমঝোতার মাধ্যমে মিশর ছেড়ে চলে যেত! এ ব্যাপারে তিনি চেষ্টাও চালিয়েছিলেন। এখন বাহিনী ও নাগরিকদের মনোভাবে দেখে বিষয়টি পুনর্বার তার মাথায় জেগে উঠল।

মুকাওকিস একটা গোপন মিটিং ডাকলেন। বৈঠকে সেনাপতি থিওডোর, সেনাপতি জর্জ ও নিজের দুজন উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

'আমার কথাগুলো মনোযোগসহকারে শোনো এবং আমাকে পরামর্শ দাও'– মুকাওকিস বললেন– 'তোমরা বাহিনীর মানসিক অবস্থাও দেখেছ, নাগরিকদের অবস্থাও দেখতে পাচ্ছ। আমরা জরুরি সাহায্যের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি। কিন্তু ভেবে দেখো, আমাদের কাছে সৈন্যের কোনো অভাব নেই। সহযোগী বাহিনী শুধু তখনই কাজে আসতে পারে, যখন তারা পেছন থেকে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। নীলের উভয় কূলের উপরই মুসলমানদের আধিপত্য।...

'আরবের এই মুসলমানরা পরিখার একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা পরিখা অতিক্রম না করে ছাড়বে না। এখনও কি তোমরা তাদের চেতনা, মনোবল ও দৃঢ়তা সম্পর্কে অবগত হওনি? চিন্তা করে দেখো, মিশরে ঢুকে কত দ্রুত তারা এ পর্যন্ত চলে এসেছে! আমি লড়াই ব্যতিরেকেই অবরোধ তুলে দিতে চাই। এটা কি ভালো হবে না যে, আমরা আরেকবার তাদের সঙ্গে সন্ধির

ব্যাপারে আলোচনা করে দেখব এবং তাদের প্রস্তাব দেব, যা চাইবে, আমরা তোমাদের তা-ই দেব; তোমরা মিশর ছেড়ে চলে যাও?

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুকাওকিস তার বক্তব্য এমন যুক্তিপূর্ণ ও ক্রিয়াশীল ধারায় উপস্থাপন করেছিলেন যে, বৈঠকের সব কজন সদস্যই তাকে সমর্থন জোগাল এবং বলল, আমরা আপনার এই চিন্তার সঙ্গে একমত; আপনি অতি তাড়াতাড়ি কার্যক্রম শুরু করে দিন।

'আমি শুধু একটি-ই পরামর্শ দেব'– থিওডোর বললেন– 'এই বৈঠক আর এ কার্যক্রম অত্যন্ত কঠোরতার সাথে গোপন রাখতে হবে। বাহিনী যেন ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। অন্যথায় সন্ধি-সমঝোতার আশায় তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়বে।

মুকাওকিস পরামর্শটা মেনে নিলেন।

এ বৈঠকটি রোমান বাহিনী ও ব্যবিলনের জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব হয়েছিল বটে; কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে লুকোনো সম্ভব হয়নি। তৎকালীন বহুসংখ্যক মুসলিম ও অমুসলিম এবং তাদের বরাতে পরবর্তী কালের অনেক ঐতিহাসিক ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিতভাবে এ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই মিটিংয়েই সেনাপতি আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নামে মিশরের গভর্নর মুকাওকিসের পক্ষ থেকে একটি পত্র লিখে ফেলা হয়।

পরদিন রাতের অন্ধকারে মুকাওকিস তার দুই সেনাপতি ও উপদেষ্টাদ্বয়কে নিয়ে দুর্গ থেকে বের হন। তারা নদীর কূলে ঘাটে গিয়ে নৌকায় চড়ে বসেন এবং মাঝনদীতে দ্বীপাঞ্চলের রাওজা দুর্গে পৌঁছে যান। এ দুর্গে বড়সড় একটি গির্জা ছিল। মধ্যরাতে পাদরিকে জাগিয়ে তোলা হলো। না বললেনও বুঝবার কথা, হঠাৎ পাদরি বড় বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, এই অসময়ে মিশরের গভর্নর দুজন সেনাপতিসহ এখানে কেন এসেছেন!

মুকাওকিস পাদরিকে পত্রখানা দিলেন এবং বলে দিলেন, রাত পোহানোর সাথে-সাথে তুমি নৌকায় চড়ে বসবে এবং মুসলমানদের সিপাহসালারের কাছে চলে যাবে। সঙ্গে আস্থাভাজন জনাচারেক লোকও নিয়ে যাবে। কিন্তু পুরোটা কার্যক্রম গোপন রাখতে হবে। মানে কেউ যেন বুঝতে না পারে, আমি মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালারের কাছে কোনো বার্তা পাঠিয়েছি।

ইতিহাসে মুকাওকিসের এ পত্রের ভাষ্য উল্লেখিত আছে। কিন্তু তাতে কোনো আবেদন নেই; আছে হুমকির ভাব। পত্রটি পড়ুন :

'তুমি আমাদের দেশে এমনভাবে এসে ঢুকেছ, যেন এটি তোমার নিজের দেশ কিংবা এ দেশটির কোনো শাসক নেই এবং এখানকার মানুষগুলো সব ভেড়া-বকরি। আমাদের উপর তুমি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছ আর উভয় তরফেই রক্তক্ষয় চলছে। এর দায় সবটুকুই তোমার এবং এটা তোমার গুরুতর অপরাধ। আমাদের দেশে তোমাদের অবস্থান দীর্ঘ হয়ে গেছে, যা কিনা আমাদের সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। আমাদের বাহিনীর মোকাবেলায় তোমরা মুষ্টিমেয়ও নও। আমি স্বয়ং চাচ্ছিলাম, তুমি নীল পর্যন্ত চলে আস। এবার আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। অন্যথায় তোমার একজন মানুষও জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।...

'মনে করছ, তোমরা জয়ের-পর-জয় লাভ করে আসছ। কিন্তু এটা বুঝছ না যে, এসব বিজয় তোমাদের মাথাগুলো নষ্ট করে দিয়েছে এবং তোমরা অনুভবই করতে পারছ না, এ মুহূর্তে তোমরা কোথায় আছ এবং কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে বসে আছ। নীলনদ তোমাদের ঘিরে রেখেছে। ধরে নাও, নীলও তোমাদের শত্রু। আমি তোমাদের সুযোগ দিচ্ছি। তোমার এই গুটিকতক সৈন্য আমার বিশাল বাহিনীর পদতলে পিষে মরার আগে সন্ধি-সমঝোতার ব্যাপারে কথা বলার জন্য কোনো দূত বা প্রতিনিধিদল আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আসো; আমরা উভয় পক্ষ বসে এই রক্তক্ষয় বন্ধ করার একটি পথ খুঁজে বের করি আর তোমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাও। আমি আবারও বলছি, তোমরা ফিরে যাও। এর জন্য বিনিময় যা চাইবে আমি তোমাদের দেব। আমি তোমাদের দূত বা প্রতিনিধিদলের অপেক্ষায় থাকব।'

* * *

মুকাওকিসের ধারণা ছিল, তার প্রেরিত প্রতিনিধিদল সূর্য ডোবার আগে-আগেই উত্তর নিয়ে ফিরে আসবে। তারা তো কোনো দীর্ঘ সফরে যায়নি। নদীর মধ্যখান থেকে এক কূলে যাওয়া এ-ই যা পথ। কিন্তু তারা সেরাতে ফিরল না। পরবর্তী দিন, পরবর্তী রাতও গেল। তার পরের দিনও কেটে গেল; কিন্তু মুকাওকিসের প্রতিনিধিদলের ফিরবার কোনো নাম নেই। এবার মুকাওকিস বললেন, বোধহয় মুসলমানরা তাদের গ্রেফতার করেছে কিংবা হত্যা করে ফেলেছে।

প্রতিনিধিদল দুদিন পর ফিরে এল। মুকাওকিস কোনো ভূমিকা ছাড়াই প্রথম কথাটি জিজ্ঞাসা করলেন, দুটা দিন কী করেছ?

'তারা আমাদের পুরোপুরি সম্মানের সাথে আটকে রেখেছিল'– বড় পাদরি উত্তর দিলেন– 'আমার ধারণা, মুসলমানরা আমাদের এজন্য আটকে রেখেছিল, যেন

আমরা আপন চোখে তাদের মনোবল ও দৃঢ়তা দেখে আসি। মুসলমানদের এত কাছে থেকে আমরা এ-ই প্রথমবার দেখলাম।'

মুকাওকিস আর কোনো কথা শুনবার আগে জিজ্ঞাসা করলেন, তা সিপাহসালার কী উত্তর দিয়েছেন? বড় পাদরি সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর লিখিত বার্তা মুকাওকিসের হাতে দিলেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) লিখেছেন :

'আমি আগেও একবার মিশরের গভর্নরকে বলেছি, আমাদের কয়েকটা শর্ত মেনে নিলে আমরা সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করে নিতে পারি। আর যেহেতু এই শর্তগুলো আমার মনগড়া নয়; বরং ইসলামের পক্ষ থেকে আরোপিত; তাই তাতে কমানো বা বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। শর্তগুলো তোমাকে আমি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনটি শর্তের যেকোনো একটি মেনে নিলেই আমরা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করে নিতে পারি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও। তখন তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং আমাদের ও তোমাদের অধিকার সমান হয়ে যাবে। যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হও, তা হলে তোমরা আমাদের আনুগত্য মেনে নাও এবং আমাদের নির্ধারিত জিযিয়া পরিশোধ করে আমাদের নিরাপত্তায় চলে আসো। যদি এটিও মেনে নিতে ব্যর্থ হও, তা হলে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে এবং আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো মীমাংসাকারী, যাঁর বার্তা নিয়ে আমরা তোমাদের কাছে এসেছি।

মুকাওকিস আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এই পত্রোত্তর সবাইকে পাঠ করে শোনালেন। তার চেহারায় হতাশা ও বিস্ময়ের মিশ্র ছাপ ফুটে উঠল।

'বুঝতে পেরেছ সবাই?'– পত্রখানা পড়ে ভাঁজ করে সম্মুখে রেখে দিয়ে সকলের পানে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আশাহত কণ্ঠে মুকাওকিস বললেন– 'এটি সেই ব্যক্তির উত্তর, যে সন্ধি নিয়ে কথা-ই বলতে রাজী নয়। দেখ-না; লোকটা কোন ভাষায় উত্তর লিখেছে! এটি এমন এক বিজেতার চিঠি, যে কিনা আমাদের উপর শাসন চালাচ্ছে। আরবের এই জাতিটার দম্ভ দেখো। ঐশ্বর্য ও মণি-মানিক্যের প্রস্তাবকে এরা কিছুই মনে করছে না!

মুকাওকিস প্রতিনিধিদলের সব কজন সদস্যের পানে তাকালেন এবং কিছু সময় চুপচাপ থেকে পরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুদিন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করেছ। তা ওদের কেমন পেয়েছ? খুব দাম্ভিক নাকি?'

'না গভর্নর!'– দলনেতা বড় পাদরি বললেন– 'একসঙ্গে এতগুলো মুসলমানকে কাছে থেকে আমি এ-ই প্রথমবার দেখেছি। আমি এমন একটি জাতি দেখেছি,

যাদের কাছে জীবনের চেয়ে মৃত্যু এবং অহমিকার চেয়ে বিনয়-নম্রতা বেশি প্রিয়। তাদের কথাবার্তা, চালচলন, ওঠাবসা ও স্বভাব-চরিত্রে দাম্ভিকতার লেশমাত্র নেই। তাদের মাঝে একজন মানুষও সম্ভবত এমন নেই, এই জগতের প্রতি, এই মাটির প্রতি তার কোনো টান আছে। তারা একত্রে বসে খাবার খায়। বসে মাটিতে। তাদের মাঝে শাসক-অধীন, সেনাপতি-সাধারণ সৈনিকের কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই একই রকম খাবার খায় আর তারপর কৃতজ্ঞতা আদায় করে।...

'আমি এ-ই প্রথমবার মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে উপাসনা করতে দেখলাম, যাকে তারা 'সালাত' বলে। সিপাহসালার ইমামত করেন আর অবশিষ্ট সবাই তার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তার আগে তারা উজু করে এবং নিজেদের পবিত্র বানিয়ে সালাতে দাঁড়ায়। তারপর ইমাম যা করে, সবাই তার অনুসরণে তা-ই করে। এভাবে তারা এই উপাসনাটি সমাপ্ত করে। ইমাম দাঁড়িয়ে থাকে তো সবাই দাঁড়িয়ে থাকে। ইমাম নুয়ে থাকে তো সবাই নুয়ে থাকে। ইমাম মাটিতে কপাল ঠোকে তো সবাই তা-ই করে। তাদের এই শৃঙ্খলা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি।'

মুকাওকিস আগে থেকেই মুসলমানদের প্রতি একরকম প্রভাবিত ছিলেন। এবার যখন পাদরির মুখ থেকে তাদের এসব গুণের কথা শুনলেন, তখন মাথা নত করে গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে এক-এক করে সবার পানে তাকালেন। পরিস্থিতি যা কিছুই হোক তিনি মিশরের রাজা বটে। সবাই নির্বাক বসে আছে; কারও মুখে রা নেই। কেউই বলতে পারছে না, মুকাওকিস কী আদেশ জারি করেন। পরে যখন তিনি মুখ খুললেন, তখন সবাইকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিলেন।

'সেই খোদার কসম, যার নামে কসম খাওয়া হয়'– মুকাওকিস অবলীলায় বলে উঠলেন– 'এই মুসলমানরা যদি কোনো পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করে, তা হলে তা করার শক্তি পেয়ে যায়। আমি স্বীকার করছি, যুদ্ধের মাঠে তাদের মোকাবেলা করা কারুরই পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের মাঝে এমন কিছু গুণ আছে, যেগুলো আমাদের মাঝে নেই। এটি কঠিন একটি বাস্তবতা। কাজেই তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো আমার ভাইয়েরা! সন্ধি-সমঝোতার এটিই মোক্ষম সময়। কারণ, এখন তারা নীলনদের বেষ্টনিতে আটকে আছে। দিনকতক পর যখন তারা এই বিপদ থেকে বেরিয়ে যাবে, তখন সমঝোতার আর কোনো পথ থাকবে না। তখন আর তারা সন্ধি করতে রাজিই হবে না।'

সবাই দেখল, মুকাওকিস শুধু সন্ধি-সমঝোতা নিয়েই কথা বলছেন। পদপর্যাদায় তিনি মিশরের গভর্নর; মানে রাজা। তার মতো লোক মনের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করলে কারুর এমন দুঃসাহস নেই যে, তার বিরুদ্ধে মুখ খোলে। মুকাওকিস তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের কী করা উচিত।

'এখনও সুযোগ আছে'– একজন বলল– 'আপনি মুসলমানদের সিপাহসালারকে আলোচনার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাতে লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি তার কোনো উত্তর দেননি। এটি কি ভালো হবে না যে, আপনি তাকে আরেকটি বার্তা পাঠাবেন, যেন আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি লোক পাঠান?

সবাই তার এই পরামর্শের সঙ্গে একমত হলো। মুকাওকিস তখনই সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নামে বার্তা লেখালেন, এখনও আপনি প্রতিনিধিদল পাঠাননি এবং এ ব্যাপারে কোনো উত্তরও দেননি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে উভয় পক্ষে আলোচনার প্রয়োজন। কালবিলম্ব না করে আপনি প্রতিনিধি পাঠান। আমি অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকব।

* * *

মুকাওকিসের এই বার্তাটি একজন সাধারণ দূতের হাতে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছে গেল। আমর ইবনে আস দূতকে বাইরে বসিয়ে রেখে সেনাপতিদের তলব করলেন এবং মুকাওকিসের পত্রটি পড়ে তাঁদের শোনালেন।

'প্রথমে চিন্তা করো, লোকটা এভাবে সন্ধির পেছনে পড়ে গেল কেন'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমার মনে হয়, মুকাওকিস দেখে নিয়েছে, তার বাহিনী মনোবল ও চেতনার দিক থেকে যুদ্ধ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আবার এও হতে পারে যে, সন্ধির আলোচনার নামে আমাদের ধোঁকা দিয়ে সে সময় নিচ্ছে। আর সময় নেওয়ার কারণ এ হতে পারে যে, ততক্ষণে তার জরুরি সাহায্য এসে পড়বে। আমাদের পরামর্শ দাও, আমি কি প্রতিনিধি পাঠাব, নাকি আবেদন প্রত্যাখ্যান করব। তবে একটি শর্তও আমি শিথিল করতে পারব না। এখানে হাত দেওয়ার কোনোই সুযোগ আমার নেই।'

'সময় ও সুযোগ আমাদেরও দরকার'– এক সালার বললেন– 'নীলে ভাটার টান ধরেছে ঠিক; কিন্তু নদী উপচে যে-পানি বাইরে এসে পড়েছিল, তা এখনও নামেনি। আমরা এখনও পর্যন্ত পানির বেষ্টনিতে আটকা আছি। এই পানি ফিরে

যাওয়ার কিংবা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। অন্যথায় যদি যুদ্ধ করতে হয়, তা হলে এই মাটিতে আমরা দাঁড়াতে পারব না।

'বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার মাননীয় সিপাহসালার!'– আরেক সালার বললেন– 'এটিও তো আল্লাহর আদেশ যে, শত্রু যদি সন্ধির জন্য হাত বাড়ায়, তা হলে তাকে সুযোগ দাও যদি তারা তোমাদের শর্ত মেনে নেয়।'

শলা-পরামর্শের পর আমর ইবনে আস (রাযি.) দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে নিলেন এবং হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.)কে তার নেতা নির্বাচন করলেন, যিনি হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর নেতৃত্বে আসা সহযোগী বাহিনীর একটি অংশের সেনাপতি। তাঁর গায়ের রং কালো, আকৃতিতে খর্ব ও স্থূল। এক কথায় বেঢপ ও বেমানান।

আমর ইবনে আস (রাযি.) মুকাওকিসের বার্তার উত্তর দিয়ে তার দূতকে বিদায় করে দিলেন। উত্তর ছিল, আমার প্রতিনিধিদল আসছে। তারপর আমর ইবনে আস প্রতিনিধিদলের সব কজন সদস্যকে তলব করলেন এবং সবার উপস্থিতিতে দলনেতা উবাদাকে আলোচনায় তিনি কী বলবেন তার নির্দেশনা দিলেন। অবশেষে সেই তিনটি শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেগুলো তিনি মুকাওকিসকে আগেও উপস্থাপন করেছিলেন। সিপাহসালার আমর ইবনে আস অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলে দিলেন, এসব শর্তে যেন বিন্দুপরিমাণও নমনীয়তা দেখানো না হয়। এখানে আপসের কোনোই সুযোগ নেই।

এই প্রতিনিধিদল পরদিনই মুকাওকিসের কাছে পৌঁছে গেল। মুকাওকিস তার উপদেষ্টা ও সেনাপতিদেরসহ তাদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে দলনেতা উবাদা ইবনুস সামিত কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু মুকাওকিস তাঁর পানে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকালেন এবং বোঝাতে চাইলেন, যেন তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করছেন।

'এই কালো-কুশ্রী মানুষটাকে আমার সামনে কেন আনা হলো!'– মুকাওকিস অবজ্ঞার সুরে ঝাঁজালো কণ্ঠে বললেন– 'সরিয়ে নাও একে আমার সামনে থেকে! অন্য কেউ কথা বলো!'

উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.)-এর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল। প্রতিনিধিদলের এক সদস্য বললেন, সিপাহসালার একে প্রতিনিধিদলের প্রধান নির্বাচন করে পাঠিয়েছেন। কাজেই কথা ইনিই বলবেন। এর উপর আমাদের প্রত্যেকের পুরোপুরি আস্থা আছে।

মুকাওকিস এখনও নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ পাননি; তার আগেই প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য এক কণ্ঠে বলে উঠলেন, উবাদা ইবনুস সামিত আমাদের দলনেতা; তাঁর উপস্থিতিতে আমরা কেউই কথা বলব না।

প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যের এই প্রতিক্রিয়া দেখার পর এবার মুকাওকিসের মুখে তালা লেগে গেল। তারই সমধর্মী ঐতিহাসিক বাটলার লিখেছেন, মুকাওকিস এমন অভদ্রোচিত কথা বলার মতো মানুষ ছিলেন না। কিন্তু এখানে কথাটা বলে ফেলেছেন বড়ই অসামাজিক। কেন বললেন? তার কারণ এ হতে পারে যে, তিনি মুসলমানদের এই প্রতিনিধিদলটির মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। হয়তবা দেখতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের পারস্পরিক শৃঙ্খলা ও মান্যতাবোধ কেমন এবং তারা তাদের সিপাহসালারের আদেশ-নিষেধ শতভাগ পালন করে কিনা। অবশেষে তিনি মাথা নাড়িয়ে উবাদা ইবনুস সামিতকেই কথা বলতে সায় দিলেন।

'মিশরের গভর্নর!'– উবাদা ইবনুস সামিত কথা শুরু করলেন– 'আমরা মুসলমান এবং ইসলামি আইনের অনুসারী। ইসলাম রং-রূপ আর পোশাকের উপর ভিত্তি করে কাউকে সম্মানিত বা ইতর সাব্যস্ত করার অনুমতি দেয় না। এ জগতের খেল-তামাশার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের আত্মার সম্পর্ক আখেরাতের সঙ্গে। দুনিয়াতে আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। কোনো প্রলোভন বা সম্পদের পাহাড়ও এ পথ থেকে আমাদের সরাতে পারবে না। আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনার কাছে আমাদের পাঠানো হয়েছে। আগে আপনি আপনার দাবি-দাওয়া উত্থাপন করুন।

'আমার দাবির কথা আমি তোমাদের সিপাহসালারের কাছে লিখে পাঠিয়েছি'– মুকাওকিস বললেন– 'এখন তোমাদেরও অবহিত করছি। তোমরা তোমাদের সিপাহসালারের মাথায় আমার এ কথাগুলো বসিয়ে দেবে। তোমরা এ আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত রয়েছ যে, রোমান বাহিনীর সৈন্য এ কজনই, যাদের তোমরা প্রতিটি রণাঙ্গনে পরাজিত করে আসছ। তোমরা যাদের দেখেছ, তারা ছাড়াও এই দুর্গে আমাদের এত সংখ্যক সৈন্য ও এতখানি শক্তিশালী বাহিনী আছে। আর এত অধিকসংখ্যক সৈন্যের নতুন বাহিনী আসছে, যার কল্পনাও তোমরা করতে পারবে না।...

'সংখ্যায় তোমরা খুবই নগণ্য। তা ছাড়া আমি জানি, তোমরা কী রকম নানা পেরেশানির মুখোমুখি। আরও কটা দিন গেলে তোমরা বাহিনীর দানা-পানিও জোটাতে পারবে না। আমি এই যে বারবার তোমাদেরকে তোমাদের দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তা শুধু এজন্য যে, তোমাদের এই গুটিকতক সৈন্যের

বাহিনীটার জন্য আমার মায়া লাগছে। তোমাদের এ ফৌজ যখন আমার বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাবে, তখন আমার খুব আক্ষেপ হবে। কারণ, একে আমি পাপ মনে করি। আমি সে-সময় খুশি হব, যখন তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করে নেবে। আমি তোমাদের বাহিনীর প্রতিজন সৈনিককে দুই দিনার, প্রত্যেক সেনাপতিকে একশো দিনার এবং তোমাদের খলীফাকে এক হাজার দিনার দেওয়ার প্রস্তাব করছি। এগুলো আমার থেকে উসুল করে তোমরা ফিরে যাও এবং রোমান বাহিনীর আক্রোশ ও ধ্বংসলীলা থেকে নিজেদের রক্ষা করো।'

ঐতিহাসিকগণ নানা ঘটনার উপর পর্যালোচনা করে এবং পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, মুকাওকিস একদিকে মুসলমানদের ভালো চোখে দেখতেন এবং সন্ধি-সমঝোতার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন; অন্যদিকে যখনই কোনো মুসলমানকে সামনে পেতেন, তখনই হুমকি-ধমকির ভাষায় কথা বলতেন। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, তিনি আশা পোষণ করতেন, মুসলমানরা যদি কোনো প্রলোভনের ফাঁদে না-ও আসে, অন্তত ভয় পেয়ে হয়তবা তারা ফিরে যাবে।

ইতিহাসে এসেছে, হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) হিসাব করে দেখেছেন, মুকাওকিসের অফারের পরিমাণ ত্রিশ হাজার দিনার। তার মানে, মিশরের গভর্নর মুকাওকিস প্রস্তাব দিয়েছেন, তোমরা ত্রিশ হাজার দিনার উৎকোচ নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাও।

'আমি আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম'– উবাদা ইবনুস সামিত বললেন– 'আমি আমার সিপাহসালারের পক্ষ থেকে যে-প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছি, তার একেবারেই পরিষ্কার। আপনার হুমকি-ধমকি আমার উপর কোনোই ক্রিয়া করবে না। আমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। নিজেদের সৈন্যসংখ্যা কত কম আর প্রতিপক্ষ কত বেশি তা আমরা দেখি না। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি, আল্লাহ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাহিনীকেও বিশাল-বিশাল বাহিনীর উপর জয়যুক্ত করতে পারেন। যারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে ইসলামের জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। আপনি আমাদের বাহিনীর খাদ্য-পানীয়র যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, আমাদের কাছে এর কোনোই গুরুত্ব নেই। আমরা আল্লাহর পথে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছি। তিনি আমাদের না খাইয়ে মারবেন না। আমরা দুনিয়ার সংকট-স্বচ্ছলতার পরোয়া করি না। কারণ, আমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে।...

'আমাদের সিপাহসালার– যিনি আমাদের নেতাও বটে– 'আপনাকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, শর্ত আমাদের তিনটি। আপনি তার যেকোনো একটি

গ্রহণ করে নিন। তার বাইরে যেকোনো আলোচনা অর্থহীন। তাতে কিছুই অর্জিত হবে না। আমাকে আমার নেতা, তাঁকে আমীরুল মুমিনীন এবং তাঁকে আল্লাহর রাসূল যা শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তা-ই আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করে এ দেশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্টা করুন; তা হলে আমরা ফিরে যাব। যদি তা না করেন, তা হলে জিযিয়া আদায় করে আমাদের নিরাপত্তা গ্রহণ করুন; আমরা আপনাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেব। যদি এ দুটির একটিও গ্রহণ না করেন, তা হলে আমাদের ও আপনাদের মাঝে মীমাংসা করবে তরবারি।'

সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই আলোচনার পর মুকাওকিস হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.)-এর সম্মুখে আরও কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কিন্তু উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) সব কটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেছেন, এই অধিকার আমার তো ভালো কথা; খোদ সিপাহসালার; এমনকি স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন-এরও নেই যে, ইসলামের শর্তাবলিতে আমরা সামান্যতমও হস্তক্ষেপ করব।

এবার মুকাওকিস তার উপদেষ্টামণ্ডলি ও সেনাপতিদের পানে তাকালেন এবং জানতে চাইলেন, বলো, তিন শর্তের কোনটি তোমরা গ্রহণ করবে। এক বাক্যে সবাই জানিয়ে দিল, না আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী আছি, না জিযিয়া দিতে প্রস্তুত। উত্তর শুনে হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রাযি.) ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন।

* * *

মুসলিম বাহিনীর প্রতিনিধিদলটি উঠে যাওয়ার পর মুকাওকিস তার উপদেষ্টামণ্ডলি ও সেনাপতিদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেই আলাপচারিতার বিবরণও ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

'আমি এখনও বলছি, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যাওয়া উচিত'– মুকাওকিস দৃঢ়তার সাথে বললেন– 'তোমরা তো দেখেছ, তারা কোনো প্রলোভনেই আসছে না এবং কোনো হুমকি-ধমকিকেও পরোয়া করছে না।'

'আপনি তাদের কোন শর্তটি মানতে রাজী আছেন?' সেনাপতি জর্জ জিজ্ঞাসা করলেন।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না'– মুকাওকিস বললেন– 'আমি আমার মতামত ব্যক্ত করব আর তোমরা সবাই তার উপর চিন্তা করবে। আজ আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছি, মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠা

তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা নিজেরাও তার প্রমাণ দেখেছ। কাজেই যুদ্ধ ধরে রাখার চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দাও। ইসলাম কবুল না কর; কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি অবশ্যই মানতে হবে।'

'শ্রদ্ধেয় গভর্নর!'– এক উপদেষ্টা বিস্ময়ের সাথে বলল– 'আপনি বোধহয় বলতে চাচ্ছেন, আমরা জিযিয়ার শর্ত মেনে নেব আর মুসলমানদের গোলাম হয়ে জীবন কাটাব!'

'গোলামি এতটুকু হবে যে, তোমরা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেবে'– মুকাওকিস বললেন– 'মুসলমানরা তোমাদের গোলাম মনে করবে না; বরং তোমাদের পুরোপুরি অধিকার ও মর্যাদা দেবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা লড়াই অব্যাহত রাখ আর মুসলমানরা তোমাদের উপর জয়লাভ করে, তখন তোমাদের সঙ্গে তাদের আচরণ ভিন্ন রকম হবে। তখন না তোমাদের জীবন নিরাপত্তা পাবে, না ধনসম্পদ। এই পরিস্থিতিতেই বরং তোমরা সত্যিকার অর্থে ক্রীতদাসে পরিণত হবে।'

'তার থেকে মৃত্যুই শ্রেয়।' সেনাপতি থিওডোর বললেন এবং রাগের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।

থিওডোরের দেখাদেখি অন্য সবাইও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুকাওকিসকে একলা ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন। মুকাওকিস তাদের থামাতে চেষ্টা করলেন না। তিনি বুঝে ফেলেছেন, মুসলমানদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার মিশনে এখন তিনি শুধুই একা। সহকর্মীদের একজনও আর তার সঙ্গে নেই। সেনাপতিরা সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছেন, তারা তরবারির মাধ্যমেই মীমাংসা করবেন। অগত্যা মুকাওকিসকে তাদের সঙ্গ দিতে হলো। অন্যথায় বিদ্রোহ হতে পারত। কিবতি খ্রিস্টানরা তো বিদ্রোহের পথ আগে থেকেই খুঁজছে।

সেনাপতিরা তাদের অধীন কমান্ডারদের সমবেত করে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যুদ্ধ হবে এবং অবরোধের উপর আক্রমণ চালানো হবে। তারা কথা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখলেন না; বরং বললেন, এবারকার যুদ্ধ আগেকার লড়াইগুলোর মতো হবে না যে, মুসলমানরা সামান্য চাপ সৃষ্টি করল আর অমনি আমাদের বাহিনী পালিয়ে আসবে। এবার একটা নতুন কথা মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে, আমাদের রাজা মুকাওকিস আমাদেরকে মুসলমানদের গোলাম বানানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য তিনি সওদাবাজি করছেন।

সেনাপতিরা তাদের অধীন কমান্ডারদের আরও কিছু কথা বলে উত্তেজিত করে তুললেন এবং বললেন, তোমরা আপন-আপন ইউনিটগুলোকে বলে দাও, তোমরা যদি যুদ্ধবন্দি হয়ে যাও, তা হলে ভেড়া-বকরির মতো মুসলমানদের গোলাম হয়ে যাবে। মানুষের স্তর থেকে নামিয়ে তোমাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। তোমরা তাদের পশুপালে পরিণত হবে। এহেন আচরণ তারা তোমাদের বোন-কন্যাদের সাথেও করবে।

কমান্ডাররা কথাগুলো নিজ-নিজ ইউনিটের প্রতিজন সৈনিকের কানে পৌঁছিয়ে দিল এবং গভর্নর মুাকওকিসের পরিকল্পনার বিষয়টি শুনিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলল। সৈনিকরা কথাগুলো জনসাধারণের কানে দিয়ে দিল। শুনে জনতা এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, যেলোকগুলো মুসলমানদের নাম শুনে ভয়ে কাঁপত এবং তাদের আনুগত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল, হঠাৎ করে তারা মুসলমানদের শত্রু হয়ে গেল। তারা বাহিনীকে বলল, আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যান; আমরা আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব।

ঐতিহাসিকগণ আরও লিখেছেন, মুসলিম বাহিনীর প্রতিনিধিদল চলে যাওয়ার পর মুকাওকিস সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে আরেকটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য আমাকে এক মাস সময় দিন। কিন্তু আমর ইবনে আস উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তিন দিনের বেশি সময় দিতে পারব না। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সংশয় সত্যে পরিণত হচ্ছিল যে, মুকাওকিস সময় নেওয়ার চেষ্টা করছে আর বিশেষ সাহায্য এসে পৌঁছার অপেক্ষা করছে।

ব্যবিলন দুর্গে রোমান বাহিনীর যে-পরিমাণ সৈন্য ছিল, সংখ্যার বিচারে তারপর আর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মুকাওকিস সাহায্যের জন্য এত অধীর এজন্য ছিলেন যে, এস্কান্দারিয়া থেকে যে-বাহিনীটি আসবে, তারা হবে একদম তরতাজা। এস্কান্দারিয়ায় রোমান বাহিনীর এমন কয়েকটি ইউনিট ছিল, যারা এখনও অবধি মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়নি। বাজিন্তিয়া থেকে কোনো সহযোগী বাহিনী আসবার কোনো সম্ভাবনা-ই ছিল না।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মনোনীত প্রধান বিশপ কায়রাস ব্যবিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও হেরাক্‌ল-এর বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিনয়ামিনের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়েছিলেন। মুসলমাদদের ব্যাপারে তিনি খুবই কঠোর এবং ইসলামের কট্টর শত্রু ছিলেন। দুর্গের কিবতিদের তিনি এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুললেন, যেন তারা আগুনের গোলায় পরিণত হয়ে গেল।

নগরীর পরিস্থিতি এখন এমন, যেন মানুষগুলো হঠাৎ গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে। সৈনিকদের তো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতেই হবে। জনসাধারণও তির-ধনুক, তরবারি-বর্শা নিয়ে তৈরি হতে শুরু করল। তাদের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল, এই বিশাল সমাবেশ বানের মতো সামনে পড়া পাহাড়গুলোকেও খড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মুকাওকিস তার বাসভবনে চুপচাপ বসে আছেন। এই তৎপরতা ও ডামাডোলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মাঝে-মধ্যে বাইরে এসে দেখছেন, কখনও উপরে উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকছেন আর বাহিনী ও জনসাধারণের দৌড়-ঝাঁপ অবলোকন করছেন।

'মাননীয় গভর্নর!'– কায়রাস একদিন মুকাওকিসের কাছে গিয়ে বললেন– 'এবার আমরা মুসলমানদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলব।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না?'– মুকাওকিস বললেন– 'এই ফৌজ আর এই জনতা কি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে না?'

'না'– কায়রাস উত্তর দিলেন– 'আমি জানি, আপনি সন্ধি চাচ্ছেন আর এরা এমনভাবে জেগে উঠেছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এদের এই প্রস্তুতি আপনার বিরুদ্ধে নয়। আপনি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। গির্জাগুলোতে প্রার্থনা চলছে। আপনি হতাশ হবেন না মাননীয় গভর্নর!'

ইতিহাসে এসেছে, মুকাওকিস কোনেই প্রত্যুত্তর করলেন না। না কোনো উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন, না হতাশাজনক কোনো ইঙ্গিত দিলেন। তার ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সেই হাসিতে আনন্দের কোনো ঝলক ছিল না। অবশ্য পরিহাসের খানিক আভাস ছিল বটে।

দুর্গে রোমান বাহিনী নিজের সংখ্যাধিক্য ও জনসাধারণের সহযোগিতার উপর ভরসা করে নিরতিশয় উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি ভরসা তাদের এটিও ছিল যে, রাওজা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বাহিনী এসে পড়বে আর সংখ্যাটা তাদের আরও বেড়ে যাবে।

দুর্গের বাইরে পরিখা থেকে সামান্য দূরে অল্প কজন মুজাহিদ স্রেফ আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে আছেন। যুদ্ধবিশেষজ্ঞরা বলছেন, চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না, এই গুটিকতক মুসলমান কয়েকটা মিনিটও এই বিশাল রোমান বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে। উপরন্তু রোমান বাহিনী এখন জনসাধারণকেও পক্ষে পেয়ে গেছে! এমনকি তাদের নারীরা পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত!

মহান আল্লাহর ঘোষণা আছে, যদি তোমরা পরিপক্ক ঈমানদার হও, তোমাদের ঈমান যদি পাকা হয়, তা হলে তোমরা দশজন একশোজন কাফেরের উপর, একশোজন এক হাজার কাফেরের উপর জয়যুক্ত হবে। ব্যবিলন দুর্গ অবরোধ করে জনাকয়েক মুসলমান আল্লাহপাকের এই সুসংবাদের উপর ভরসা করে বসে আছে।

একরাত। দুর্গের বাইরের জগত গভীর নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। রোমান বাহিনী নদীর দিক থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা কতগুলো নৌকায় চড়ে বসল এবং সেই জায়গাটিতে পৌঁছে গেল, যেখান থেকে মুজাহিদদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব। ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লেখা নেই, রোমান সৈন্যরা কি শুধু নদীর দিককার ফটক দিয়েই বেরিয়েছিল, নাকি অন্য কোনো ফটক দিয়েও বেরিয়েছিল। তারা রাতারাতি-ই পরিখার উপর পুল বিছিয়ে দিয়েছিল, যেগুলো এমন মুহূর্তের জন্য সব সময় প্রস্তুত রাখা হতো।

রোমানদের এই অভিযান এতই গোপন ও শব্দহীন ছিল যে, মুসলমানরা জানতে পর্যন্ত পারল না। পাহারায় নিয়োজিত সান্ত্রীরা পর্যন্ত টের পেল না।

মুজাহিদদের উপর হঠাৎ একটা প্রলয় ঝাঁপিয়ে পড়ল। রোমান বাহিনীর এই আক্রমণ ছিল আকস্মিক, অভাবিত, অতিশয় তীব্র ও জোরালো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, তারা চোখ খোলার সময়টুকুও পাবেন না; তার আগেই রোমান সৈন্যরা তাদের এই নিদ্রাকে চিরনিদ্রায় পরিণত করে দেবে। কিন্তু– কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা আসমান, জমিন, এই অন্ধকার রাত এবং পরে ইতিহাসকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিলেন যে, আক্রমণ হতেই তাঁরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেন তাঁরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে বসে ছিলেন। পলকের মধ্যে অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলে উঠল। মুজাহিদরা রাতকে দিন বানিয়ে দিলেন।

এটি ছিল সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর সব কজন সালার ও সকল সৈন্যকে বলে রেখেছিলেন, শত্রুদেশে এসে একটা পলকের জন্যও উদাসীন থাকা যাবে না। যখন ঘুমাবে, এমনভাবে ঘুমাবে, যেন একটা চোখ খোলা থাকে। ঘোড়া ও অস্ত্র সব সময় প্রস্তুত থাকবে; যেকোনো সময় আক্রমণ আসতে পারে।

ইসলামের সৈনিকরা মনে করেন, সেনাপতিদের পক্ষ থেকে যেসব আদেশ-নিষেধ আসে, সেসব মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকেই আসে। সেসবের বিরুদ্ধাচরণ করা আর আল্লাহর আযাব-গজব ঢেকে আনা একই কথা। এ বিশ্বাসই তাঁদের পায়ে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা এনে দেয়।

আক্রমণকারী রোমান বাহিনী প্রথম যে-ধাক্কাটা খেল, তা হলো, মুসলমানরা এমনভাবে সজাগ হয়ে গেলেন, যেন তারা জানতেন, আক্রমণ আসছে। তারপর রোমান বাহিনীর সেনাপতিরা একটা ভুলও করেছিলেন যে, তারা বিপুলসংখ্যক সাধারণ নাগরিককে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বাহিনীতে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। এই আক্রমণ-অভিযানে তাদেরও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা তির-তরবারি-বর্শা চালাতে জানত বটে; কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করার যোগ্যতা তাদের ছিল না। তারা বরং বাহিনীর জন্য একটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। সজাগ হয়ে মুসলমানরা যখন পরম বীরত্বের সাথে এই আক্রমণ প্রতিহত করলেন, তখন সবার আগে রোমানদের স্বেচ্ছাসেবী জনতার মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেল।

হঠাৎ আক্রমণ এলে কোন বিন্যাসে মোকাবেলা করতে হবে আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর সেনাপতিদের আগেই তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তার মানে এ লড়াইয়ে মুসলমানরা একটি বিন্যাস ও সৃঙ্খলার মধ্যে ছিলেন আর তাদের মোকাবেলায় রোমান বাহিনী ও জনতা একটা ভিড়ের আকারে এসেছিল। মুসলমানরা যখন পা জমিয়ে মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলেন, রোমারা তখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

রোমান সৈন্যরা প্রথম হোঁচটটা খেল যে, মুসলমানরা যেন আগে থেকেই সজাগ ছিল এবং পরে তারা বাতিও জ্বালিয়ে নিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি রোমান সৈনিকদের জন্য একটা বিপদ হয়ে দাঁড়াল। মুজাহিদরা তাদের এই হতাশাপূর্ণ পরিস্থিতিকে পুরোপুরি কাজে লাগালেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মুজাহিদরা রোমান বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ লড়তে বাধ্য করে দিলেন।

শত্রুবাহিনী দুর্গের বাইরে এসে আক্রমণ চালালে কীভাবে লড়াই করতে হবে এবং কোন-কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে সিপাহসালার আমর ইবনে আস তাঁর বাহিনীকে বিশেষভাবে তার প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছিলেন। এক হলো, একটি ইউনিট শত্রুবাহিনীর পেছনে চলে যেতে চেষ্টা করবে, যাতে তারা দুর্গে ঢুকে যেতে পারে। যদি দুর্গের ফটক আগেই বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে দুর্গ-থেকে-বেরিয়ে-আসা বাহিনীকে তারা ঘিরে ফেলে সর্বশেষ সৈনিকটি পর্যন্ত হত্যা করে ফেলবে।

এধরনের যুদ্ধ লড়ার এবং শত্রুবাহিনীর পেছনে চলে যাওয়ার কৌশল প্রয়োগের অভিজ্ঞতা মুজাহিদদের আগে থেকেই ছিল। আগেও দু-চারটি দুর্গ তাঁরা এই কৌশল অবলম্বন করে জয় করেছিলেন। এবার ব্যবিলন দুর্গের বাইরে যখন মুজাহিদরা দেখলেন, রোমান বাহিনী পরিখার উপর পুল বিছিয়ে বেরিয়ে এসেছে,

তখন তাঁরা রোমানদের পেছনে গিয়ে পুলগুলো দখলে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। সিপাহসালার আগেই একজন সালার ও তাঁর ইউনিটকে একাজের জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন। কিছু সময় পর রোমানরা দেখল, মুসলমানরা তাদের পেছনে আসছে। তাতে তাদের হতাশা আরও বেড়ে গেল। তারা পরিখা অতিক্রম করে দুর্গে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিল। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের যেতে দিলেন না। পরিখার এক-দুটা পুলই রয়ে গেল, যেগুলো এখনও মুজাহিদরা দখল করতে পারেননি। ওই পথে কিছু রোমান জীবন নিয়ে পেছনে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরিখার বাইরে থাকা রোমান সৈন্যদের একজনও বোধহয় প্রাণ বাঁচাতে পারল না। কোনো-কোনো রোমান লাফিয়ে পরিখা পার হতে চেয়েছিল। কিন্তু তিরন্দাজ মুজাহিদরা প্রদীপের আলোতে তাদের তিরের নিশানা বানিয়ে নিলেন। এভাবে বহু লাশ পরিখার টইটম্বুর পানিতে ডুবতে ও সাঁতরাতে লাগল।

বহুসংখ্যক রোমান সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক দুর্গে ফিরে যেতে সক্ষম হলো। দুর্গবাসী যখন দেখল, তাদের সৈন্যরা পেছনে পালিয়ে আসছে, তখন মুকাওকিসের আদেশে সবগুলো ফটক বন্ধ করে দেওয়া হলো, যাতে মুজাহিদরা দুর্গে ঢুকতে না পারেন। মুসলমানদের ঠেকাতে গিয়ে মুকাওকিস নিজের বহুসংখ্যক সৈন্যকে কুরবান করে দিলেন। কারণ, দুর্গের ফটক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও যেসব রোমান সৈন্য বাইরে রয়ে গিয়েছিল, তাদের একজনের পক্ষেও জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধকে ঘোরতর ও রক্তক্ষয়ী বলে অভিহিত করেছেন। কোনো-কোনো অমুসলিম ঐতিহাসিক তাদের ইসলামবিরোধী মানসিকতাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে এমনও লিখেছেন যে, একদিকে ছিল শুধু চেতনা আর প্রত্যয়; অপরদিকে সংখ্যাধিক্যের ভরসা, যেখানে একটা পা উপড়ে গেল তো সবগুলো পা উপড়ে গেল। কিন্তু মুসলিম সৈনিকরা তাদের চেতনাকে এবং মুসলিম সেনাপতিরা তাদের বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকে ঠাণ্ডা মাথায় পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে।

এমন একটা তুমুল যুদ্ধ রাতারাতিই শেষ হয়ে গেল। ভোর হলো। সূর্যের কিরণমালা পৃথিবীতে আলো ছড়াতে শুরু করল। এবার দেখা গেল লাশ আর লাশ। যেখানেই চোখ পড়ছে, যেদিকেই দৃষ্টি যাচ্ছে লাশ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আহতরা এই লাশের বহর থেকে উঠে এক-দুপা অগ্রসর হয়ে আবার লুটিয়ে পড়ছে। নীলের পানি কূল ছাপিয়ে অনেকগুলো ঝিল ও পুকুরের আকারে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই পানি মৃতদের রক্তে লাল হয়ে গেছে।

বহু মরদেহ পানিতে পড়ে আছে। ব্যবিলন দুর্গের তিন দিককার পরিখার পানিও লালচে হয়ে গেছে। এই ভয়ানক দৃশ্য থেকে মুসলমানদের তাকবীরধ্বনি উঠে-উঠে গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

ব্যবিলনের দুর্গঘেরা নগরীর অধিবাসী ও রোমান বাহিনীর পালিয়ে-যাওয়া-সৈনিকরা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে রাতের লড়াইয়ের পরিণতি দেখছিল। উপর থেকে এই ভয়ানক দৃশ্য আরও অধিক ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। তারা প্রত্যয় নিয়েছিল, মুসলমানদের পরাজিত করতে প্রয়োজনে নারীরাও মাঠে নেমে আসবে। কিন্তু ঘটল এমন যে, পুরুষরাও জমে লড়াই করতে পারল না। বহুসংখ্যক প্রাণ হারাল আর যারা রক্ষা পেল, তারা পালিয়ে নগরীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। নগরীর ফটক যদি যথাসময়ে বন্ধ না হতো, তা হলে নগরীর ভেতরকার দৃশ্যও এমনই করুণ হতো।

মুকাওকিসের সংবাদদাতারা তাকে সংবাদ দিল, নগরবাসী ও সৈন্যরা পাঁচিলের উপর উঠে বাইরের দৃশ্য অবলোকন করছে এবং তাদের মনোবল– যা কিনা আগে থেকেই দুর্বল ছিল– আরও ভেঙে পড়েছে। এ সংবাদ শুনে মুকাওকিস ক্ষুব্ধমনে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং আদেশ জারি করলেন, কোনো নাগরিক বা সৈনিক যেন পাঁচিলের উপর না থাকে। যাদের ডিউটি আছে তারা ছাড়া সবাই যেন নেমে পড়ে।

এ আদেশ পাওয়ামাত্র মুকাওকিসের রক্ষী ইউনিটের বহুসংখ্যক সদস্য ছুটে গেল এবং উপরে গিয়ে লোকদের হাঁকিয়ে ও ঠেলে-ঠেলে পাঁচিল থেকে নামিয়ে দিল। তারপর সমগ্র নগরীতে মুকাওকিসের এ আদেশ প্রচার করে দেওয়া হলো যে, কোনো ব্যক্তি যেন ডিউটি ছাড়া পাঁচিলের উপর না ওঠে।

সবাই পাঁচিলের উপর থেকে নেমে গেলে মুকাওকিস তার সেনাপতিবৃন্দ ও জনাদুয়েক উপদেষ্টাকে ডেকে পাঠালেন। কায়রাসও এসে পড়লেন। সবাইকে সাথে নিয়ে মুকাওকিস পাঁচিলের উপর উঠে বাইরের দৃশ্যটা অবলোকন করলেন।

'দেখতে পাচ্ছ তোমাদের যুদ্ধের পরিণতি?'– মুকাওকিস বললেন– 'তোমরা তাদের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করেছিলে। কিন্তু এই রক্তাক্ত ফলাফল বলছে, যেন তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে আর তারা তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছে। আমি জানতাম, এমনটা-ই হবে। তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছ। বাস্তবতা দেখো। আমাদের বাহিনী যুদ্ধ করার যোগ্যতা হারিয়েই ফেলেছে। যদি এস্কান্দারিয়া থেকে নতুন বাহিনী আসে, তা হলে তখন হয়ত মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করার ঝুঁকি নেওয়া যাবে।'

পাশে দণ্ডায়মান সেনাপতি ও উপদেষ্টারা চুপচাপ কথাগুলো শুনতে থাকল। কেউ কোনো উত্তর দিল না। তাদের কাছে বলার মতো কিছু ছিলও না।

'আমি এখনও বলছি, মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও'– মুকাওকিস বললেন– 'কিন্তু এখন আমাদের জিযিয়ার শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি ক্রয় করতে হবে। আমি জানি, তোমরা সবাই বাহিনী ও জনতাকে এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলেছ যে, আমি তাদের মুসলমানদের গোলাম বানাতে চাচ্ছি। তোমাদের কল্যাণ এর মাঝে নিহিত যে, এখন গিয়ে নাগরিকদের বলো, তোমরা জিযিয়ার শর্ত মেনে নিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও।'

'মুকাওকিসের এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বা অবাস্তব ছিল না। তার সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের মাথা ঝুঁকিয়ে নেওয়াও অর্থহীন ছিল না। মুকাওকিস একটা অমোঘ পরিণতি সামনে নিয়েই কথাগুলো বলছিলেন। পাঁচিলের উপর থেকে সেই পরিণতি সবাই চামড়ার চোখে প্রত্যক্ষ করছিল। বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী জনসাধারণের অগণিত লাশই যে বিশাল এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে ছিল তা-ই নয় শুধু; এখন মুসলমানরা পরিখা অতিক্রম করে আরও সম্মুখে এগিয়েও এসেছে। ব্যবিলন দুর্গ ও মুসলমানদের মাঝে পরিখা-ই একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল, যেটি গত রাতে মুসলমানরা রোমানদের বিছানো পুলের মাধ্যমে অতিক্রম করে এসেছে। পরিখার অবস্থান দুর্গের প্রাচীর থেকে অনেক দূরে। প্রাচীর ও পরিখার মধ্যখানে সবুজ-শ্যামল ফসলাদির ক্ষেত ও ফলফলাদির বাগান। এগুলো উপর এখন মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুকাওকিস জানতেন, তার সেনাপতিদেরও জানা ছিল, মুসলমানরা যখন কোনো দুর্গের উপর আক্রমণ চালায়, তখন দুর্গটা দখল করেই তবে দম নেয়।

সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। জনতা ও বাহিনীকে বাস্তবতা জানিয়ে দেওয়া হবে, মুসলমানদের সাথে তাদের শর্ত অনুসারে সন্ধি করে নেওয়ার মাঝেই তোমাদের কল্যাণ ও শান্তি নিহিত।

'নাগরিকদের মতে আনার ব্যাপারটা আমরা দেখব'– কায়রাস বললেন– 'আপনি সন্ধির কার্যক্রম শুরু করে দিন।

জনতা ও সৈনিকদের মতে আনা কোনো ব্যাপারই ছিল না। সে-সময় নিজেদের আক্রমণের পরিণতি দেখে তাদের মনোবল মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছিল এবং গোটা নগরীর উপর ত্রাস সঞ্চারিত ছিল। আগে যারা বিশ্বাস করত না, মুসলমানদের মাঝে কোনো একটি রহস্যময় শক্তি আছে, এখন তারাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মুসলমান সাধারণ কোনো মানুষ নয়। গত রাতের আগে তারা দুর্গের অভ্যন্তরে চার দেওয়ালের মাঝে নিজেদের নিরাপদ ভাবত; কিন্তু এখন

এই অভেদ্য-দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অদৃশ্য ফাঁক গলে-গলে বাইরে থেকে আতঙ্করা এসে-এসে কেবলই তাদের খোঁচা মারছে।

মুকাওকিস তার সেনাপতি ও পরামর্শকদের নিজের বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নামে পত্র লেখালেন :

'আমি শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি। আমাকে সাক্ষাতের একটি সুযোগ দিন। আমার দু-চারজন সহকর্মী সঙ্গে থাকবে। আপনিও আপনার দু-চারজন সহকর্মী সাথে রাখবেন। আমরা দুজনে একত্রে বসে সমঝোতার একটা পথ খুঁজে বের করব। বসলে আশা করি, উভয় পক্ষের জন্য কল্যাণকর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে।'

পত্রখানা একজন দূতের হাতে দিয়ে তখনই রওনা করিয়ে দেওয়া হলো।

আমর ইবনে আস (রাযি.) দুর্গের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। এমন সময় মুকাওকিসে বার্তাটি তাঁর হাতে এসে পৌঁছল। তিনি সব কজন সেনাপতিকে ডেকে পাঠলেন এবং আলাদা নিয়ে গিয়ে মুকাওকিসের বার্তাটি তাঁদের পড়ে শোনালেন। তারপর সকলের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলেন।

'পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করে দিন'– সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'আপনার ধারণা-ই একদম সঠিক যে, লোকটা তালে আছে। তার আসলে সময় দরকার।'

আমর ইবনে আস অন্যান্য সালারদের পানে তাকালেন। সবাই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)কে সমর্থন করলেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মত দিলেন, তাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া যাবে না।

'তোমরা কি আমার অপারগতা বুঝতে পারছ না?'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'তোমরা কি জান না, আমীরুল মুমিনীন আমাকে কী-কী আইন দিয়ে রেখেছেন? আমীরুল মুমিনীনের খুবই স্পষ্ট নির্দেশ হলো, মিশরের শাসনকর্তা যদি এই তিনটি শর্তের যেকোনো একটি মেনে নেয়, তা হলে তার সঙ্গে সন্ধি করে নিয়ো। মুকাওকিস আমাদের একটি শর্ত মেনে নিয়েছেন। আমি আমীরুল মুমিনীনের আদেশ অমান্য করতে পারি না।...

'তা ছাড়া এখানে নিজেদের অবস্থাটাও দেখো যে, আমরা কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে আছি। আমাদের চার পাশে পানি। একথা ঠিক যে, আমরা পরিখা পার হয়ে এসেছি। কিন্তু এই দুর্গ জয় করা সহজ হবে না। শস্যক্ষেত, বাগ-বাগিচাও পানিতে ভরপুর। এখনই আমরা অন্য কোনো নগরীর দিকে অগ্রযাত্রা করতে পারব না। পানি শুকানো পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।...

'শক্রুবাহিনীর অবস্থাটা অনুমান করো। সেইসঙ্গে তাদের মনের কথাও পড়তে চেষ্টা করো। রোমান বাহিনীর মনোবল এখন একদম চূর্ণ-বিচূর্ণ। তাদের যারা আমাদের হাতে ধরা পড়েছে, তারা বলেছে, বাহিনীর সাথে নগরীর সাধারণ মানুষও আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। তাতে আমাদের লাভ হয়েছে। নগরীর সাধারণ মানুষের মাঝেও আমাদের মুজাহিদদের ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা তো দুর্গের আশ্রয়ে বসে আছে। কাজেই তাদের মনোবল ফিরে আসার আগে-আগেই সন্ধি-সমঝোতা হয়ে যাওয়া উচিত। তারা যদি জিযিয়া আদায় করে আমাদের বশ্যতা মেনে নেয়, তা হলে তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে যদি তারা নিজেদের সামলে নিতে পারে, তা হলে পরে তারা ঘুরেও যেতে পারে।'

সব কজন সালার সিপাহসালারের সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন। মুকাওকিসকে উত্তর জানিয়ে দেওয়া হলো, দুর্গের বাইরে যেকোনো জায়গায় এসে আপনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

তাদের এই সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল ইতিহাসে তার কোনো উল্লেখ নেই। শুধু এটুকু লেখা আছে যে, মিশরের গভর্নর মুকাওকিস আর মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আমর ইবনে আস-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। মুকাওকিসের সাথে দুজন সেনাপতি আর দুজন উপদেষ্টা ছিলেন। আমর ইবনে আস-এর সঙ্গে ছিলেন তিন অথবা চারজন সালার। আমর ইবনে আস (রাযি.) মুকাওকিসকে বাড়তি কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন, বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দাও।

মুকাওকিস এই চিন্তা মাথায় নিয়েই এসেছিলেন। তার সিদ্ধান্ত ছিল, তিনি মুসলমানদের বশ্যতা মেনে নিয়ে জিযিয়া আদায় করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারিত হলো মাথাপিছু দুই দিনার। তা-ও শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা, নারী ও বৃদ্ধ পুরুষদের জিযিয়ার আওতার বাইরে রাখা হলো।

মুকাওকিস বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন, জিযিয়া এত অল্প ধার্য করা হলো! আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন, মুসলমানরা যখন যেখানে খুশি অবস্থান করবে। প্রয়োজনে কোনো মুসলমান যদি কোনো মিশরির ঘরে থাকতে চায়, তা হলে অন্তত তিন দিন তার মেহমানদারি করতে বাধ্য থাকবে।

এই চুক্তিতে আমর ইবনে আস মুকাওকিসের দাবি ছাড়াই এ ধারাটিও যুক্ত করে নিলেন যে, জমিজমা, ধন-সম্পদ, উপাসনালয়, জলাধার সব কিছুর মালিকানা মিশরিদেরই থাকবে। আমরা শুধু এসবের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করব। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও আমরা কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব না।

মিশরিরা যেখান থেকে খুশি মালপত্র আমদানি করতে পারবে, যেখানে মন চায় রপ্তানিও করতে পারবে।

মুকাওকিস এই চুক্তিপত্রে সিল-স্বাক্ষর করে দিলেন। কিন্তু মৌখিকভাবে বললেন, সম্রাট হেরাক্ল-এর কাছ থেকে এর মঞ্জুরি আনতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় বাহিনী যারা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। তবে মঞ্জুরি শীঘ্রই এসে পড়বে।

এ সাক্ষাৎপর্ব, এই সন্ধিচুক্তি মুসলমানদের জন্য বিরাট এক বিজয় ছিল।

* * *

মুকাওকিস ব্যবিলন দুর্গে ফিরে গিয়েই সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের নিয়ে আলোচনায় বসে পড়লেন। পরামর্শ চাইলেন, সম্রাট হেরাক্লকে সংবাদটা কীভাবে দেওয়া যায়। সাধারণ নিয়ম ছিল, একজন দূত হেরাক্ল-এর কাছে বার্তা নিয়ে যেত। কিন্তু মুকাওকিস বললেন, এ বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, না জানি হেরাক্ল কত কী প্রশ্ন করেন আর দূত উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।

সবাই একবাক্যে পরামর্শ দিল, আপনি নিজেই বাজিন্তিয়া চলে যান এবং হেরাক্লকে আশ্বস্ত করে আসুন। সম্রাটকে কথা দিয়ে আপনিই ভজাতে পারবেন।

মুকাওকিস নীলের পথে এস্কান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। কথা ছিল, এস্কান্দারিয়া থেকে তিনি বাজিন্তিয়া চলে যাবেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কেন জানি মুকাওকিস এস্কান্দারিয়াতেই রয়ে যান এবং ওখানে বসে সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ লিখে একজন দূতের হাতে দিয়ে বলে দিলেন, তুমি বাজিন্তিয়া গিয়ে পত্রখানা হেরাক্ল-এর হাতে পৌঁছিয়ে দাও। সন্ধির মূল কপিটিও তিনি সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

অল্প কদিন পরই দূত বাজিন্তিয়া পৌঁছে গেল। সম্রাট হেরাক্ল মিশরের পরিস্থিতি জানতে এতই উন্মুখ ছিলেন যে, মিশর থেকে দূত এসেছে সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি স্বয়ং দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং দূতের হাত থেকে পত্রখানা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু সন্ধির কথা জানতে পেরে তিনি আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। পরে যখন সন্ধির বিস্তারিত পড়লেন, এবার তিনি রাগে-ক্ষোভে পাগল হয়ে যেতে শুরু করলেন। হেরাক্ল দূতকে ভেতরে ডেকে নিলেন।

'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে পারবে?'– হেরাক্ল ক্ষোভকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন– 'এই সন্ধি কি শুধু ব্যবিলনের জন্য, নাকি অভাগা মুকাওকিস পুরোটা

মিশরকে মুসলমানের ঝুলিতে ভরে দিল? তুমি কি বলতে পার, জিযিয়া উসুল করে মুসলমানরা ফিরে যাবে, নাকি মিশরের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেবে?'

'না মহারাজ!' দূত উত্তর দিল– 'মিশরের গভর্নর আমাকে এমন কিছু বলেননি। শুধু বার্তাটি আপনার সমীপে পৌঁছিয়ে দিতে বলেছেন।'

'কোথায় সে?'– হেরাক্‌ল জিজ্ঞাসা করলেন এবং উত্তরটাও নিজেই দিলেন– 'ব্যবিলনে আছে নিশ্চয়।'

'না মহারাজ!'– দূত বলল– 'তিনি এস্কান্দারিয়ায় আছেন। ওখানে বসে তিনি আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছেন।'

'এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও'– হেরাক্‌ল আদেশ দিলেন– 'পালতোলা জাহাজ প্রস্তুত পাবে। এখনই এস্কান্দারিয়া পৌঁছে যাও এবং মুকাওকিসকে বলো, যেন এই জাহাজে করেই আমার কাছে চলে আসে। যাও।'

* * *

মুকাওকিস বাজিন্তিয়া গেলেন এবং হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথানুসারে মুকাওকিস যে-রাজকীয় মর্যাদা পাওয়ার কথা ছিল, হেরাক্‌ল এবার তাকে সেই মর্যাদা দিলেন না। যত যা কিছুই হোক মুকাওকিস বিশাল একটা রাষ্ট্রের গভর্নর তো বটে। কিন্তু হেরকাল-এর আচরণ এমন ছিল, যেন মুকাওকিস তার ক্রীতদাস। হেরাক্‌ল তাকে প্রথম কথাটি জিজ্ঞাসা করলেন, চুক্তির পর মুসলমানরা মিশর থেকে চলে যাবে, নাকি যাবে না?'

'হাঁ'– মুকাওকিস উদাসভাবে উত্তর দিলেন– 'তারা মিশর ছেড়ে চলে যাবে।'

'আমাকে তুমি ধোঁকা দিচ্ছ'– হেরাক্‌ল ঝাঁজালো কণ্ঠে বললেন– 'চুক্তিতে লিখেছ, মুসলমানরা যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যেখানে খুশি থাকতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে যেকোনো মিশরির ঘরে গিয়ে অতিথিও হতে পারবে। এতেই তো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা যাবে না।'

তারপর হেরাক্‌ল মুকাওকিসকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেললেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন যে, মুকাওকিস দিক-দিশা হারিয়ে ফেললেন। অগত্যা তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন, লুকোচুরি না করে সম্রাটকে সব কথা খুলেই বলে দিই।

'মাননীয় সম্রাট!'– মুকাওকিস বললেন– 'আপনি সেই আরবদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও প্রাণোৎসর্গের প্রত্যয় সম্পর্কে অনবহিত হন। আপনি নিজেও তাদের মোকাবেলা অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তার ফলাফলও দেখেছেন। আশা করি, আপনি আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন যে, মুসলমানদের পরাজিত

করা অন্তত আমাদের এই বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। সন্ধি-সমঝোতার এই চুক্তি ছাড়া আমার সামনে আর কোনো পথ ছিল না। ব্যবিলন দুর্গকে আমি তাদের থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। মুসলমানরা যদি তরবারির জোরে ব্যবিলন নিয়ে যায়, তা হলে সমগ্র মিশর তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।'

'দেখো মুকাওকিস!– হেরাক্‌ল বললেন– 'তুমি আগেও একবার আমাকে শামের পরাজয় এবং সেখান থেকে পিছুহটার জন্য তিরস্কার করেছিলে। এখন তুমি মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছ, তাদের জিযিয়া আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, মিশরে তাদের উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছ। কিন্তু তারপরও আবারও আমাকে সেই শামের পরাজয়ের ভর্ৎসনা দিচ্ছ!'

সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মনের সংশয়-ক্ষোভ দূর করতে, তাকে আশ্বস্ত করতে মুকাওকিস অনেক কথা বললেন। বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আমি আপনার উপর কোনো অপবাদ আরোপ করছি না, আপনাকে আমি কোনো ভর্ৎসনাও করছি না। আমি শুধু একটি বাস্তবতা আপনার সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার কোনো কথা, কোনো যুক্তিই হেরাক্‌ল আমলে নিচ্ছেন না।

'তুমি কি মনে করছ, আমি মিশর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি বলে ওখানকার কোনো খবরই আমার কাছে নেই?'– হেরাক্‌ল বললেন– 'এখানে বসে ওখানকার প্রতিটি মুহূর্তের সংবাদ আমি পেয়ে যাই। শামের পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। মিশরের অবস্থা আরেক রকম। মিশরে আমাদের এক লাখ সৈন্যের বিশাল একটি বাহিনী আছে। এই এক লাখের মধ্যে মাত্র সাড়ে বারো হাজার সৈন্য লড়াই করেছে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এ-বাহিনীটিকে পরিচালনা করা গেলে এই মুষ্টিমেয় মুসলমানকে মিশরের মরুভূমিতে পিষে ফেলা যায় কিংবা নীলনদে ডুবিয়ে মারা যায়। মিশরে আমাদের বাহিনী বড়-বড় দুর্ভেদ্য দুর্গে নিরাপদ অবস্থানে আছে। এই গুটিকতক মুসলমান এই বাহিনীর লোমও তো ছিড়তে পারার কথা ছিল না! আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মুকাওকিস! এমন কোনো একটা রহস্য আছে, যেটি তুমি আমাকে বলছ না!'

মকাওকিসের মাথায়ও রাগ চড়ে গেল। তিনিও সম্রাটকে দু-চারটা গরম কথা শুনিয়ে দিলেন।

'তুমি তোমার সবচেয়ে গুরুতর ও লজ্জাজনক অপরাধটা শুনে নাও'– হেরাক্‌ল বললেন– 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি যে-লোকগুলোকে পাঠিয়েছিলে, তারা আমার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। আমি তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। এবার তুমি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধেও জড়িয়ে পড়েছ। তুমি কাপুরুষতার প্রমাণ দিয়েছ এবং মিশরকে আরবদের জন্য মুক্ত করে দিয়েছ।'

হেরাক্‌ল যখন তাকে বিষ প্রয়োগ করতে আসা মেয়েটি ও তার সঙ্গী পুরুষদ্বয়কে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন তার উপদেষ্টামণ্ডলি ও এক-দুজন সেনাপতিকে ডেকে ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ষড়যন্ত্রের জবাবে আমি মুকাওকিসকে হত্যা করাতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। তার থেকে আমি এর কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিশোধ নেব যে, অপদস্থ করার জন্য তাকে প্রজাদের মাঝে ছেড়ে দেব।

এবার হেরাক্‌ল সেই সুযোগটা পেয়ে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, মুকাওকিসের কোনো কথা, কোনো যুক্তি, কোনো প্রমাণ তিনি শুনবেন না। তিনি জানতেন, রোমের যে-বাহিনীটি মিশরে আছে, মনস্তত্ত্ব ও মনোবলের দিক থেকে তারা যুদ্ধ করার উপযোগী নয়। কিন্তু তিনি মুকাওকিস থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। হেরাক্‌ল তখনই কোতোয়ালকে ডেকে পাঠালেন। আদেশ পেয়ে কোতোয়াল ছুটে এসে হাজির হলেন। হেরাক্‌ল নির্দেশ দিলেন, মুকাওকিসকে হাতকড়া ও বেড়ি পরাও। বাজিন্তিয়া নগরীতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে জনতাকে এক জায়গায় সমবেত করো। ঘোষণা করে দাও, এই লোকটা গাদ্দার। এ মিশরকে মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে তুলে দিয়েছে। তারপর একে রোমসাম্রাজ্য থেকে বের করে দাও। তখন শুধু হাতকড়াটা খুলে দেবে। কিন্তু পায়ের বেড়ি যথাবৎ বহাল থাকবে।

হেরাক্‌ল-এর আদেশ পালিত হলো। মুকাওকিসকে অপদস্থ, অপমানিত করে দেশান্তর করে দেওয়া হলো। হেরাক্‌ল মুকাওকিস থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন।

সম্রাট হেরাক্‌ল সন্ধিচুক্তি রহিত করে দিলেন এবং সেই সংবাদ সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমর ইবনে আস ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সন্ধিচুক্তি রহিত হওয়ার খবর পান। কালবিলম্ব না করেই তিনি ব্যবিলন দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেললেন, যেটি বাহ্যত অসম্ভব ছিল।

পাঁচ

হেরাক্‌ল-এর আদেশ তামিলের জন্য কোতোয়াল যখন মুকাওকিসকে হাতকড়া ও বেড়ি পরানোর জন্য বাইরে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে রানি মরতিনা দৌড়ে সেই কক্ষটায় ঢুকে পড়লেন, যেখানে সম্রাট হেরাক্‌ল আদালত কিংবা দরবার বসান। দেখলেন, হেরাক্‌ল মাথাটা নত করে বিমর্ষ মনে বসে আছেন। মুখের রংটা কেমন যেন ফিকে হয়ে গেছে। সুবেদার ও দুজন দেহরক্ষী মূর্তির রূপ ধারণ করে সতর্ক দাঁড়িয়ে আছে। রানির মাথার ইঙ্গিতে তারা দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

'শাবাশ মহারাজ!'– রানি মরতিনা তার একটা কোমল বাহু হেরাক্‌ল-এর কাঁধের উপর ছেড়ে দিয়ে এবং পরে একটা গালে চুমো খেয়ে বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করি, আপনি আজীবন বেঁচে থাকুন। বিশ্বাসঘাতককে এমনই শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। মৃত্যু তো কোনো শাস্তি-ই নয়। মানুষ দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। এই মুকাওকিস লোকটা মিশরের রাজা বনে ছিল। এবার বেটা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে বেড়াক। মানুষ তার চেহারার লেখা পড়ুক, এই লোকটা গাদ্দার।'

'মরতিনা!'– সম্রাট হেরাক্‌ল একটা শীতল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'ওকে এত কঠোর শাস্তি দিয়ে আমি খুশি হতে পারিনি। রোমের মাটি এর আগে কোনোদিন গাদ্দার জন্ম দেয়নি।'

'খোদার গজব পড়ুক তার উপর'– রানি মরতিনা বললেন– 'সে আপনাকে নয়– রোমসাম্রাজ্যকে ধোঁকা দিয়েছে। আপনি বিষণ্নতা ও আক্ষেপের এই বোঝাটা মাথা থেকে ফেলে দিন । আপনার মুখের রংই তো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি হারকলিউনাসকে মিশর পাঠিয়ে দিই।'

'ওখানে গিয়ে ও কী করবে?'– হেরাক্‌ল ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন– 'আমার পরীক্ষিত সেনাপতিরা পর্যন্ত ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।'

'আমি জানি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন'– মরতিনা বললেন– 'ও লড়তেও পারবে না, লড়াতেও পারবে না। কিন্তু ও সেনাপতিদের উপর চোখ রাখবে, যাতে কেউ প্রকাশ্যে কিংবা পরদার অন্তরালে মুকাওকিসের মতো মুসলমানদের সঙ্গে

গাঁটছড়া বাঁধছে না পারে। আমার পুত্র হারকলিউনাস এ কাজটি চমৎকারভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে।'

'ওখানে হয় আমার যাওয়া উচিত'– হেরাক্ল বললেন– 'নাহয় কুস্তুন্তিনকে পাঠানো দরকার। তুমি জান, কুস্তুন্তিন অভিজ্ঞ সেনাপতি। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এতটাই ভেঙে পড়েছে যে, না আমি যেতে পারছি, না কুস্তুন্তিনকে পাঠাতে পারছি। এখানকার কর্মকাণ্ড কুস্তুন্তিনই চালাচ্ছে। আমি চাচ্ছিও এটি যে, আমার এই ছেলেটা রোমসাম্রাজ্যের বাগডোর হাতে নিক।'

রানি মরতিনার চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি সম্রাটকে বুঝতে দিলেন না। জোর করে তিনি ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

'এ কথাটি আপনি ঠিকই বলেছেন'– মরতিনা কৃত্রিম হাসি হেসে বললেন– 'আপনার স্বাস্থ্যটা খানিক বেশিই খারাপ মনে হচ্ছে! আমি ডাক্তার ডেকে আনছি। মিশরের ভাবনা আপনি মাথা থেকে নামিয়ে দিন। ওখানে থিওডোর আছে, জর্জ আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মরতিনা অসাধারণ এক সুন্দরী রমণী। কিন্তু যতখানি-না সুন্দরী, তার চেয়ে বেশি ধূর্ত ও কুটিল। হেরাক্ল-এর অন্তপুরে একটার-চেয়ে-একটা অধিক রূপসী নারীর উপস্থিতি ছিল। কিন্তু রূপ-সৌন্দর্যকে কাজে লাগানোর, একে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধির যে-যোগ্যতা আল্লাহ মরতিনাকে দিয়েছিলেন, অপর কোনো নারীর মাঝে তা ছিল না। হেরেমের নারীরা ব্যতীত সম্রাট হেরাক্ল-এর নিয়মতান্ত্রিক স্ত্রী কতজন ছিল কোনো ইতিহাসই তার সংখ্যা জানাতে পারেনি। তাদের একজন ছিলেন মরতিনা, যার মর্যাদা ছিল সূর্যের মতো আর বাদবাকিরা চাঁদ-সেতারা। সূর্য যখন উদিত হতো, চাঁদ-তারারা তখন আকাশের সীমানা থেকে হারিয়ে যেত।

হেরাক্ল-এর ভালো করেই জানা ছিল, মরতিনা তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছেন এবং এই কবল থেকে তাকে বের হতে হবে। এর জন্য তিনি অনবরত চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু প্রতিটি প্রচেষ্টা-ই তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল। এমনকি হেরাক্ল-এর অন্তরে মরতিনার ভয়ও ঢুকে গিয়েছিল। মানে সম্রাট হেরাক্ল রানি মরতিনাকে ভয় পেতেও শুরু করেছিলেন। এক স্পেনিশ ঐতিহাসিক ফার্ডানেন্ড এমনও লিখেছেন যে, মরতিনা হেরাক্ল-এর উপর জাদুর ক্রিয়া সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

হারকলিউনাস মরতিনার পুত্র। তিনি পুত্রকে হেরাক্ল-এর স্থলাভিষিক্ত বানানোর চেষ্টা করছিলেন। কুস্তুন্তিন হেরাক্ল-এর আরেক স্ত্রীর গর্ভজাত। বয়সে

হারকলিউনাস থেকে অনেকখানি বড়। হেরাক্ল কুস্তুন্তিনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাচ্ছিলেন। এবার তিনি লক্ষ্য করলেন, রানি মরতিনা তার এই সিদ্ধান্তের জন্য তাকে বাহবা দিচ্ছেন যে, তিনি মুকাওকিসকে হাতকড়া ও পদবেড়ি পরিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। হেরাক্ল-এর স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও তার মাঝে বেশ অস্থিরতা বিরাজ করছে। কিন্তু হেরাক্ল ভালো করেই জানতেন, এ স্রেফ লোকদেখানো সমবেদনা। মরতিনা বলেছিলেন, আপনি আমার পুত্রকে মিশর পাঠিয়ে দিন। উত্তরে হেরাক্ল বলেছিলেন, আমি কুস্তুন্তিনকে পাঠাতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমার নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় আনলে সাহস করতে পারি না। হেরাক্ল বুঝে ফেলেছিলেন, মুকাওকিসকে দেশান্তর করে দেওয়ার ফলে যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে মরতিনা নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে। কিন্তু হেরাক্ল কুস্তুন্তিনের নাম উল্লেখ করে মরতিনার মুখটা কালো করে দিয়েছেন।

মরতিনা ডাক্তার আনতে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

হেরাক্ল-এর স্বাস্থ্য ক্রমে এবং অতি দ্রুত পড়ে যেতে লাগল। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন বটে; কিন্তু এমন নয় যে, বার্ধক্য তাকে এতখানি অক্ষম করে দেবে। বার্ধক্য শরীরকে দুর্বল করে দেয় ঠিক; কিন্তু মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতার সুবাদে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা আরও প্রখর হয়ে ওঠে। মানুষ সুবিজ্ঞ হয়ে যায়। কিন্তু হেরকাল মানসকিভাবেও দুর্বল হয়ে গেছেন। এটাও বোধহয় একটা কারণ যে, তিনি রানি মরতিনা ও তার পুত্র হারকলিউনাসকে ভয় পেতে শুরু করেছেন।

সমস্ত ঐতিহাসিক সম্রাট হেরাক্ল-এর কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তাদের মাঝে মুসলমান ঐতিহাসিকও আছেন। তারা লিখেছেন, হেরাক্ল সূর্য হয়ে রোমের দিগন্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং রোমসাম্রাজ্যকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি গোটা শাম রাজ্যটিকে নিজের সাম্রাজ্যে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। অবশেষে তার চোখ আরবের উপর নিবদ্ধ ছিল। এই সেই হেরাক্ল, যিনি ইরানের কেসরার ভয়ানক সামরিক শক্তিকে মিশর থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন এবং পরে শাম থেকেও ইরানিদের বিতাড়িত করে তাদের সাম্রাজ্যকে ইরাক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মর্যাদা ও রাজকীয়তার ভাস্কর হয়ে চমকাচ্ছিলেন যে হেরাক্ল, সেই মহা প্রতাপশালী রোমসম্রাটের দাপট এখন মিইয়ে যেতে শুরু করল। ইরানসম্রাটের দেড়-পৌনে দুলাখ সৈন্যের বাহিনীকে পা গুটিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন যে

হেরাক্‌ল, তিনি এখন হাজারকয়েক মুসলমানের ক্ষুদ্র একটি বাহিনীর সামনে অসহায় ও অক্ষম হয়ে পড়েছেন। এই অল্প কজন মুজাহিদ তাকে শাম থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এখন মিশরও তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

হেরাক্‌ল বাজিন্তিয়ায় আক্ষেপ ও হতাশার একটা কাঠপুত্তুলি হয়ে বসে আছেন।

সাধারণত মানুষ এটাই মনে করে থাকবে যে, রোমসাম্রাজ্যের পতনের বেদনা-ই তাকে খেয়ে ফেলেছে। মিশরের কিবতি খ্রিস্টানরা বলাবলি করছে, হেরাক্‌ল যেরূপ নির্মম ও হিংস্র উপায়ে কিবতিদের হত্যা করেছেন, তার শাস্তি তিনি দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞজনেরা বলেন, উত্থান ও পতন মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সূর্য যেমন এক দিগন্ত থেকে উদিত হয়ে আরেক দিগন্তে অস্ত যায় আর পেছনে রেখে যায় একটা অন্ধকার রাত, এ-ও তেমনি। কিন্তু ইতিহাসের জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখুন, ঐতিহাসিকরা শোনাচ্ছেন ভিন্ন কাহিনী।

রানি মরতিনা ডাক্তার আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডাক্তার সব সময় শাহী নির্দেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকেন। রানির আদেশ পৌঁছতেই তিনি ছুটে এলেন। কিন্তু মরতিনা তাকে সরাসরি হেরাক্‌ল-এর কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরবর্তে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন।

এই ডাক্তার এবং আরও যারা প্রাসাদে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, সবাই রাজপরিবারের ভৃত্য হয়ে দায়িত্ব পালন করত। তারা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকত। রাজা, রানি, কোনো রাজকুমার কিংবা রাজকুমারীর ডাক পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লেজ তুলে ছুটে যেত এবং তাদের আদেশ পালন করে গর্ব বোধ করত। এই ডাক্তারের ধরনও ঠিক একই রকম। কিন্তু যেইমাত্র তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন, অমনি ধারা একদম পালটে গেল। মনে হচ্ছিল, এই লোকটা রানি মরতিনার ঘনিষ্টতম কোনো আত্মীয় কিংবা অকৃত্রিম কোনো বন্ধু।

'অবস্থা কী?'– রানি মরতিনার বলা ছাড়াই বসে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন– 'দেমাগ কি ঠিকানায় এসেছে, নাকি এখনও আসেনি?'

'না'– মরতিনা উত্তর দিলেন– 'যেমনটা তেমনই আছে। এই একটু আগে আমি একটা সুযোগ পেয়ে বললাম, হারকলিউনাসকে মিশর পাঠিয়ে দিন। ওখানে সে আপনার সেনাপতিদের গতিবিধির উপর চোখ রাখবে; গাদ্দারির আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দিয়ে দিলেন, হয় তিনি নিজে যাবেন, নাহয় কুস্তুন্তিনকে পাঠাবেন। বলে দিলেন, হারকলিউনাস নাকি এ কাজের যোগ্য নয়।'

'তা হলে আমার জন্য আদেশ কী?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও'– মরতিনা বললেন– 'এখন এই একটি-ই প্রতিকার অবশিষ্ট আছে। আমি কেমন যেন দেখতে পাচ্ছি, লোকটা তার মরার আগেই কুস্তুন্তিনকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবে। আজ দেখে এসে আমাকে জানাও, আর কত দিন বাঁচবে। আমার আর ত্বর সইছে না।'

'সম্মানিতা রানি!'– ডাক্তার বললেন– 'একটি কথা আমি শুরু থেকেই বলে আসছি। আজও সেই কথাটি-ই বলব। আপনার লক্ষ্য আমি দু-চারটা মুহূর্তেই পূর্ণ করে দিতে পারি। কিন্তু তা করতে গেলে আমি ধরা পড়ে যাব। আমার সঙ্গে আপনিও পাকড়াও হবেন। কাজটা ধীরে-ধীরে হতে দিন। আপনি কি তার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না? কাজ হচ্ছে; কিন্তু কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ভালো-ভালো জ্ঞানী লোকদের মুখে শুনেছি, একের-পর-এক পরাজয় হেরাক্‌লকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে। কোথাও থেকে অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে আসুন। তিনিও ধরতে পারবেন না, হেরাক্‌লকে পরাজয়ের গ্লানি নয়– অন্য কিছুতে খাচ্ছে। প্রত্যেক ডাক্তারই বলবেন, ক্ষমতা হারানোর বেদনা-ই সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলছে।

'ওঠো; দেরি হয়ে যাচ্ছে'– রানি মরতিনা বললেন– 'আবার বলে না বসেন, ডাক্তার আসতে বিলম্ব হয়ে গেল কেন?'

ডাক্তার মধ্যবয়সী পুরুষ। মুখের গঠন, দৈহিক আকার ও ভাবভঙ্গিতে একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে হচ্ছে। মরতিনা তার তিন-চার বছরের বড় হবে। কিন্তু চোখের দেখায় মনে হয় ছোট। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। মরতিনার একটা বাহু ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে উভয় বাহুর বন্ধনে আটকে ফেললেন। মরতিনা একটুও প্রতিবাদ না করে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিলেন। মুখে শুধু বললেন, কাজটা করে ফেলো।

আগে মরতিনা হেরাক্‌ল-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। তার পেছনে-পেছনে ডাক্তারও ঢুকলেন। ডাক্তার সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সামনে গিয়ে প্রথমে মাথাটা নত করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান বাহুটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে রোমান কায়দায় হেরাক্‌লকে সালাম করলেন। তারপর দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং হেরাক্‌ল-এর শিরায় হাত রাখলেন। শিরা ছেড়ে দিয়ে নিজের উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দু-চোখের পাতাদুটো উপরে তুললেন এবং গভীর চোখে নিরীক্ষা করে হেরাক্‌ল-এর চোখের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেন। এভাবে রোগী দেখে সরে এসে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

'মহারাজ!'– ডাক্তার বললেন– 'আপনি বেঁচে আছেন বলেই রোমসাম্রাজ্য টিকে আছে। জয়-পরাজয় মানুষের নিত্যসঙ্গী। আপনি আমার চেয়ে হাজারো গুণ বেশি জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। আমি আপনাকে কী বোঝাব! কিন্তু যদি এভাবে হাত-পা ছেড়ে দেন, তা হলে পরাজয় আপনার ভাগ্যলিপি হয়ে যাবে। আপনি মনে সাহস ফিরিয়ে আনুন; তা হলে এই সিংহাসনে বসে-বসেই এই সাময়িক পরাজয়কে বিজয়ে বদলে দিতে পারবেন। আমি জ্যোতিষীও বটে। আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যতটুকু অঞ্চল রোমসাম্রাজ্য থেকে ছুটে গেছে, তার চেয়ে বেশি এলাকা আপনার হাতে ফিরে আসবে। সম্মানিতা রানি আপনার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে নিরালায় বসে কাঁদেন। আমি তাকেও নিশ্চয়তা দিচ্ছি, রোমসাম্রাজ্য আর খসবে না। এখন থেকে তার পুনঃসম্প্রসারণ শুরু হয়ে যাবে।'

'কথা কম বলো'– মরতিনা খানিক রাগের সাথে ডাক্তারকে বললেন– 'তুমি যদি এর চিকিৎসা করতে না পার, তা হলে পরিষ্কার করে বলে দাও। এর জন্য আমরা তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। দেখো, মহারাজের অবস্থা কী হয়ে গেছে! ইনি চলে গেলে আমিও থাকব না। আজ আমি তোমার কাছে স্পষ্ট জবাব চাই।'

'আমি বিচলিত হওয়ার মতো মানুষ ছিলাম না'– হেরাক্‌ল বললেন– 'যদি আমি এতটা দুর্বল স্বভাবের মানুষ হতাম, তা হলে রোমসম্রাটের সিংহাসন উলটে দিয়ে রোমসাম্রাজ্যকে এতখানি সম্প্রসারিত করতে পারতাম না। কিন্তু একটা দুঃখ আমার মনের উপর রেখাপাত করে বসেছে। ব্যথাটা হলো, রোমানদের মাঝেও গাদ্দার আছে। যাহোক, তারপরও তুমি আমাকে ভালো করে দেখো; আমি অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছি কিনা।'

'যা দেখার আমি দেখে ফেলেছি সম্রাট!'– ডাক্তার বললেন– 'আজ আমি অষুধ পালটে দিচ্ছি।'

'আমি তোমাকে পুরোপুরি সুযোগ দিচ্ছি'– হেরাক্‌ল বললেন– 'যাও; এক্ষুনি অষুধ পাঠিয়ে দাও।'

ডাক্তার তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্রাট হেরাক্‌লকে রোমীয় রীতিতে কুর্নিশ জানিয়ে উলটোপায়ে দরজা পর্যন্ত গেলেন। তারপর মোড় ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অষুধ আনতে আমি ডাক্তারের সঙ্গে একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি বলে রানি মরতিনাও কক্ষ ত্যাগ করলেন।

মরতিনা ডাক্তারকে পুনরায় নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং ব্যাকুলতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী মনে হলো?'

'কাজ দ্রুত হয়ে যাবে'– ডাক্তার মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন– 'সময় আর বেশি লাগবে না। আমার ধারণা, আর মাত্র দেড়-দুমাস সময়ের প্রয়োজন হবে। তারপরই আপনার ছেলে হারকলিউনাস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত যাবে।'

'আমি তখন তোমাকে এত পুরস্কার দেব যে, তোমার চৌদ্দ পুরুষও আমাকে ভুলতে পারবে না'– মরতিনা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'এখন আর আমি তোমাকে বেশি সময় আটকে রাখব না। অষুধ তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও আর বলো কী চাই।'

'আপনার কাজ সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে'– ডাক্তার বললেন– 'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, আমি কী চাই।'...

ডাক্তারের কথা শেষ না হতেই মরতিনা কক্ষান্তরে চলে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন তার হাতে এক টুকরা সোনা, যাতে সোনার ইট বললে ভুল বলা হয় না; আজকের হিসাবে যার ওজন কমপক্ষে ত্রিশ ভরি।

এটিই প্রথম পুরস্কার নয়। রানি মরতিনা এই ডাক্তারকে এমন উপঢৌকন আরও অনেকবার দিয়েছেন।

এবার তো ডাক্তারের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি উঠলেন না। ওষ্ঠাধরে স্মিত হাসি ফুটিয়ে রানির মুখপানে এমন চোখে তাকালেন, যেন তার মর্ম রানির জানা।

'মুখে বলো আর কী চাই?' মরতিনা স্পষ্ট বুঝতে চাইলেন।

'আজকের রাতটাকে খানিক রঙিন বানাতে মন চাচ্ছে'– ডাক্তার বললেন– 'একটা আধফোটা কলি যদি সন্ধ্যার পর পাঠিয়ে দেন, তা হালে রানির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

'যাবে'– মরতিনা মিটিমিটি অর্থবহ হাসি হেসে বললেন– 'এমন একটা কলি পাঠাব যে, ওকে আজীবন কাছে রাখতে মন চাবে। কিন্তু ভোরের আলো ফোটার আগে-আগেই ফিরিয়ে দিতে হবে।'

মরতিনা একব্যক্তিকে ডেকে বললেন, ডাক্তারের সঙ্গে যাও এবং অষুধ নিয়ে আসো।

স্পেনিশ ঐতিহাসিক ফার্ডানেন্ড লিখেছেন, এটি এমন একটি রহস্য ছিল, যেটি রানি মরতিনা ও ডাক্তার ছাড়া আর কারও জানা ছিল না। কারও মনে এমন

কোনো সন্দেহও জাগেনি যে, সম্রাট হেরাক্লকে ঔষধের সঙ্গে এমন একটা বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা কিনা তাকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলছে। সম্রাট হেরাক্ল অতি দ্রুততার সঙ্গে শুকিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিলেন।

রানি মরতিনা সম্রাট হেরাক্লকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেশ আগে তখন, যখন তিনি পুরোপুরি বুঝে ফেলেছিলেন, হেরাক্ল তার অপর পুত্র কুস্তুন্তিনকেই নিজের উত্তরসূরী বানাবেন। মরতিনার গর্ভজাত পুত্র হারকলিউনাসের সঙ্গে তো হেরাক্ল কোনোদিন কথা পর্যন্ত বলেননি।

* * *

সেরাতেই ডাক্তারের সেই খাস কামরায় একটা তরুণী মেয়ে প্রবেশ করল, যেখানে ডাক্তারের পরিবারের কোনো সদস্যেরও প্রবেশাধিকার ছিল না। কখনও কেউ ঢুকে পড়তও যদি আর ডাক্তারকে কোনো ভিন নারীর সাথে মদ পান করতে কিংবা রং-তামাশা করতে দেখেও ফেলত, তাতে কোনো সমস্যার কিছু ছিল না। এই আনন্দ-বিলাস, এই রঙিন তামাশা রোমান সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সেই সমাজে এসব কোনো পাপ ছিল না। এই ডাক্তারকে তো তার পরিবারের কোনো সদস্য এ কারণেও বাধা দিতে পারত না যে, তিনি রানি মরতিনার সুদৃষ্টিধন্য মানুষ। রানিকে খুশি করে তার কাছ থেকে মহামূল্যবান পুরস্কার ও উপঢৌকন এনে-এনে পরিবারের লোকদের দিচ্ছেন। কাজেই এমন মানুষটা কী করছেন, তার খাস কামরায় কে আসছে, রাত কাটাচ্ছে এসব দেখার গরজ কারুর থাকার দরকার নেই। এই মেয়েটাও পুরস্কারস্বরূপই ডাক্তারের কাছে এসেছে এবং এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত পারিতোষিক।

এমন রূপসী ও চিত্তহারী পুরস্কার মরতিনা ডাক্তারকে আগেও পাঠিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি রানিকে বলে এসেছেন, তার একটা আধফোটা কলি চাই। ডাক্তার যখন মেয়েটার পানে চোখ তুলে তাকালেন, তখন বেশ কিছু সময় দেখতেই থাকলেন। মেয়েটা সত্যিকার অর্থেই একটা আধফোটা কলি। হেরাক্ল-এর হেরেমের মেয়ে। এমন মেয়েরা সাধারণত মদ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে। রাজদরবারের আসরগুলোতে এরা অর্ধনগ্ন পোশাকে মদ পরিবেশন করে। এর জন্য এদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মানে এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা সাকি। আজ রাত মরতিনা ডাক্তারকে খুশি করতে এমনই একটা মেয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অথচ, এদের এভাবে ব্যবহার করার কোনো নিয়ম নেই।

ডাক্তার মরতিনাকে বলেছিলেন, দেড়-দুমাস পর তার পুত্র হারকলিউনাসকে হেরাক্ল-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যাবে। শুনে মরতিনা খুবই খুশি

হয়েছিলেন। কথা একেবারে পরিষ্কার ছিল। হেরাক্‌ল-এর জীবনের আর মাত্র দেড়-দুমাস সময় বাকি।

'তোমার নাম?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

'মেরিয়াকস'– মেয়েটা উত্তর দিল– 'আমাকে মেরিও ডাকতে পারেন, আবার মেরিয়াও।'

শাহি হেরেমে অতিশয় রূপসী ও সদ্য তরুণী মেয়েরা ছিল। তাদের থেকে দু-চারজন ডাক্তারের কাছে এসেছিলও। কিন্তু এই মেয়েটার মতো সুন্দরী তিনি কাউকে দেখেননি। নেশার মতো কী একটা বস্তু ডাক্তারকে আচ্ছন্ন করে তুলতে লাগল। বুদ্ধি-বিবেক যেন তার সব এই মেয়েটার রূপের বানে ভেসে যেতে শুরু করল। তিনি মাতাল-মাতাল কণ্ঠে বললেন, তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটা শরীরই এমন নেশাকর যে, এর উপস্থিতিতে রোমের সর্বোত্তম মদও অকার্যকর মনে হচ্ছে।

'মদ তো আমি আপনাকে নিজের হাতে পান করাব'– মেরিয়া আবেগময় কণ্ঠে বলল– 'আমাকে যে-ই পান করে, সে-ই মেঘের শাদা-শাদা টুকরোয় উড়তে শুরু করে।'

রানি মরতিনা এই মেয়েটাকে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে বিশেষভাবে বলেছিলেন, আমি তোমাকে পাঠাতাম না। কিন্তু ডাক্তারকে খুশি করা আমার বড় বেশি প্রয়োজন। কাজেই তুমি যাও এবং লোকটাকে মুঠোও নিয়ে নাও। মরতিনা তার কারণ বলেছিলেন, রোমসম্রাট হেরাক্‌ল অসুস্থ আর এই ডাক্তার তার চিকিৎসা করছেন। মেয়েটা বুঝে ফেলল, এই ডাক্তারকে আকাশে তুলে দিতে হবে।

ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করেই মেরিয়া ধরে ফেলল, এই ডাক্তারটা মানসিকভাবে দুর্বল ও ঢিলা প্রকৃতির মানুষ। মেরিয়া প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ডাক্তারের সঙ্গে এমন-এমন আচরণ ও কথাবার্তা শুরু করল যে, ডাক্তার বোকার মতো কাজ করতে লাগলেন। মেরিয়া তাকে মদ পান করাতে শুরু করল এবং পান করিয়ে চলল। তারপর মনে হলো, খেলাটা ডাক্তার মেরিনার সঙ্গে খেলছেন না– মেরিনাই বরং ডাক্তারকে নিয়ে খেলা করছে।

ডাক্তার খাপছাড়া ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা শুরু করলেন। তিনি রানি মরতিনার প্রসঙ্গ তুলে দিলেন। এমনও পর্যন্ত বললেন, আমি চাইলে রানিকে ডেকে এনে সারা রাত আমার এই কক্ষে রাখতে পারি।

'রানি মরতিনা যখন আমার কাছে থাকেন, তখন তিনি রানি থাকেন না– শুধু মরতিনা হয়ে যান'– ডাক্তার মেরিয়ার উপর নিজের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে এবং

মদের ক্রিয়ায় বললেন– 'আজ তিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এই হেরেমটা সম্রাট হেরাক্ল-এর বটে; কিন্তু আসলে এটি আমার অন্তঃপুর।'

মেরিয়ার উপর ডাক্তারের প্রভাব বসেছিল, নাকি বসেনি, সেই প্রসঙ্গ আলাদা। কিন্তু মেরিয়ার জন্য এটি একটি নতুন তথ্য যে, রানি মরতিনা ডাক্তারের কাছে আসেন। ব্যাপারটা মেরিয়াকে ভাবিয়ে তুলল। মেরিয়ার মনে সন্দেহ জাগল, হয়তবা ডাক্তার নিজের কৃতিত্ব ফলাতে মিথ্যা বলছেন। মেরিয়ার মধ্যকার গোয়েন্দাবৃত্তিটা জেগে উঠল এবং আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগল।

এবার মেরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এমন আবেগময় ও উত্তেজনাকর হয়ে উঠল যে, ডাক্তারের বিবেক-বুদ্ধি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও মেরিয়ার কব্জায় চলে গেল।

সিংহাসনের স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে রাজমহলে যে-দ্বন্দ্ব চলছিল, তার কিছু হাওয়া-বাতাস বাইরের কিছু লোকেরও কানেও ঢুকে গিয়েছিল। প্রাসাদের ভেতরের তো নিম্ন-থেকে-নিম্নতম কর্মচারীরও জানা ছিল, রানি মরতিনা তার পুত্র হারকলিউনাসকে হেরাক্ল-এর স্থলাভিষিক্ত বানানোর চেষ্টায় লেগে আছেন; কিন্তু হেরাক্ল তাতে রাজী নন; তার স্থলে তিনি বড় পুত্র কুস্তুন্তিনকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছেন। মেরিয়ার তো এসব চক্কর পুরোপুরিই জানা। সে দেখল, রানি মরতিনা প্রসঙ্গে ডাক্তার অকৃত্রিম বন্ধুত্বসুলভ কথা বলছেন। এবার সে ভাবল, আমাকে জানতে হবে, সিংহাসনের ভাবী অধিকারী কে হবে– হারকলিউনাস, নাকি কুস্তুন্তিন।

মেরিয়া বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে এল।

'আপনার তো নিশ্চয় জানা থাকবে'– মেরিয়া বলল– 'আপনি এত দামি মানুষ! এত মর্যাদা আপনার! রানি মরতিনার সঙ্গে আপনার এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক! এসব আমার আগে জানা ছিল না। আচ্ছা, সম্রাট হেরাক্ল-এর স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছে? আপনি কী জানেন?'

'আমি যাকে চাইব'– ডাক্তার কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন– 'মরতিনা ছেলে ব্যতীত এই সিংহাসনে আর কেউ বসতে পারে না।'

'মহারাজের সিদ্ধান্ত যদি অন্য কিছু হয়, তা হলে?'

'মহারাজ! সম্রাট হেরাক্ল!'– ডাক্তার তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন– 'এই শাহেনশাহর জীবন আমার মুঠে। চাইলে কালই আমি সেটি তার দেহ থেকে বের

করে ফেলতে পারব। কিন্তু তা আমি করব না। কারণ, যে-কাজ ধীরে-ধীরে হয়, তা বেশি ভালো হয়।'

এবার মেরিয়া তার বিদ্যা ও গোয়েন্দাবৃত্তির কৌশলের প্রয়োগ শুরু করে দিল। ডাক্তারের উপর নিজের হৃদয়কাড়া রূপ, রেশমকোমল চুল আর মোলায়েম গালের জাদু আচ্ছন্ন করে দিল। সেইসঙ্গে মদের পেয়ালাটা তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে লাগাল। তারপর স্থূলাভিষিক্তির প্রসঙ্গটা তুলে দিল।

ডাক্তার যা বললেন, তাতে মেরিয়ার মনে সংশয় জাগল, যে-ব্যাধিটা সম্রাট হেরাক্লকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে, তাতে রানি মরতিনা ও এই ডাক্তারের হাত আছে। ডাক্তারের উপর এক তো মদের; তার উপর এই তরুণী মেয়েটার রূপের মাদকতা ছেয়ে আছে। এখন তিনি নিজের অধিকারের পুরোপুরি বাইরে অবস্থান করছেন। এমন স্পর্শকাতর কথাগুলো তিনি বলছেন সম্পূর্ণ অবচেতনভাবে। অবশ্য তার এটুকু বোধ আছে যে, হেরেমের একটা মেয়ের মাঝে এমন সাহস নেই যে, একথাগুলো সে অন্য কারও কানে ঢালবে।

রাত কেটে গেল। মেরিয়া যখন চোখ খুলল, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। প্রকৃতি তখনও আবছা অন্ধকারে নিমজ্জিত। ডাক্তার বিছানার উপর লাশের মতো পড়ে গাধার স্বরে নাক ডাকছে। মেরিয়া শয্যা ছেড়ে সন্তর্পণে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং আলতোভাবে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে গেল। তার ডিউটি পুরো হয়ে গেছে।

মেরিয়া হেরেমে পৌঁছে গেল।

* * *

পরবর্তী রাত। গত রাতে মেরিয়া হেরেমে ছিল না। আজও অনুপস্থিত। গত রাতে উধাও হয়েছিল রানি মরতিনার আদেশে। আজ হারিয়ে গেছে নিজের ইচ্ছায় চুপিসারে।

রাজমহলের সঙ্গেই মনোরম ও মনকাড়া একটা বাগান। তারই এমন একটা জায়গায় মেরিয়া বসা, যেখানে তাকে দেখবার কারুর জো নেই। একা নয়-পাশে উপবিষ্ট এক রাজকুমার, নাম যার কনস্তানিস।

কনস্তানিস হেরাক্ল-এর নাতি। মানে কুস্তুন্তিনের ছেলে। হেরাক্ল কুস্তুন্তিনকে বেশি আদর করতেন বলে তার পুত্র কনস্তানিসের প্রতিও ছিল তার অপার মমতা। কুস্তুন্তিন এখন মধ্য বয়সের পৌঢ় আর তার এই ছেলের বয়স তেইশ-চব্বিশ।

তরুণ যুবক কনস্তানিস সেই রাজকুমারদের একজন, যারা নিজেদের লজ্জা ও নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করত, নিজের পিতার হেরেমকে নিজের জন্য বৈধ ভাবত এবং পিতার পছন্দের মেয়েদের সঙ্গে রং-তামাশা করত। হেরেমের মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করতে গিয়ে মেরিয়ার উপর কনস্তানিসের চোখ পড়ে গেল এবং তার প্রেমে আটকে গেল।

রাজার হেরেমে তার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমুখের যাওয়ার অনুমতি ছিল না। কিন্তু তারা হেরেমের চাকরানী ও নর্তকীদের হাত করে রাখত। এরাও তাদের থেকে উপহার-উপঢৌকন লাভ করে ধন্য হতো। একজন রাজকুমার কোনো এক চাকরানীর মুঠোয় কিছু ধরিয়ে দিয়ে বলত, রাতে অমুক মেয়েটাকে বাইরে নিয়ে এসো। চাকরানীও স্বার্থের লোভে ঝুঁকিটা বরণ করে নিত। কনস্তানিসও এমন দু-একজন নারীকে হাত করে রেখেছিল। ওরা তার ফরমায়েশ ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করত।

এবার কনস্তানিস মেরিয়াকে এক আসরে দেখে এক চাকরানীকে বলল, এই মেয়েটাকে যেভাবে হোক আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও। চাকরানী এক রাতে মেরিয়াকে বাইরে নিয়ে কনস্তানিসের হাতে তুলে দিল।

কোনো রাজকুমারের ফরমায়েশে লুকিয়ে হেরেম থেকে বের হওয়া মেরিয়ার জীবনে এটিই প্রথম ঘটনা। মেরিয়া হেরেমের একটি মহামূল্যবান সম্পদ। সেজন্য কোনো চাকরানী-ই তাকে বাইরে আনতে সাহস করত না। মেরিয়ার জানা ছিল, পরদার অন্তরালে এই কারবারও চলে। কিন্তু তার মনে কখনও এমন বাসনা জাগেইনি। আজ এক প্রবীণা ও চতুর চাকরানী তাকে বলল, কুস্তুন্তিনের পুত্র কনস্তানিস তোমার সাক্ষাৎ কামনা করছে। মেরিয়া প্রস্তাবটা এড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু চাকরানী বলল, এটা তোমার জন্য ভুল হবে। এর জন্য তোমাকে অনেক মাশুল দিতে হবে। কারণ, ছেলেটা খুবই প্রতিশোধপরায়ণ। ওর মনস্কামনা পূরণ না করলে ও তোমার প্রভূত ক্ষতি করে ফেলতে পারে। অযথা এমন বিপদ টেনে আনার দরকারটা কী। অপর দিকে প্রস্তাবে হাঁ বললে ও তোমাকে লাল করে দেবে– যা চাইবে, তা-ই পাবে।

মেরিয়া রাজি হয়ে গেল। রাতে চাকরানী কোনো এক পথে তাকে বাইরে নিয়ে কনস্তানিসের হাতে তুলে দিল।

দুজনের এই প্রথম সাক্ষাৎটা হয়েছিল ছয়-সাত মাস আগে। মেরিয়া কনস্ত ানিসকে বলেছিল, এভাবে বাইরে আসতে আমার ভয় লাগে আর এসব গোপন কায়-কারবার আমার একদম অপছন্দ। সে আরও তথ্য দিল, সম্রাট হেরাক্ল মাত্র দুরাত আমাকে তার কাছে রেখেছেন। তারপর আমাকে রাজদরবারের

আসর-অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথিদের মদ পরিবেশনের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো এবং তার জন্য আমাকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হলো ।

মেরিয়া নিজেকে পুরুষদের হাত থেকে রক্ষা করে চলতে চাইত ।

'তোমার কথাগুলো শুনে আমি অনেক খুশি হলাম মেরিয়া!'– কনস্তানিস বলল– 'আমি তোমাকে সেজন্য ডাকিনি, যা তুমি মনে করছ। আমার অন্তরে তোমার ভালবাসা তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাকে আমি বাধ্য করতে পারি না যে, তুমিও নিজের মধ্যে আমার ভালবাসা সৃষ্টি করে নাও। প্রেম-ভালবাসা জোর করে তৈরি করা যায় না। এর বিনিময় দেওয়াও সম্ভব নয় ।'

'আমি আমার মনের কথা বলছি'– মেরিয়া বলল– 'আর শুধু এজন্য বলছি যে, তোমাকে আমি সেই রাজপুত্রদের মতো একজন রাজপুত্র মনে করি, যারা হেরেমে এক ধরনের দস্যুতা করে চলছে। তুমি ভালবাসার কথা বলছ। ভালবাসা কার না প্রিয়! আমাকে আমার পিতামাতা থেকে কেড়ে কিংবা জোরপূর্বক খরিদ করে এনে এখানে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। আমি তো ভালবাসার পিপাসায় ছটফট করছি। তুমি যদি আমাকে তোমার যৌনবাসনা নিবারণের জন্য ডেকে থাক, তা হলে আমি তোমার জন্য হাড়-মাংসের তৈরী একটা প্রতিমা, যে কিনা তোমার সামনে উপস্থিত। আর যদি সেই প্রেমের কথা বলে থাক, শারীরিক কামনা-বাসনার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, তা হলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখো। আমি তোমার ভালবাসার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেব ।

এখান থেকেই দুজনের প্রেমের সূচনা। তার দীর্ঘ সময় শাহি বাগানের একটা কোনায় বসে থাকল। মেরিয়া যখন উঠে চলে যেতে লাগল, তখন কনস্তানিস তাকে কিছু অর্থ বিনিময় দিতে তার পানে হাত বাড়াল। দেখে মেরিয়া পুনরায় কনস্তানিসের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল। ক্ষণকালের মধ্যেই কনস্তানিস দেখল, তার দুচোখের পাতা অশ্রুতে টলমল করছে। কনস্তানিস তাকে দুবাহুতে নিয়ে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিল ।

'ভালবাসাকে এভাবে অপমান করো না'– মেরিয়া অশ্রুভেজা চোখদুটো মুছে সমাহিত কণ্ঠে বলল– 'যখনই তোমার ইশারা পাব, আমি এসে পড়ব ।'

'আর আমি একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দেব'– কনস্তানিস আবেগে আপ্লুত হয়ে উদ্দীপ্ত গলায় বলল– 'আমি হেরেমের সকল নারীকে বলে দেব, কোনো রাজকুমার যদি তোমার ফরমায়েশ করে, তা হলে যেন পরিষ্কার ভাষায় না করে

দেয়। অবশ্য যদি তোমাকে সম্রাট হেরাক্‌ল কিংবা রানি মরতিনার আদেশে কারুর হাতে তুলে দেওয়া হয়, তখন আর আমার কিছু করার থাকবে না।'

কনস্তানিস পরদিনই এই আয়োজনটা করে ফেলল। হেরেমের সমস্ত নারীকে কঠিন পরিণতির হুমকি দিয়ে বলে দিল, মেরিয়াকে যদি এই গোপন কারবারে ব্যবহার করা হয়, তা হলে যে একাজে সহযোগিতা করবে, আমি তাকে বেঁচে থাকতে দেব না।

এই হেরেমে কনস্তানিসের আদেশ তামিল না হয়ে পারে না।

মেরিয়া ও কনস্তানিস সেই বাগানেই মিলিত হতে থাকল। তারা একজন অপরজনের মাঝে এমনভাবে একাকার হয়ে গেল যে, কোনো-কোনো সাক্ষাতে টেরই পেত না, কোন ফাঁকে রাতটা কেটে গেছে এবং পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। এ প্রেমের ক্রিয়া এই দেখা গেল যে, মেরিয়াকে এখন আর কেউ ফরমায়েশ করে না। আবার কনস্তানিসের মনও এখন অন্য কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না।

কনস্তানিস কুস্তুন্তিনের পুত্র। সম্রাট হেরাক্‌ল কুস্তুন্তিনকে অভিজ্ঞ সেনাপতি বানিয়ে দিয়েছিলেন। একাধিক লড়াইয়ে অংশ নিয়ে সে যুদ্ধপরিচালনায় বেশ দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছিল। এরূপ প্রশিক্ষণ সে নিজের পুত্র কনস্তানিসকেও প্রদান করেছিল। ফলে ছেলেটা তার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গিয়েছিল। আবার রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-স্যাপারও ভালোই বুঝত। এসব কারণে কনস্তানিসকে কেউ বখাটে রাজকুমারদের মধ্যে গণ্য করত না।

প্রথম সাক্ষাতের মাসছয়েক পর আজও কনস্তানিস ও মেরিয়া বাগানের সেই নিঝুম কোনাটায় বসে একজন অপরজনের মাঝে হারিয়ে আছে।

'আজ আমি তোমাকে একটা কথা বলব'– মেরিয়া বলল– 'কিন্তু আপাতত কথাটা মনে-মনেই রাখতে হবে। গত রাতটা আমার সেই ডাক্তারের কাছে কেটেছে, যিনি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর চিকিৎসা করছেন। লোকটা ডাক্তার। কিন্তু তার চেয়ে নির্বোধ মানুষ বোধহয় আরেকজন নেই। আমাকে রানি মরতিনা তার কাছে যেতে আদেশ করেছিলেন। আমাকে দেখামাত্র তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। আমি তাকে মদ পার করালাম এবং পান করাতেই থাকলাম। এই ফাঁকে তিনি যেসব কথাবার্তা বললেন, তার থেকে আমি অনুমান করলাম, এই লোকটার ভেতর থেকে বোধহয় আমি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করতে পারব এবং তার মনস্কামনা পূরণ না করেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।...

'রাতটা আমি কীভাবে পার করেছি সেকথা শুনে তোমার কোনো লাভ নেই। যেকথাটা তোমার মনোযোগসহকারে শোনা দরকার, তা হলো, আমাকে পেয়ে লোকটা এতটা-ই আত্মহারা হয়ে গেল যে, তার হৃদয় থেকে এমন দু-একটা কথা বের হয়ে গেল, যার ফলে আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম। প্রথম কথাটা হলো, তিনি এ চেষ্টায় আছেন, হারকলিউনাস যেন সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। রানির ব্যাপারে তিনি এমন কিছু কথা বললেন, যার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, রানির সঙ্গে তার অন্য কোনো অকৃত্রিমতা আছে।'

'এর মধ্যে সন্দেহ করার মতো কোনো ব্যাপার নেই'– কনস্তানিস বলল– 'রানি চাচ্ছেন, সম্রাট সুস্থ হয়ে যান। আর সে-কারণেই তিনি ডাক্তারকে খুশি রাখছেন। এটি মূলত সম্রাট হেরাক্‌ল-এরই সন্তোষ লাভের চেষ্টা। কারণ, তিনি তার পুত্রকে সম্রাটের সিংহাসনে দেখতে চাচ্ছেন।'

'তারপরও আমি সন্দিহান'– মেরিয়া বলল– 'আমার সন্দেহটা হলো, রানির অনুমোদনক্রমে ডাক্তার সম্রাটকে ভুল কিংবা বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করছেন, যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য অতি দ্রুত পড়ে যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয়, ডাক্তার এমন দুঃসাহস দেখাতে পারে না'– কনস্তানিস বলল– 'বিষয়টা এখনও আমরা কাউকে বলব না। অন্যথায় স্বীকার করতে হবে, কথাটা তোমার মুখ থেকে বের হয়েছে। আমি জানি, এ-সময় রোমসাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব রানি মরতিনার। তার কানে তোমার নামটা পৌঁছে গেলে তিনি তোমাকে হত্যা করিয়ে ফেলবেন। রানি যদি পুনরায় তোমাকে ডাক্তারের কাছে পাঠান, তা হলে রহস্যটা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবে। সে যদি সত্যি-সত্যিই তোমার রূপ-যৌবন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তা হলে রহস্য উগড়ে দেবে।'

'আমি রহস্য বের করতে চাই।' মেরিয়া বলল।

দুজনই সদ্য তরুণ। রোমাঞ্চই এ বয়সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুজনেরই উপর এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিল যে, রোমাঞ্চকর এই পরিবেশে মেরিয়ার প্রকাশিত এই তথ্যটি কোনোই গুরুত্ব পেল না, যেন কথাগুলো কনস্তানিসের কানের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে বাতাসে মিশে গেছে। অবশ্য এটুকু অবশ্যই হয়েছে যে, রানি মরতিনা ও ডাক্তারের মাঝে যে-গোপনীয়তা ছিল, তার উপর থেকে পরদা উঠে গেছে।

* * *

হেরাক্‌ল-এর স্বাস্থ্য আগেই পড়ে গিয়েছিল। তার মতে মুকাওকিস যে-গাদ্দারিটা করেছেন, তা তিনি ভুলতেই পারছেন না। এই ব্যাপারটা তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর

অনেক বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ই করলেন না, মুকাওকিস আসলে গাদ্দারি করলেন, নাকি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। মুকাওকিস যা বুঝেছিলেন, তা হলো, রোমান বাহিনী এখন ইসলামি বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করার উপযোগী নয়। তাই তিনি চিন্তা করেছিলেন, মুসলমানরা গোটা মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নেবে; তার চেয়ে বরং আমি তাদের সঙ্গে সন্ধি করে সেখানেই থামিয়ে রাখি, যে পর্যন্ত তারা এসে পড়েছে। তিনি ব্যাবিলন দুর্গ রক্ষা করার ভাবনায় ছিলেন। ব্যাবিলন ও নীলনদের মধ্যখানে দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত রাওজা দুর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মজবুত ছিল। মুকাওকিস এ দুটি দুর্গ ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো মুসলমানদের থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছিলেন। সে লক্ষ্যেই তিনি আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হেরাক্ল তার যুক্তি-প্রমাণ শুনতেই রাজি হননি। তিনি মুকাওকিস থেকে সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন, যার অধীনে মুকাওকিস হেরাক্লকে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছিলেন।

মুকাওকিসে ভাগ্যের ফয়সালা করার পর হেরাক্ল-এর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। ডাক্তার তাকে দেখে গেছেন। তারপর তিনি ডাক্তারের পাঠানো ঔষধ সেবন করলেন। এবার তিনি কেরানিকে ডেকে পাঠালেন। কেরানি এসে হাজির হলে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নামে বার্তা লেখালেন। তিনি মুকাওকিসের কৃত চুক্তি রহিত করে দিলেন এবং মুসলমানদের খুবই শোচনীয় পরিণতির হুমকি-ধমকি দিলেন। তার মর্ম ছিল, যেন মুসলমানরা কোনো চুক্তি ছাড়াই মিশর ছেড়ে চলে যায়।

বার্তা লেখা শেষ হলে হেরাক্ল সাধারণ বার্তাবাহীর পরিবর্তে একজন কূটনীতিককে ডেকে পাঠালেন এবং বার্তটি তার হাতে দিয়ে বললেন, অতি দ্রুত ব্যাবিলন পৌঁছে যাও এবং এই বার্তাটি মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতির হাতে পৌঁছিয়ে দাও।

কেরানি যখন বার্তা লিখে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন এক চাকরানী তার কানে-কানে বলল, রানি মরতিনা তোমাকে ডাকছেন। কেরানি রানির কক্ষে চলে গেল, যেখানে বসে তিনি কেরানির অপেক্ষা করছেন।

'বসো এবং আরও একটি বার্তা লেখো'– রানি মরতিনা কেরানিকে বললেন– 'আর শোনো; এই বার্তার ব্যাপারে কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারবে না। অন্যথায় যদি আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে, তুমি কাউকে কিছু বলেছ, তা

হলে তারপর আর একটা দণ্ডও তুমি দুনিয়াতে থাকতে পারবে না। তোমাকে আমি এই গোপনীয়তার পুরস্কার দেব। লেখো।'

লোকটি বসে পড়ল আর রানি মরতিনা মিশরে রোমান বাহিনীর সেনাপতি থিওডোরের নামে বার্তা লেখাতে শুরু করলেন। সে-সময় থিওডোর মিশরের দুর্গবন্ধ নগরী ব্যবিলনে অবস্থান করছিলেন।

বার্তা লেখা শেষ হলে রানি মরতিনা ডাক্তারের মতো কেরানিকেও সোনার একটা টুকরা দিলেন। কেরানি বস্তুটা হাতে নিল। সহসা তার মুখের উপর বিস্ময়ের একটা ছাপ ফুটে উঠল। এত বেশি বিনিময় তার আশা ছিল না। রানি দেখলেন, সোনার টুকরাটা হাতে নিয়ে লোকটা উদ্দীপ্ত নয়নে জিনিসটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে। মুখটা যেন তার খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। বললেন, অত কী দেখছ? জিনিসটা পকেটে পুরে ফেলো। কাউকে বলো না, আমি দিয়েছি।

কেরানির হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল। চোখ তুলে উজ্জ্বল মুখে রানির প্রতি এক পলক তাকিয়ে সোনার টুকরাটা পকেটে রেখে দিল।

রোমের এই রাজপরিবারটির কাছে এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিল, যার হিসাব তাদের কাছেও ছিল না। একজন কেরানি পদমর্যাদার লোকের জন্য এক টুকরা সোনা একটা ধনভাণ্ডারের সমান। কিন্তু রানি মরতিনার জন্য এতটুকু সোনা এমনই ছিল, যেন গাছের একটা শুকনা ডাল তুলে বাইরে ফেলে দিলেন।

কেরানি বেরিয়ে গেলে চাকরানী ভেতরে প্রবেশ করে বলল, দূত এসে পড়েছে। মরতিনা দূতকে ভেতরে ডেকে নিলেন।

'একটি বার্তা আমারও নিয়ে যাও'– মরতিনা বললেন– 'তুমি তো জান, আমার বার্তা অন্য কাউকে দেখানো যায় না। মিশর পৌঁছে জেনারেল থিওডোরকে বার্তাটি এমন অবস্থায় দেবে যে, সেখানে তুমি আর সে ছাড়া আর কেউ থাকবে না। অন্য কেউ জানতে পারলে তার শাস্তি কী হবে তা তোমার জানা-ই আছে।'

মরতিনা দূতকেও সোনার একটা টুকরা দিলেন। দূত সঙ্গে-সঙ্গে টুকরাটা পকেটে পুরে নিল। সম্রাট হেরাক্ল-এর আলাদা আর রানি মরতিনার আলাদা বার্তা নিয়ে দূত তখনই মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। কিছু রাস্তা তাকে স্থল পথে অতিক্রম করতে হবে। তারপর পালতোলা জাহাজে করে রোম-উপসাগর পাড়ি দিতে হবে।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নামে লেখা হেরাক্ল-এর এই বার্তা ৬৪০ খ্রিস্ট্রীয় সনের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে বাজিন্তিয়া থেকে রওনা

হয়েছিল। গন্তব্যে এসে পৌঁছল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের মাঝামাঝিতে। মুসলিম বাহিনী ব্যবিলন অবরোধ করে রেখেছিল। সেজন্য দূত সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে বাইরেই পেয়ে গেল। বার্তাটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েই দূত নদীর দিকে চলে গেল। তাকে সেই ফটকে দুর্গে ঢুকতে হবে, যার মুখ নদীর দিকে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) বার্তাটি পড়লেন। পড়ে শেষ করেই তিনি তাঁর সেনাপতিদের এমনভাবে ডাক দিলেন, যেন তিনি কোনো একটা শুভ সংবাদ পেয়েছেন। ডাক শুনে সেনাপতিগণ ছুটে এলেন। আমর ইবনে আস বার্তাটি পাঠ করে তাঁদের শোনালেন। সম্রাট হেরাক্ল লিখেছেন, আমি সন্ধিচুক্তি রহিত করে দিলাম। আরও লিখেছেন, এখন তোমাদের মোকাবেলা মুকাওকিসের পরিবর্তে অন্যান্য সেনাপতিদের সাথে হবে। হেরাক্ল একথাটিও লিখেছেন যে, কোনো শাসনকর্তা স্বজাতির কোনো বিশ্বাসঘাতকের সম্পাদিত চুক্তি বরণ করে নিতে পারেন না। তিনি আরও লিখেছেন, তোমাদের হাড়গোড় মিশরের মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে-আগেই জীবন নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে যাও। ব্যবিলন জয় করা তোমাদের সাধ্যে কুলোবে না।

'আল্লাহর সৈনিকগণ!'– আমর ইবনে আস (রাযি.) সালারদের পানে মুখ তুলে বললেন– 'হেরাক্ল-এর এমন হুমকি আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়। মুকাওকিস তো আমাদের এ রকম হুমকি দিতে-দিতেই একসময় সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়েছিল। তোমরা বোঝনি, রোমানদের কাছে হুমকি-ধমকি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই? ব্যবিলনের ব্যাপারটা এজন্য খানিক আলাদা যে, এই দুর্গটা খুবই মজবুত। এক দিক থেকে নীল একে সুরক্ষিত করে রেখেছে, অপর দিকগুলোতে এই পরিখাগুলো এর সুরক্ষায় বিরাট কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আমাদের মুজাহিদদের নীলও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, মরুভূমিও আমাদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ তোমরা ব্যবিলনও জয় করে নেবে। আল্লাহর কসম! আমি হেরাক্লকে তার এই হুমকির জবাব দিতে চাই।'

সালারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) ব্যবিলন-জয়ের পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন। অপেক্ষা ছিল শুধু হেরাক্ল সন্ধিচুক্তিতে মঞ্জুরি দেন কি-না। আর এখন সেই বিষয়টির মীমাংসা হয়ে গেলে সিপাহসালার ব্যবিলন আক্রমণের আদেশ জারি করে দিলেন এবং বলে দিলেন, একটা মিনিট সময়ও নষ্ট করা যাবে না।

সেনাপতিগণ ছুটে গিয়ে আপন-আপন ইউনিটগুলোকে সিপাহসালারের আদেশের কথা শোনালেন এবং তাদের উত্তেজিত করে তুললেন। প্রতিজন

মুজাহিদের কানে সম্রাট হেরাক্ল-এর হুমকির কথা পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো এবং বলা হলো, এই হুমকির জবাব মুখের বদলে কাজের মাধ্যমে দেওয়া হবে।

রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আমর ইবনে আস (রাযি.) অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সিপাহসালার ছিলেন। তিনি আগেই তাঁর সালারদের বলে রেখেছিলেন, মুকাওকিস সময় নিতে এই সন্ধি করেছে এবং বলে গেছে, সম্রাট হেরাক্ল-এর কাছ থেকে এর অনুমোদন নিতে হবে। মূলত মুকাওকিস পেছন থেকে সহযোগী বাহিনী এসে পৌঁছার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ ছিলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) মনে-মনে ভাবলেন, সময় অনেকখানি আগেই চলে গেছে। আবার এখনও অবধি সন্ধির মঞ্জুরি আসেনি। এমনও হতে পারে, সন্ধির অনুমোদনের পরিবর্তে এস্কান্দারিয়া কিংবা বাজিন্তিয়া থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটা বাহিনীই এসে পড়বে। আর তা-ই যদি ঘটে, তবে তো আমাদের জন্য কঠিন সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে!

এই আশঙ্কার প্রেক্ষিতে সিপাহসালার তাঁর বাহিনীর পজিশনের পরিসংখ্যান নিলেন। বাহিনী দুর্গ ও পরিখার মধ্যখানে ছিল। সিপাহসালার ধরে নিলেন, সহযোগী বাহিনী নদীপথে আসবে এবং ওদিককার ফটকে ভেতরে ঢুকে যাবে। এমনও হতে পারে, রোমানরা পরিখায় পানি ছেড়ে দেবে আর ভেতর থেকে বাহিনী বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালাবে। যদি তা-ই হয়, তা হলে বর্তমান পজিশন থেকে পিছু হটা মুজাহিদদের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন তার পরিখা আর বিপুলসংখ্যক শত্রু-সেনার মধ্যখানে এমনভাবে ফেঁসে যাবে যে, কোনো কৌশল, কোনো পজিশন বদলানো সিপাহসালারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ভাটার টানে নীলনদের পানি কমে যাওয়ার ফলে ব্যবিলন দুর্গের তিন দিককার পরিখার পানি নদীতে ফিরে গিয়েছিল। সেই সুযোগে মুসলমানরা এই পরিখাগুলো অতিক্রম করে ওপারে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর জানা ছিল না, পরিখায় পানি ছাড়ার কোনো ব্যবস্থা আছে, নাকি নেই। আশঙ্কা দেখা দিতে লাগল, ব্যবস্থা একটা আছে নিশ্চয়। এসব শঙ্কা ও সমস্যার চিন্তা মাথায় নিয়ে সিপাহসালার আমর ইবনে আস সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলেন যে, চুক্তির মঞ্জুরি বা নামঞ্জুরির সিদ্ধান্ত আসার আগে-আগেই সমস্ত বাহিনীকে পরিখার বেষ্টনি থেকে বের করে নিয়ে এলেন এবং অবরোধ বহাল রাখলেন। সিপাহসালার তাঁর সালারদের বলে রাখলেন, আমরা সময়মতো পরিখা অন্য কোনো উপায়ে পার হব।

* * *

দুর্গবন্ধ রোমানরা যখন দেখল, মুসলমানরা পরিখা পার হয়ে পেছনে চলে গেছে, তখন তাদের সেনাপতিরা অন্য একটা কৌশল অবলম্বন করল। তারা বাহিনীকে বাইরে বের করে আনল না বটে; কিন্তু কতগুলো মিনজানিক বাইরে নিয়ে এল এবং নগরীর চার দিকে স্থাপন করল। সেইসঙ্গে তিরন্দাজদের একটি বাহিনীও বেরিয়ে এল, যারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করবে না বটে; তবে একস্থানে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের উপর তির নিক্ষেপ করবে।

রোমানদের জন্য একটা সুযোগ ছিল যে, পরিখা ও দুর্গের মধ্যখানে অনেকগুলো ফলবাগান। ঝাড়ে-ঝাড়ে ফলগাছ চার দিক ছড়িয়ে আছে। গাছগুলো অনেক ঘন ও ঝোঁপালো। রোমান তিরন্দাজ বাহিনীটি সেই গাছগুলোতে চড়ে বসল এবং মুজাহিদদের উপর তির ছুড়তে লাগল। সেইসঙ্গে মিনজানিক-নিক্ষিপ্ত পাথরও আসতে লাগল।

মুসলমানদের কাছেও মিনজানিক ছিল এবং দূরে তির ছোড়ার জন্য ধনুকও। তারা পাথরের জবাব পাথর দ্বারা দিতে শুরু করলেন আর তিরের উত্তরে বৃষ্টির মতো তির ছুড়লেন। কিন্তু রোমান তিরন্দাজরা যেহেতু গাছের উপর চড়ে ছিল, তাই ঘন গাছের ডাল-পাতার ফাঁক ভেদ করে তাদের দেখা যাচ্ছিল না। গাছের আড়াল ও নানা সুযোগ-সুবিধার ফলে রোমানরা বেশ লাভবান হচ্ছিল। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর সৈনিকদের তিরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে তাঁদের আরও পেছনে সরিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন রাত অন্ধকার হয়ে যেত, তখন পরিষ্কার বোঝা যেত, রোমানরা পরিখায় কী যেন করছে। রাতে তিরন্দাজি থেমে যেত। কিন্তু তারপরও মুজাহিদরা সামনে এগুতেন না যে, সামান্য সন্দেহ হলেও রোমানরা তির ছোড়া শুরু করবে।

রোমানরা নিজেদের এতখানি স্বাধীন ও নিরাপদ ভাবতে লাগল যে, তারা দুর্গের ফটক খুলে রেখেছে। তিরন্দাজরা স্বাধীনভাবে বাইরে আসা-যাওয়া করছে। একটা তিরন্দাজ ইউনিট দিনভর তিরন্দাজি করছে আর সন্ধ্যা নেমে এলে তারা ফিরে যাচ্ছে। নতুন আরেকটা তরতাজা ইউনিট এসে তাদের জায়গা পূরণ করছে। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) সর্বত্র ঘুরে ফিরছেন এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি অবলোকন করে নানা নির্দেশনা জারি করছেন।

প্রস্তর নিক্ষেপ ও তিরন্দাজির জবাবে প্রস্তর নিক্ষেপ আর তিরন্দাজির মধ্য দিয়েই ৬৪১ সালের জানুয়ারি মাসটা কেটে গেল এবং ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর অবস্থান এখনও পরিখা থেকে খানিক বাইরে এবং রোমান বাহিনী পরিখা ও দুর্গের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একদম নিরাপদ ও

উদ্দীপ্ত। আমর ইবনে আস লড়াই অব্যাহত রাখলেন। তাঁর অপারগতা হলো, মুজাহিদ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা রোমান বাহিনীর মোকাবেলায় এবং ব্যবিলনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙার ক্ষেত্রে খুবই অপ্রতুল। তাঁর মস্তিষ্ক অনেক দ্রুত কাজ করছে বটে; কিন্তু দুর্গ আক্রমণের জন্য তিনি কোনো পথ দেখতে পাচ্ছেন না।

সিপাহাসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) একটি ব্যবস্থা এ-ও করে রেখেছিলেন যে, কয়েকজন মুজাহিদকে তিনি নীলনদের কূলে এস্কান্দারিয়ার দিকে বেশ দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদের দায়িত্ব হলো, ওদিক থেকে যদি কোনো সহযোগী বাহিনী আসতে দেখে, তা হলে সাথে-সাথে সংবাদ জানাবে। তাদের মাঝে তিরন্দাজই বেশি। তাদের জন্য আদেশ ছিল, যেসব জাহাজ ও নৌকোয় করে বাহিনী আসবে, সেগুলোতে তির ছুড়বে এবং তাদের গতি মন্থর করে দেবে। সিপাহসালারের একটি আদেশ এটিও ছিল যে, বাহিনীবোঝাই যে নৌকেগুলো কূলে-কূলে আসবে, কতগুলো মশাল জ্বালিয়ে সেগুলোর পালে নিক্ষেপ করবে, যাতে পালগুলো পুড়ে যায়। কিন্তু বাহিনীর আগমনের সংবাদ যেন সিপাহসালারের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পৌছানো হয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ জিহাদকে শ্রেষ্ঠতম আমল সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন– সূরা আনকাবুতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা আল্লাহর জন্য জিহাদ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁদের (জয়ের) পথ দেখিয়ে দেন এবং আল্লাহ নেককার লোকদের সঙ্গে থাকেন।

ব্যবিলন দুর্গের অবরোধে আল্লাহ তাঁর সেই ওয়াদা পূরণ করেছেন। একদিন নীলের কূলে প্রেরিত মুজাহিদদের একজন ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে এলেন এবং সরাসরি আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকে দেখেই ধারণা করা যাচ্ছিল, রোমানদের সহযোগী বাহিনী এসে পড়েছে আর তিনি তার সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

'রোমানদের সহযোগী বাহিনী আসছে নাকি?' সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন।

'না সিপাহসালার!'– মুজাহিদ উত্তর দিলেন– 'আমি অনেকগুলো সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। একটি সংবাদ হলো, নগরীতে এমন একটা ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অধিবাসী আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে। এই ব্যাধি নগরীতে বিদ্যমান বাহিনীটির মাঝেও বিস্তার লাভ করছে। দ্বিতীয় খবর হলো, সম্রাট হেরাক্‌ল মারা গেছেন। তৃতীয় খবর হলো, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সহযোগী বাহিনীর কোনো নাম-চিহ্নও চোখে পড়ছে না। বাহিনীর

লোকেরা বুরুজে উঠে-উঠে সেই দিকটায় তাকিয়ে থাকছে, যেদিক থেকে তারা সহযোগী বাহিনী আসতে পারে বলে প্রত্যাশা করছে।'

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর চেহারায় আনন্দমাখা বিস্ময় ফুটে উঠল।

একটা নৌকা দুর্গের নদীর দিককার ফটকের দিক থেকে এল। নৌকাটা ছিল জেলেদের। ওরা নদীতে মাছ ধরতে বেরিয়ে এসেছে। আসতে-আসতে নদীর পশ্চিম তীরের কাছাকাছি চলে এল। ওখানে যে-মুজাহিদরা ছিলেন, তাঁরা নৌকাটা দাঁড় করিয়ে দুর্গের তথ্য নিতে চেষ্টা করলেন। জিজ্ঞাস করলেন, দুর্গের অবস্থা কী? জেলেরা তাদের এসব সংবাদ শোনাল আর মুজাহিদরা তাদের ছেড়ে দিলেন।

সিপাহসালার তখনই সব কজন সালারকে ডেকে পাঠালেন এবং সংবাদগুলো শুনিয়ে বললেন, এখন আশা রাখা যেতে পারে, রোমানদের মনোবল আরও ভেঙে যাবে। রোমান বাহিনীর সেনাপতি তার রাজার মনোতুষ্টির নিমিত্ত লড়াই করত। এখন তাদের রাজা মারা গেছেন। এর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে, যা অস্বীকার করা যায় না।

'কিন্তু তার অর্থ এই নয়'– আমর ইবনে আস বললেন– 'যে, সহযোগী বাহিনী আসবেই না। মুসলমানরা ব্যবিলন অবরোধ করে রেখেছে এ সংবাদ পেয়ে হেরাক্‌ল কোনো বাহিনী পাঠাবেন না এ হতে পারে না। মৃত্যুর আগে তিনি মিশরে সহযোগী বাহিনী পাঠানোর আদেশ জারি করে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কাজেই ব্যবিলন-জয়ের এই অভিযানে বাহিনীর মাঝে আরও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।'

সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মৃত্যুতারিখ কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। তবে নির্ভযোগ্য তথ্য হলো ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি।

হেরাক্‌ল রোমসাম্রাজ্যের সর্বশেষ লড়াকু ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, রোমেরও শক্তিও তত দিন নিরাপদ ছিল। ঈমানের বলে বলীয়ান আল্লাহর পথের সৈনিকরা তাকে একের-পর-এক পরাজয় দ্বারা পর্যুদস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু সিপাহসালার আমর ইবনে আস ও আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) বলতেন, রোমানরা যেকোনো সময় পা জমিয়ে পালটা আক্রমণ করে বসতে পারে। এ এমন একটা সাপ, যে মরতে গিয়েও দংশন করে যায়।

আল্লাহ মুজাহিদদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁদের বিজয়ে পথ খুলে দিয়েছেন। ইতিহাস এই বাস্তবতার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ সব সময় সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গে থাকেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) রোমসম্রাট হেরাক্‌ল-এর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু তার চলে যাওয়ার পর বাজিন্তিয়ায় এখন কেমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা তিনি জানতে পারেননি। এই তথ্যটিও তাঁর জানা ছিল না যে, রানি মরতিনা জেনারেল থিওডোরের কাছে গোপনে আলাদা বার্তা পাঠিয়েছেন এবং তারও একটা প্রতিক্রিয়া আছে।

আগে এই বার্তাটি নিয়ে কথা বলি, যাতে ব্যবিলনের ভেতরকার পরিস্থিতি জানা হয়ে যায়। কোনো ঐতিহাসিকই রানি মরতিনার এই বার্তার পুরোপুরি ভাষ্য উল্লেখ করেননি। সবাই শুধু বার্তার সারাংশটুকু উল্লেখ করেছেন। এই বার্তা স্পষ্ট প্রমাণ করছিল, রানি মরতিনা জেনারেল থিওডোরকে নিজের রূপ ও সম্পদের কয়েদি বানিয়ে রেখেছিলেন। থিওডোর শুধু তার গুণগ্রাহী-ই ছিলেন না, রীতিমতো ভৃত্য হয়ে ছিলেন।

মরতিনা তাকে লিখেছেন, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার স্বাস্থ্য দ্রুতগতিতে পড়ে যাচ্ছে এবং দিন-দিন দুর্বল-থেকে-দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছেন এবং যেকোনো সময় ইহলোক ত্যাগ করে চলে যাবেন। তুমি তো জান, আমি আমার পুত্র হারকলিউনাসকে হেরাক্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত বানাতে এবং তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজমুকুটটা তার মাথায় পরাতে চাচ্ছি। এর জন্য একটি জরুরি কাজ হলো, আরবের এই মুসলমানদের মিশর থেকে বের করে দিতে হবে। তারপর আমি বলতে পারব, সম্রাট হেরাক্‌ল তো পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু আমার ছেলে পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করেছে। খবরদার! ব্যবিলন যেন কোনো মূল্যেই মুসলমানদের হাতে না যায়। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে কী পুরস্কার দেব সেকথা তোমার ভালো করেই জানা আছে। এখন বলে আমি তোমাকে খাট করতে চাই না। শুধু এটুকু ইঙ্গিত দিয়ে রাখি যে, তুমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। আরও একটি কথা বলে রাখি, আমার এই মনোবাসনা যদি পূরণ কর, তা হলে আমি তোমাকে রোমসাম্রাজ্যের সমগ্র বাহিনীর প্রধান বানিয়ে দেব আর মিশরে তুমি সেই পদমর্যাদায় ভূষিত হবে, যেটি মুকাওকিসের দখলে ছিল। তুমি মিশরের শাসনকর্তা হবে।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, এই বার্তায় রানি মরতিনা কিছু রোমান্টিক কথাবার্তাও লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, তোমার জন্য আমি বাজিন্তিয়া থেকে তিনটি অপরূপ সুন্দরী কচি মেয়ে পাঠিয়ে দেব।

রানি মরতিনার এই বার্তাটি হাতে পৌঁছামাত্র থিওডোরের মাঝে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি তার অধীন সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে প্রথমে আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা করে উত্তেজিত করে তুললেন। তারপর সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের কঠোর নির্দেশনা জারি করে বললেন, এটি শুধু রোমের মর্যাদার প্রশ্ন নয়– বরং এর সঙ্গে প্রতিজন রোমান নাগরিকে ব্যক্তিগত মান-মর্যাদার বিষয়টিও জড়িত।

ব্যবিলনকে মুজাহিদদের হাত থেকে রক্ষা করতে থিওডোর প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপই বাদ রাখেননি।

হেরাক্ল-এর মৃত্যুসংবাদ যখন ব্যবিলন পৌঁছল, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় এমনটি আশা করা যুক্তিসঙ্গত ছিল যে, এই দুর্ঘটনায় সবার মনোবল ভেঙে যাবে। কিন্তু থিওডোর তা হতে দেননি। তিনি সমস্ত বাহিনীকে সমবেত করে এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন যে, প্রতিজন সৈনিককে ক্ষেপিয়ে তুললেন। তিনি বললেন, পরাজয়ের দায় সবার আগে মুকাওকিসের ছিল। তারপর হেরাক্ল-এর। এখন দুজনের একজনও নেই। কাজেই পরাজয়কে জয়ে পরিণত করার দায়িত্ব এখন আমাদের কাঁধে। মনে রাখবে, রোমসাম্রাজ্য হেরাক্ল-এর নয়– তোমাদের।

জেনারেল থিওডোরের এই বক্তৃতার হুবহু ভাষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। শুধু এটুকু পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি সেনাবাহিনী ও আমজনতার মাঝে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে এসে তিনি এই যুদ্ধকে ব্যক্তিগত লড়াই ভাবতে শুরু করেছিলেন।

সম্রাট হেরাক্ল-এর মৃত্যুর পর বাজিন্তিয়ায় কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে তার বিবরণ জানা যাচ্ছে। প্রথম কথা হলো, রানি মরতিনা ডাক্তারের মাধ্যমে বিষাক্ত ঔষধ সেবন করিয়ে হেরাক্লকে হত্যা করেছিলেন। ডাক্তার মরতিনাকে রিপোর্ট করেছিলেন, সম্রাট দেড় থেকে দুমাস সময়ের মধ্যে মারা যাবেন। তার এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

বাজিন্তিয়ায় যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা খানিক এ রকম যে, যেইমাত্র হেরাক্ল মারা গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে রানি মরতিনা ঘোষণা করে দিলেন, আমার পুত্র হারকলিউনাস হেরাক্ল-এর স্থলাভিষিক্ত। মৃত্যুর আগেই সম্রাট এই সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। কিন্তু সত্য ও বাস্তবতা হলো, হেরাক্ল এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণই করেননি। এরূপ কোনো ঘোষণা-ই তিনি দিয়ে যাননি। মৃত্যুর আগে টানা তিন-চার দিন তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে একদিন সকালে রানি দেখলেন, তিনি আর নেই। রাতে কোনো একসময় অচেতন অবস্থায় কিংবা ঘুমের মধ্যে মরে গেছেন।

রানি মরতিনার এই ঘোষণা শুনতেই হেরাক্‌ল-এর বড় পুত্র কুস্তুন্তিন হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিল। বলল, বাবা বলে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হব। আরও বলল, হারকলিউনাসের বয়স কম, অনভিজ্ঞ এবং রাষ্ট্রপরিচালায় অযোগ্য। বর্তমান এই ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এত বড় একটি সাম্রাজ্যের বাগডোর সামলানোর যোগ্যতা ও দক্ষতা তার নেই।

সেনাপ্রধান ও নগরপ্রশাসক জানতেন, এই পরিস্থিতিতে হারকলিউনাসকে সিংহাসনে বসানো ভয়ানক ভুল এবং এর জন্য কুস্তুন্তিনই উপযুক্ত। কিন্তু প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে দুটি পক্ষ তৈরি হয়ে গেল। কতিপয় মরতিনার সমর্থক, কতিপয় কুস্তুন্তিনের সমর্থক। এভাবে সেনাবাহিনী ও রাজমহলে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল, যার ফলে স্থলাভিষিক্তির প্রশ্নে দুটি পক্ষ পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। কুস্তুন্তিন কোনো মূল্যেই সিংহাসন ছাড়বে না। রানি মরতিনাও তার দাবি থেকে এক চুল সরবেন না।

ইতিহাসে একথাটিও পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে যে, হেরাক্‌ল বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটি তরতাজা বাহিনী গঠন করতে এবং অনতিবিলম্বে তাদের মিশর পাঠানোর নির্দেশও দিয়ে রেখেছিলেন। বাহিনী তৈরি হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু রওনার আগেই হেরাক্‌ল মারা গেছেন। কুস্তুন্তিন আদেশ জারি করলেন, সহযোগী বাহিনীটি মিশর পাঠানোর জন্য জাহাজ প্রস্তুত করো। রানি মরতিনা বললেন, বাহিনী যাবে যাক; কিন্তু কুস্তুন্তিনকে এই বাহিনীর সঙ্গে যেতে হবে। যুক্তি দেখালেন, তার রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধপরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই ও গেলে বাহিনীটিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। অন্যথায় আগেকার সেনাপতিরা এই বাহিনীটিকেও মুসলমানদের হাতে শেষ করে ফেলবে।

কুস্তুন্তিন জানত, এ মুহূর্তে মরতিনার মিশর নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। তার একমাত্র চিন্তা ছেলেকে সিংহাসনে বসানো। কাজেই বাজিন্তিয়া থেকে অনুপস্থিত থাকা তার কোনোমতেই উচিত হবে না।

'আদেশ-নিষেধ আমার চলবে'– রানি মরতিনা ঘোষণা করলেন– 'নাহয় আমার পুত্র হারকলিউনাসের। কুস্তুন্তিন বাহিনীর কমান্ডার। সে আমার থেকে কিংবা আমার ছেলের কাছ থেকে আদেশ নেবে। তার জন্য রাজাদেশ হলো, সে সহযোগী বাহিনী নিয়ে মিশর রওনা হয়ে যাক। স্থলাভিষিক্তির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই।'

কুস্তুন্তিনের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা আছে, তারা সবাই একজোট হয়ে তার পক্ষে লড়ছে এবং সে তাদের সমর্থন ও সহযোগিত লাভ করছে। তার সমর্থক

সেনাপতি, সেনা-অফিসার, প্রশাসনিক কর্তকর্তা রাজপরিবারের কিছু সদস্য তার পক্ষে সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে এবং সত্যিকার অর্থেই তারা শক্ত একটা প্লাটফর্ম তৈরি করে ফেলেছে। এমনকি তারা মিশরের পরাজয় ও মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার বিষয়টিকে পর্যন্ত এক পাশে ঠেলে রেখে সিংহাসনের স্থলাভিষিক্তির বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করেছে যে, আর যা হয় হোক, কুস্তুন্তিনকে সম্রাট হেরাক্ল-এর উত্তরাধিরী বানাতেই হবে।

স্থলাভিষিক্তির প্রশ্নে এদের অবস্থানই সঠিক ছিল। এরা ছিল বাস্তববাদী। রোমসাম্রাজ্যের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে এনে তাকে সম্প্রসারিত করা-ই ছিল এদের লক্ষ্য। সঙ্গত কারণেই এরা কুস্তুন্তিনকেই একাজের যোগ্য মনে করত। বয়সের দিক থেকেও কুস্তুন্তিন পৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে গিয়ে মানুষের বিবেক-বিচক্ষণতা প্রখর হয়ে যায় এবং বিগত জীবনের ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারে।

অপর দিকে রানি মরতিনা তার পুত্রের জন্য কয়েকজন সমর্থক কিনে রেখেছিলেন। ধনভাণ্ডার তারই হাতে ছিল এবং শাহি হেরেমে তারই আদেশ-নিষেধ কার্যকর হতো। সেই সুবাদে অবলীলায় সোনা-মানিক্য আর রূপসী মেয়েদের ব্যবহার করে তিনি জনাকয়েক সেনাপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মুঠোয় নিয়ে রেখেছিলেন। এখন সময় এসেছে তাদের দায়িত্ব পালন করার। ফলে তারাও কুস্তুন্তিনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটা প্লাটফর্ম তৈরি করে নিল।

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ও রাজাদেশ স্থবির হয়ে গেছে। সহযোগী বাহিনীটি আদেশের অপেক্ষায় ব্যারাকে বসে আছে। উভয় পক্ষের সেনাপতিরা আপন-আপন ইউনিটগুলোকে আলাদা করে ফেলেছে এবং পরিস্থিতি রীতিমতো গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এহেন পরিস্থিতিতে সহযোগী বাহিনীটিকে পর্যন্ত সেনাপতিরা বিভক্ত করে নিয়েছে। মিশরে বাহিনী পাঠাতে হবে একথাটি বলার মতো কোনো লোক এখন আর নেই। সমস্ত প্রশাসনে পুরোপুরি স্থবিরতা নেমে এসেছে। কোথাও কোনো কাজ নেই। রানি মরতিনার চালিয়াতি তুঙ্গে উঠে গেছে।

রোমস্রাম্রাজ্যের ব্যাপারে কুস্তুন্তিন পুরোপুরি নিষ্ঠ। সে মনে-প্রাণে কামনা করছে, এই বিবাদ মিটমাট হয়ে যাক। কিন্তু রানি মরতিনা দমবার মতো পাত্রী নন। জনাচারেক পাদরিকে তিনি কুস্তুন্তিনের কাছে পাঠালেন। তাদের দায়িত্ব দিলেন, তোমরা গিয়ে ওকে বুঝিয়ে এই মর্মে সম্মতি নাও যে, তুমি গোটা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে যাও আর সিংহাসনে হারকলিউনাস বসুক। বাকি সব কিছু কুস্তুন্তিন নিজের হাতে রাখুক।

পাদরিগণ কুস্তুন্তিনের কাছে গেলেন এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে বোঝাতে শুরু করলেন। কুস্তুন্তিন বলল, আমি যদি নিশ্চিত হতাম, হারকলিউনাসকে সিংহাসনে বসালে রোমসাম্রাজ্যের উপকার হবে, তা হলে আমি নিজের অধিকারের দাবি থেকে হাত গুটিয়ে নিতাম। পাদরিগণ তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। আর বোধহয় এক পাদরি তাকে অপমানজনক কোনো কথাও বলে ফেললেন।

'আমি আপনাদের সম্মান করি'– কুস্তুন্তিন বলল– 'আপনারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন। হারকলিউনাস কোন চরিত্রের এবং কতখানি জ্ঞানী তা আপনারা জানেন। কিন্তু তারপরও তাকে আপনারা সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছেন! বিবেক-বুদ্ধি কোথায় রেখে এসেছেন? আমি জানি, আপনারা অপারগ। যে-কথাগুলো আপনারা আমাকে বলেছেন, এসব বলতে আপনারা বাধ্য। কথাগুলো মূলত আপনারা বলছেন না– বলছে রানি মরতিনার সোনার চাকা। রানি মরতিনা আপনাদের যেসব রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে রেখেছেন, আপনারা তার জাদুর ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলছেন। আর কোনো কথা না বলে আপনারা এখান থেকে উঠে যান। অন্যথায় আমি আপনাদের পুরোহিতগিরি দেখে ছাড়ব।'

পাদরিদের বিবেক ছিল অপরাধী। কুস্তুন্তিনের হুমকির পর তারা আর কোনো কথা বলতে সাহস পেলেন না। তারা উঠে চলে গেলেন।

কুস্তুন্তিন এবার রাজার সুরে আদেশ জারি করলেন, সহযোগী বাহিনী প্রস্তুত করে অনতিবিলম্বে মিশর পাঠানো হোক। কিন্তু তার আদেশের কোনো কার্যকারিতা চোখে পড়ল না। শূন্যে ছোড়া তির যেমন ব্যর্থ যায়, তার রাজাদেশও তেমনি বাতাসে মিশে গেল। তার সমর্থক সেনাপতিরা তাকে জানাল, সহযোগী বাহিনী দুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। আমরা যদি আপনার সমর্থক অংশটিকে পাঠিয়ে দিই, তা হলে এখানে আপনার সমর্থক সৈন্যের সংখা কমে যাবে আর রানি মরতিনার সমর্থকদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তখন তারা সিংহাসন দখল করে হারকলিউনাসকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে।

এটি অনেক বড় করুণা ছিল, যেটি দ্বারা মহান আল্লাহ ইসলামের সৈনিকদের ধন্য করেছিলে। এটি বিরাট এক অভিশাপ ছিল, যেটা মহান আল্লাহ রোমানদের উপর নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করছিলেন যে, তোমরা যদি একশো মানুষ ঈমানি বলে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে যাও, তা হলে এক হাজার শত্রুর উপর জয়ী হবে।

যারা ঈমানের সাথে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যায়, আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে থাকেন এবং তাদের পক্ষে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে থাকে। রোমসাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদের যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল, মুজাহিদদের জন্য তা একটি মোজেজার চেয়ে কম ছিল না। মুসলমানদের মিশর থেকে বিতাড়িত করা যাদের দায়িত্ব, ওখানে তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে একে অপরের রক্তের পিপাসায় কাতর হয়ে উঠেছে।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না, বাজিন্তিয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে এবং সহযোগী বাহিনীর আশঙ্কা একেবারেই দূর হয়ে গেছে। পরিখা অতিক্রম করে দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা তিনি আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন বটে; কিন্তু কোনো সুযোগ পাচ্ছিলেন না। রোমানরা বাইরে মিনজানিক স্থাপন করে রেখেছিল এবং তিরন্দাজরা গাছে বসে লুকিয়ে-লুকিয়ে তির ছুড়ছিল।

ইতিহাস প্রমাণ করছে, রানি মরতিনা জেনারেল থিওডোরকে আরও একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি রাজমহলের পুরো পরিস্থিতি লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন, এখানে যেকোনো সময় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। তবে গৃহযুদ্ধ হোক বা না হোক; এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হারকলিউনাস সিংহাসনের উত্তরাধিকার পাচ্ছে না। মরতিনা লিখেছেন, নিজের সমস্ত উপায়-উপকরণকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগাও এবং মুসলমানদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দাও। মরতিনা বোঝাতে চেয়েছিলেন, পরিস্থিতি যদি এমনই তৈরি হয়ে যায় যে, স্থলাভিষিক্তির এ লড়াইয়ে আমি ও আমর পুত্র হেরে যাই, তা হলে আমাদেরকে মিশর গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। আর তখন আমি মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়ে রোমসাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যাব। তিনি থিওডোরকে জোরালো ভাষায় লিখেছেন, মিশরকে যেকোনো মূল্যে নিরাপদ রাখতে হবে। সেখান থেকে আমাদের রাজত্বের সূচনা হবে এবং ওখানে যে-বাহিনীটি আছে, সেটি আমাদের থাকবে।

সম্রাট হেরাক্ল বাজিন্তিয়ায় মুকাওকিসের উপর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আরোপ করে ঠিকই বলেছিলেন যে, মিশরে এক লাখ ফৌজ বিদ্যমান আছে, যাদের থেকে মাত্র বারো হাজার সৈনিক দ্বারা যুদ্ধ করানো হয়েছে। এত বিশাল একটি বাহিনীকে যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগানো হতো, তা হলে আট-দশ হাজার সৈনিকের ক্ষুদ্র এই মুসলিম বাহিনীটিকে মিশরেই পিষে ফেলতে পারত।

এটা ঠিক যে, মিশরে এক লাখ রোমান সৈনিক ছিল। কিন্তু তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা মুজাহিদদের মোকাবেলায় এসেছিল, তাদের হাজার-হাজার সেনা প্রাণ হারিয়েছিল।

জেনারেল থিওডোর রানি মরতিনার এই দ্বিতীয় বার্তা অনুসারে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় রদবদল করলেন। এক তো তিনি জেনে ফেলেছেন, বাজিন্তিয়া থেকে সাহায্য আসবে না। অন্য কোনো অঞ্চল থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠানোরও কোনো সুযোগ তার নেই। কারণ, ব্যবিলন মুজাহিদদের দ্বারা অবরুদ্ধ। নৌপথও মুজাহিদদের উপস্থিতিতে নিরাপদ নয়।

একদিন এক মুজাহিদ দেখলেন, রোমানরা মিনজানিকগুলো দুর্গের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তিরন্দাজ সৈনিকরাও ভেতরে চলে গেছে। তারপর ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) ব্যাপারটা দেখতে থাকলেন। তিনি দেখলেন, মিনজানিকগুলো প্রাচীরের উপরে উঠে গেছে এবং সেখান থেকে পুনরায় প্রস্তরনিক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে।

একটি কথা আগেই বলা দরকার ছিল; কিন্তু বলা হয়নি। এখন বলছি। কুস্তুন্তিন রোমসাম্রাজ্যের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিল এবং নিজের রাজপরিবার ও সাম্রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রত ছিল। কাজেই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া যায় সেটিই ছিল তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মনোনীত প্রধান বিশপের কথা হঠাৎ কুস্তুন্তিনের মনে পড়ে গেল। কিন্তু হেরাক্‌ল তারও উপর অবাধ্যতার অভিযোগ আরোপ করে মুকাওকিসের সঙ্গে দেশান্তরিত করে দিয়েছিলেন। তার জন্য আদেশ ছিল, ওকে ডান্ডা-বেড়ি ছাড়া-ই মুক্তভাবে দেশ থেকে বের করে দাও।

দেশান্তরের পর কায়রাস কোথায় গিয়েছিলেন কুস্তুন্তিনের জানা ছিল কি-না। কুস্তুন্তিন তার সন্ধানে একজন দূত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সাথে একটি বার্তা দিয়েছিল, সম্রাট হেরাক্‌ল মারা গেছেন। আমি আপনার দেশান্তরের সাজা রহিত করে দিলাম। আপনি অবিলম্বে বাজিন্তিয়া চলে আসুন। কুস্তুন্তিন দূতকে ভালোমতো বলে দিল, যে করে হোক কায়রাসকে বুঝিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, দূত কায়রাসকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল এবং কায়রাস বাজিন্তিয়া ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এটি হলো পরের কথা। প্রথমে আমি এর আগের কাহিনী শোনাতে চাই।

এখন ব্যবিলনের বাইরের অবস্থা হলো, যখন রোমান মিনজানিক ও তিরন্দাজরা দুর্গের ভেতরে চলে গেল, তখন মুজাহিদগণ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পরিখা দেখতে লাগল। তিরন্দাজদের উপস্থিতিতে তাঁরা পরিখার কাছেও ঘেঁষতে পারছিলেন

না। কারণ, তখন মুষলাধারা বৃষ্টির মতো তির আসছিল। এবার মুসলমানরা পরিখা অতিক্রম করা যাবে কি-না দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

দেখে মুজাহিদরা বিস্ময়ে থ বনে গেলেন যে, রোমানরা পরিখাটিকে অনতিক্রম্য বানিয়ে দিয়েছে! পরিখায় পানি এক ফোঁটাও নেই। কিন্তু পুরোটা পরিখার সবটুকু জায়গা কাঁটাযুক্ত তারের গোছা দ্বারা পরিপূর্ণ। সেগুলো ছাড়াও পুঁতে রাখা হয়েছে লোহার চোখা-চোখা শলাকা। যদি পরিখায় পানি থাকত আর তা পানিতে টইটম্বুর থাকত, তবু সাঁতার কেটে পার হওয়া যেত। কিন্তু রোমানরা যা করে রাখল, তাতে পা রাখার সাহস দেখানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অবরোধের বয়স আট মাস পেরিয়ে গেছে। মুজাহিদদের মাঝে হতাশা বা মনোবল হারানোর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সিপাহসালার ও অন্যান্য সালারদের মাঝে ব্যাকুলতা তৈরি হতে শুরু করেছে। পরিখা এতই চওড়া যে, ভেতরে এত বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকতে তা অতিক্রম করার চিন্তা করাও অসম্ভব। কিন্তু তারপরও তাঁরা ছাড়তে রাজি নন। যে করে হোক এই পরিখা অতিক্রম করতেই হবে।

এবার দেখুন, হাড়-মাংসের একজন মানুষ কী অলৌকিক কীর্তি প্রদর্শন করেন।

* * *

ইনি হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত ভাই হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)। আরবের বীর যোদ্ধাদের একজন। নবীজি বলেছেন, 'সব নবীরই একজন বিশেষ সহচর থাকে। আমার বিশেষ সহচর হলো আওয়াম-এর পুত্র যুবাইর।'

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) ব্যবিলন অবরোধে যখন দেখলেন, পরিখা পার হওয়ার আর কোনো উপায় নেই, তখন এক রাতে তিনি কয়েকজন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে চার-পাঁচটা গাছের বড়-বড় ডাল কাটলেন। তারপর এই ডালগুলো পাতাসহ টেনে পরিখার কাছে নিয়ে এলেন এবং পরিখার কাটাযুক্ত তারের গোছা ও চোখা শলাকাগুলোর উপর এমনভাবে ছুড়তে শুরু করলেন যে, ডালগুলো এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিছিয়ে গেল। এভাবে তিনি পরিখা অতিক্রম করার চমৎকার একটা পথ তৈরি করে নিলেন।

সেরাতেই তিনি সমস্ত মুজাহিদকে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন : 'তোমরা স্মরণ করো আমাদের খালেদ ইবনে অলীদ-এর সেই কীর্তি, যেটি তিনি দামেশকে প্রদর্শন করেছিলেন। স্মরণ করো, সা'দ ইবনে আসী ওয়াক্কাস-এর সেই বীরত্ব, যা তিনি মাদায়েনে দেখিয়েছেন। নাহাওন্দে নুআইম ইবনে মুকরিন যে কৃতিত্ব

দেখিয়েছিলেন, তার কথাও তোমরা মনে করো। কে আছ, যে বীরত্ব ও জানবাজিতে এদের থেকে পিছিয়ে থাকতে চাও? তোমাদের মাঝে কি এমন একজনও লোকও নেই, যে আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার চেতনা লালন করছ?'

'আমি আছি'– সমস্ত মুজাহিদ একসঙ্গে বলে উঠলেন– 'আমরা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। বলুন সেনাপতি! আমাদের কোন কীর্তি দেখাতে হবে?'

'আমি আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করছি'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'আল্লাহ আমার এই কুরবানিকে মুসলমানদের বিজয়ের উসিলা বানান।'

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) এতটুকু কথা বলে মুজাহিদদের জোশ-জযবাকে স্ফুলিঙ্গ বানিয়ে দিলেন। তাঁরা এখন পরম ব্যাকুলতার সাথে জানতে চাচ্ছে, আমাদের কী করতে হবে বলুন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে গেলেন। বললেন, দুর্গ আক্রমণের জন্য আমি মুজাহিদদের একটি ইউনিট তৈরি করে নিয়েছি। তারপর সিপাহসালারকে তাঁর পুরো পরিকল্পনার বিবরণ দিলেন।

ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান পরিচালনায় আমর ইবনে আস (রাযি.) একজন বিখ্যাত সেনানায়ক ছিলেন। তিনি দেখে নিয়েছিলেন, ব্যবিলন দুর্গ জয় করতে হলে অনেক বড় ঝুঁকি বরণ করে নিতেই হবে। আর সেই ঝুঁকি এখন যুবাইর ইবনুল আওয়াম নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) অনুমতি দিয়ে দিলেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম সেই জায়গাটিতে ফিরে এলেন, যেখানে তিনি পরিখায় গাছের ডাল ফেলে রাস্তা তৈরি করেছেন। এখন সেখানে অনেক মুজাহিদদের সমাগম। সবাই তাঁরা আপন-আপন জীবন উপস্থাপন করতে এসেছেন। সবাই উদগ্রীব, ব্যাকুল যে, আমাদের কী করতে হবে!

সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম এক ইউনিট সৈনিক আলাদা করে নিলেন এবং তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। পরিকল্পনাটা ছিলই এমন যে, শাহাদাত নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছিল। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর নিদের্শনা অনুসারে মুজাহিদগণ সিঁড়িগুলো একত্রিত করে নিলেন এবং দুটি করে সিঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে নিলেন।

ছয়

কাজটা রাতের অন্ধকারে হচ্ছিল। অমানিশা মুজাহিদদের সুবিধা দিচ্ছিল যে, সামান্য দূর থেকেও তাঁদের দেখার কোনো জো ছিল না। অবশ্য তাতে শঙ্কাও ছিল প্রচুর। বিজয় তাঁদেরই ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়, যারা নমরুদের আগুনে নিঃশঙ্ক মনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করছিলেন। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন যে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম-এর মতো একজন সেনাপতি তিনি পেয়ে গেছেন। এই জানবাজ ও আত্মত্যাগী সেনানায়কই ব্যবিলন দুর্গ পদানত করার অভিযানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনীতে এক দল নারীও ছিলেন, যারা বাহিনীর পশ্চাতে অবস্থান করতেন। তাদের বেশির ভাগই ছিলেন কোনো-না-কোনো মুজাহিদের স্ত্রী। এক-দুজন মুজাহিদরে মা-ও সঙ্গে ছিলেন। আবার দু-চারজন বোন-কন্যাও। তারা কোনোভাবে জেনে গেছেন, মুজাহিদগণ পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারা কাছে আরও তথ্য পেয়েছে, ব্যবিলনের চারদিকে যে-পরিখাগুলো আছে, সেগুলো ব্যতিক্রধর্মী ও দুর্গম। মুজাহিদগণ পরিখা কীভাবে অতিক্রমের চেষ্টা চালাচ্ছেন, তা-ও সংবাদদাতার মাধ্যমে তারা অবগত হয়েছেন। শুনে বিশ-পঁচিশজন শক্ত-সামর্থ্য যুবতী মেয়ে সেদিকে ছুটতে শুরু করল, যেখান থেকে পরিখা অতিক্রম করা হচ্ছিল। সঙ্গে তারা কয়েকটা সিঁড়ি এবং পরিখা অতিক্রম করার আরও কিছু সরঞ্জাম নিয়ে নিল।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাদের ধাবমান পায়ের ও কথা বলার আওয়াজ শুনে নিজেই দৌড়ে গেলেন এবং মেয়েগুলোর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী নিতে এসেছ? সঙ্গে তাদের সাবধান করে দিলেন, শব্দ করে কথা বলো না; একদম চুপ থাকো। এক মেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের মনোবাঞ্ছার কথা ব্যক্ত করল।

'এক্ষুনি চুপচাপ এখান থেকে ফিরে যাও'– আমর ইবনে আস বললেন– 'একটা সেকেন্ডও এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। প্রয়োজন হলে আমরা-ই তোমাদের ডেকে পাঠাব।'

'সিঁড়িগুলো এবং এই সরঞ্জামগুলো তুলে সামনে নিয়ে যেতে দিন'– মেয়েটি বলল– 'পেছনে আমরা তাঁবুতে বেকার পড়ে আছি। এভাবে কর্মহীন জীবন কাটাতে একদম ভালো লাগছে না।'

আমর ইবনে আস (রাযি.) খানিক কঠিন গলায় বললেন, না; তোমরা ফিরে যাও। পরিখা অতিক্রম করা পুরুষ মুজাহিদদের পক্ষে এমন কোনো কঠিন কাজ নয় যে, তাতে মহিলাদের সহযোগিতা নিতে হবে। একাজ তারা আগেই বহুবার করেছে। আর দাঁড়িয়ে না থেকে তোমরা এক্ষুনি ফিরে যাও।'

'মাত্র সাত-আট হাজার সৈনিক দ্বারা আপনি কী আর কাজ নেবেন?'– আরেক মেয়ে বলল– 'আমাদের শরীরেও আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন। এটি কোনো কাজে তো লাগাতে হবে। স্রেফ ময়দান থেকে লাশ তুলে আনা আর আহতদের তুলে পেছনে সরিয়ে আনা– এ-ই তো আমরা করছি। এ আর তেমন কী কাজ! এই পরিখা সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা আছে। সামনে গিয়ে পুরুষদের লড়াই করতে হবে। আমরা যা পারব, তা আমাদের করতে দিন।'

'তোমাদের করার মতো শুধু একটি কাজই আছে। এখনই ফিরে যাও আর কাজটি শুরু করে দাও। সবাই অজু করে নফল নামায পড়ে আমাদের সফলতার জন্য দু'আ করো। এই সাহায্যটির আমাদের খুবই প্রয়োজন।'

মেয়েগুলো ফিরে চলে গেল। কিন্তু মুখে তাদের হতাশার ছাপ। তাঁবুতে গিয়ে অজু করে সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে গেল।

* * *

এদিকে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আমর ইবনে আস এতটা-ই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন যে, একজন সৈনিকের রূপ ধারণ করে তিনি মুজাহিদদের সঙ্গে কাজ করছেন। ওদিকে দুর্গের অভ্যন্তরে রোমক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থিওডোর নিজেকে হেরাক্ল-এর মতো রাজ ভেবে বসে আছেন। মুকাওকিসের পর তিনিই এখন মিশরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এখন মধ্যরাত। তার শয়নকক্ষে একটা তরুণী মেয়ে বসে-বসে তার অপেক্ষা করছে।

থিওডোর অপর এক কক্ষে অবস্থান করছেন। সঙ্গে তার দুজন সেনাপতি আর চার-পাঁচজন সেনাকর্মকর্তা। তাদের একজন সেনাপতি জর্জ, যে কিনা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় তার সমশ্রেণির।

সেনাপতি থিওডোরের মাথায় এখন শুধুই রানি মরতিনা আর সেই পুরস্কার, মরতিনা তাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিজেকে এখন তিনি মুকাওকিসের স্থলাভিষিক্ত ভাবছেন। মানে এখন তিনি মিশরের গভর্নর। সঙ্গে উপবিষ্ট

সেনাকর্মতাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, এই আরব বাহিনীটা ব্যবিলন দুর্গের পাঁচিলের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

এমন দাবির পেছনে তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। দুর্গটিকে অজেয় বানাতে যা-যা করা আবশ্যক ছিল, তার সবই তারা করেছে। এর জন্য তারা যে-পরিখা খনন করে রেখেছে, সেটিও তারা অনতক্রিম্য বানিয়ে রেখেছে। এই পরিখা অতিক্রম করে এমন একটা দুর্গ জয় করা বহিরাগত কোনো বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব মনে করা-ই স্বাভাবিক। শুধু থিওডোরই নন; তার ছোট-বড় সকল অফিসার ও গোটা বাহিনীরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, মুসলমানদের পরিখার বাইরেই থাকতে হবে। তাদের কাছে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে তারা পরিখা অতিক্রম করতে পারে। এই বিশ্বাস তাদের খুবই আরামদায়ক স্বস্তি সরবরাহ করছিল।

থিওডোর তার উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাদের মিটিং তলব করে রেখেছেন। দুটা অর্ধনগ্না সুন্দরী যুবতী তাদের মদ পরিবেশন করছে। সুরা তার ক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে।

'বাজিন্তিয়া থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা যদি কারো থাক, সেই আশা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও'– থিওডোর বললেন– 'আমি পরিষ্কার বুঝে ফেলেছি, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সহযোগী বাহিনী পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এখন তার পুত্র কুস্তুন্তিন এই কর্তব্যটি পালন করতে পারে। কিন্তু আমি তার থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা রাখি না। বাজিন্তিয়া থেকে আমি যে-খবরাখবর পেয়েছি, সেসব আমাদের জন্য ও মিশরের জন্য শুভ নয়। কুস্তুন্তিন সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার চেষ্টায় আছে। রানি মরতিনা আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। হেরাক্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত শুধু তিনি-ই হতে পারেন এবং হওয়াও উচিত তারই। কুস্তুন্তিন আমাদের সাহায্যে বাহিনী পাঠাবে এমন আশা পোষণ করা যাবে না। অবশ্য রানি মরতিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমাদের জন্য বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটি সহযোগী বাহিনী পাঠাবেন। কিন্তু তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। সম্রাট হেরাক্‌ল-এরও মিশরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তার পুত্র কুস্তুন্তিনেরও নেই। তার সবটুকু মনোযোগ স্রেফ সিংহাসনের উপরই নিবদ্ধ। একটা প্রত্যয় মাথায় ঢুকিয়ে রাখো এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও যে, এই মুষ্টিমেয় মুসলমানকে এখানেই পরিখার বাইরে নাস্তানাবুদ করে দিতে হবে। আমি মিশরের ভেতর থেকেই সহযোগী বাহিনী চেয়ে পাঠাচ্ছি।'

'আরবের এই বদ্দুরা শেষ পর্যন্ত কতদিন অবরোধে বসে থাকবে!'– মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে সেনাপতি জর্জ বলল– 'ওদের কটা দিন বসে থাকতে

দিন। আমরা তাদের সবগুলো রসদের পথ বন্ধ করে দিচ্ছি। লোকগুলো যখন না খেয়ে মরতে শুরু করবে, তখন পেছন থেকে আক্রমণ চালিয়ে সব কটাকে মেরে ফেলব।'

'মিশরে আমাদের সৈন্যের অভাব নেই'– থিওডোর বললেন– 'এই আরবগুলোকে খানিক কাবু হতে দাও। এখনও ওরা জয়ের নেশায় পাগলপারা। অল্প কটা দিন পরেই এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে ওরা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।'

এটা রোমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মিটিং ছিল বা মদের আসর– এখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, মুসলিম বাহিনী পরিখা অতিক্রম করতে পারবে না, মিশর থেকেই সাহায্য আসবে, মুজাহিদদের রসদের পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাদের উপর পেছন থেকে আক্রমণ চালানো হবে। রোমান অফিসাররা সঙ্গত কারণেই তাদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিল এবং পরিকল্পনাও ছিল যথাযথ। হেরাক্‌ল মুকাওকিসের উপর অভিযোগ আরোপ করেছিলেন, মিশরে রোমের এক লাখ সৈন্য আছে আর তুমি এসেছ সন্ধিচুক্তিতে আমার সম্মতি নিতে! কথাটা ভুল ছিল না। মুকাওকিস সেই বাহিনীর অল্পই যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। এখন থিওডোর গোটা বাহিনীকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা স্থির করে নিয়েছেন। এক লাখ সৈন্যের একটি বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র সাত-আট হাজার সৈন্যের ক্ষুদ্র একটি বাহিনী! কল্পনা করা যায়?

মধ্যরাতে এই আসর ভেঙে গেল। অফিসাররা উঠে যার-যার মতো বিদায় নিয়ে চলে গেল। থিওডোরের শয়নকক্ষে যে-মেয়েটা অপেক্ষার প্রহর গুণছিল, ঘুমের সঙ্গে না পেরে সে পালঙ্কের উপর শুয়ে পড়েছে। মেয়েটা মুকাওকিসের হেরেমের শোভা নয়। তার কোনো হেরেম ছিলও না। এ এক গরিব মা-বাবার কন্যা। মেয়েটা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি, কোনো রাতে ও রাজপ্রাসাদের কারুর শয়নকক্ষের শোভা হবে। তার জন্ম ও লালন-পালন গরিবের ঘরে। কিন্তু আল্লাহ তাকে অপরূপ সৌন্দর্য দ্বারা ধন্য করেছেন। চেহারায় তার নিষ্পাপতার যে-ছাপ বিরাজমান, তা তার সৌন্দর্যকে জাদুকরী বানিয়ে রেখেছে।

থিওডোর এই তরুণী মেয়েটাকে কোথাও দেখেছিলেন। তার চোখদুটো যেন মেয়েটার উপর আটকে গিয়েছিল। তিনি মেয়েটাকে দেখতেই থাকলেন। সঙ্গে তার এক অফিসার ছিল। সে বলল, মেয়েটাকে যখন আপনার এতই ভালো লেগেছে, তখন চাইলে আমি রাতে ওকে আপনার শোওয়ার রুমে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। থিওডোরের ঠোঁটে শয়তানি হাসি ফুটে উঠল। তিনি মাথা দুলিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, ঠিক আছে; তা-ই হোক।

মেয়েটাকে রাতের প্রথম প্রহরেই থিওডোরের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। তাকে অপহরণ করা হয়নি; জোরপূর্বকও তুলে আনা হয়নি। কাজেই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, তার পিতাকে এত পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়েছে, যা সে কল্পনায়ও কোনোদিন দেখেনি। এই গরিব পিতাকে বোধহয় স্বপ দেখানো হয়েছিল, জেনারেল থিওডোর তোমার মেয়েকে বিবাহ করে নেবেন, যিনি অল্প কদিন পরই মিশরের গভর্নর হতে যাচ্ছেন।

পৌঢ় বয়সের সেনাপতি থিওডোর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন, মেয়েটা তার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা আপন-আপন কক্ষে গভীর ঘুমে অচেতন। এমন কোনো আশঙ্কা নেই যে, একটা মেয়ে তার ঘরে এসেছে জানতে পারলে তার স্ত্রী হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেবে। ওদিকে স্ত্রীও স্বাধীন, এদিকে তিনিও স্বাধীন। এটি সেই সমাজের সবচেয়ে উঁচু শ্রেণি, যাদের মাঝে লজ্জা-শরম বলতে কিছু ছিল না। তৎকালের একজন পুরুষ যেকোনো নারীকে আপন ঘরে এনে রাখা অধিকার বলে স্বীকৃত ছিল।

মেয়েটা অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত রূপসী তরুণীটাকে দেখতে থিওডোরের খুবই ভালো লাগল। মদের নেশা আর সেইসঙ্গে এই রূপের রানি মেয়েটা থিওডোরকে আত্মহারা করে তুলল। তিনি অনেকক্ষণ যাবত দাঁড়িয়ে ঝুমতে থাকলেন আর মেয়েটাকে দেখতে থাকলেন। ও তো তার জন্য একটা খেলনা, যার সঙ্গে যেমন খুশি খেলতে পারে। এবার তিনি মেয়েটার রেশমি চুলে হাত বুলিয়ে আলতোভাবে নাড়া দিলেন।

মেয়েটা হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে সজাগ হয়ে গেল এবং ধড়মড় করে উঠে বসল। তার নিষ্পাপ মুখে ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। কিন্তু থিওডোরের ঠোঁটে আদুরে হাসির রেখা দেখে ভয় খানিকটা কমে গেল। থিওডোর মেয়েটার শিয়রে বসে পড়লেন। তিনি মমতার সাথে দু-একটা কথা বললেন এবং এমন কিছু কাজ করলেন যে, মেয়েটা তার আচরণে আপনতা অনুভব করতে লাগল।

'আমাকে এভাবে ভয় করো না মেয়ে!'– থিওডোর বললেন– 'আমার মন তোমাকে পছন্দ করেছে। আমি তোমাকে মিশরের রানি বানাব। বলো, তুমি মিশরের রানি হবে না?'

মেয়েটা উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে শিশুর মতো হেসে উঠল। ও বোধহয় বুঝতে পারেনি, লোকটা মাতাল এবং ভোরনাগাদ ভুলে যাবে, রাতে কী বলেছিল। থিওডোর তার উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে মমতার সঙ্গে তাকে মুঠোয় আনতে থাকলেন।

কয়েকটা কথা আর গোটাকতক প্রেমময় আচরণের পরই মেয়েটা থিওডোরের সঙ্গে অকপট হয়ে গেল। আলাপচারিতায় আরবের মুসলমানদের প্রসঙ্গও উঠে এল। থিওডোর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করলেন। মেয়েটার পিতামাতা কিবতি খ্রিস্টান। ধর্মের প্রশ্নে খুবই আবেগপ্রবণ ও কট্টর। ফলে মেয়েটার চিন্তাধারায়ও তার প্রভাব আছে।

'আমি একজন মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরিয়ে দিতে পারি'– মেয়েটা বলল– 'সে আমাকে খুব ভালবাসে। আমারও তাকে অনেক ভালো লাগে। আমি জানি, সে আরবের সেই বাহিনীটির গোয়েন্দা, যারা আমাদের শহরটাকে অবরোধ করে রেখেছে। কিন্তু আমি তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাচ্ছিলাম না। কারণ, সে আমার জীবন রক্ষা করেছে।'

'তা হলে এখন মুখ খুললে কেন?' থিওডোর জিজ্ঞাসা করলেন।

'বুঝি, আমি তার সঙ্গে গাদ্দারি করছি'– মেয়েটি বলল– 'কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করলাম, যদি আমি তাকে ধোঁকা না দেই, তা হলে এটা আমার ধর্ম, জাতি ও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে।'

এই মুসলমান লোকটি কবে থেকে এখানে আছে এবং কোথায় থাকছে মেয়েটা তা-ও বলে দিল।

'শাবাশ!'– থিওডোরের মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠল– 'ভালবাসা ও আবেগের কুরবানি জীবনের কুরবানির চেয়ে অনেক বড়। আমি তোমার চেতনার মূল্যায়ন করি এবং এর উপযুক্ত বিনিময় আমি তোমাকে দেব। সকালে দেখবা, সূর্য ওঠার আগেই এই মুসলমান গোয়েন্দা হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় এখানে দণ্ডায়মান। আর তোমার চোখের সামনেই তার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে ছুড়ে ফেলা হবে।'

মেয়েটা স্বপ্ন ও কল্পনায় মিশরের রানি হয়ে গেল এবং নিজেকে থিওডোরের হাতে সমর্পণ করে দিল।

* * *

কে ছিল এই মুসলমান গোয়েন্দা?

তার নাম আওসামা ইবনে আযহারি। বয়স চব্বিশ থেকে পঁচিশ। তার পিতা মুছান্না ইবনে হারিছার বাহিনীতে ছিলেন, যেটি ইরানে কেসরার বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করছিল। একযুদ্ধে ইনি শহীদ হয়ে গেছেন। আওসামার একজনই বড় ভাই ছিলেন, যিনি শামের যুদ্ধে হেরাক্‌ল-এর বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পেছনে রয়ে গেছেন শুধু আওসামা আর তার মা।

মা চিন্তা করলেন না, আমার আর তো কেউ নেই– স্বামী গেছেন, বড় ছেলে গেছে। কাজেই একমাত্র এই ছেলেটাকে আমি যুদ্ধে পাঠাব না; এও যদি চলে যায়, আমি বাঁচব কী করে। বরং স্বামীর পর যখন বড় ছেলে শহীদ হয়ে গেল, তখন আওসামাকে বললেন, বাবা! বড় ভাইয়ের অভাবটা তুমি পূরণ করো। আমি আর কাকে জিহাদে পাঠাব; আমার আছে আর কে তুমি ছাড়া? তুমি জিহাদে চলে যাও।

এভাবে আওসামা রোমানবিরোধী লড়াইয়ে যুক্ত হয়ে গেল এবং তার মা-ও তার সঙ্গে চলে এলেন।

সালারগণ দেখে অনুভব করলেন, আওসামা ছেলেটার মাঝে বিশেষ এক ধরনের প্রতিভা আছে। তাঁরা একে গোয়েন্দাবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিলেন। আওসামা খুবই সুদর্শন যুবক। কথা বলে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ভঙ্গিতে। যখন যেমন প্রয়োজন, তেমন বেশ ধারণ করার যোগ্যতা তার সহজাত। প্রথমবার যখন তাকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠানো হলো, এমন বেশ ধারণ করল যে, এক রোমান সেনাকর্মকর্তার সেবক হয়ে গেল। মাসদেড়েক পর যখন ফিরে এল, তখন সঙ্গে করে অনেকগুলো মহামূল্যবান তথ্য নিয়ে এল। অবশেষে তাকে আমর ইবনে আস-এর বাহিনীতে যুক্ত করে দেওয়া হলো, যারা মিশর-অভিযানে রওনা হয়েছিল।

মিশরেও সে গুপ্তচরবৃত্তির অঙ্গনে অনেকগুলো সাফল্য অর্জন করেছে, যেগুলো সিপাহসালারের অনেক কাজে এসেছে। এবার সে ব্যবিলনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। একবার ফিরে এসে সিপাহসালারকে তথ্য দিল, নগরীতে রোমান বাহিনীর মানসিক অবস্থা কেমন এবং নগরবাসী কী চিন্তা করছে। এ ক্ষেত্রে সিপাহসালারের জন্য সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে।

তারপর আবারও ছদ্মরূপ ধারণ করে সে ব্যবিলনের অভ্যন্তরে চলে গেল এবং এক খ্রিস্টার ব্যবসায়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্যে পরিণত হয়ে গেল। এবার গেছে সে খ্রিস্টান সেজে। তথ্য সংগ্রহ করে তাড়াতাড়িই ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী ব্যবিলন অবরোধ করার কারণে তার ফিরে আসা খুবই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। সে চিন্তা করল, এই পরিস্থিতিতে এমন ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বরং আমি এখানেই থেকে যাই এবং নিজের বাহিনীকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি সেই পথ বের করি। সে এমনও চিন্তা করেছিল, মুসলিম বাহিনী যখন দুর্গে আক্রমণ চালাবে, তখন আমি জীবনের বাজি লাগিয়ে নগরীর কোনো-না-কোনো একটি ফটক খুলে দিতে চেষ্টা করব।

এ সেই মুসলিম গোয়েন্দা, মেয়েটি জেনারেল থিওডোরের কাছে যার তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল। মেয়েটি বলেছিল, আমরা দুজনই দুজনকে ভালবাসি। এই হৃদ্যতা তৈরি হয়েছিল একটি ঘটনার সূত্র ধরে।

বড় একটা পালতোলা নৌকা ব্যবিলন থেকে দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল, যেখানে রাওজা দুর্গ অবস্থিত। আওসামা তার মনিবের এক কাজে দ্বীপে যাচ্ছিল। ওদিকে ছিল নীলনদ। সেজন্য নগরীর ওই দিকটা অবরোধ থেকে নিরাপদ ছিল। দ্বীপ ও ব্যবিলন নগরীর মাঝে নদীপথে আনাগোনা চলতেই থাকত। যাত্রীবাহী এই নৌকাটা বেশ বড়সড় ছিল। তাতে বেশ কিছু মালপত্রও ছিল, কয়েকটা ঘোড়াও ছিল।

এটি তিন-সাড়ে তিন মাস আগের ঘটনা, যখন নীলে জোয়ার এসেছিল। জোয়ারের বেশি তোড়জোড়-উথাল-পাথাল নদীর মধ্যখানে ছিল। নৌকাটা মাঝনদীতে পৌঁছার পর মাঝি দেখতে পেল না, পানির স্ফীতি বেড়ে গেছে এবং ঢেউগুলোও বেশিই উপর-নিচ হচ্ছে। নৌকাটা যখন ওখানে গেল, তখন তরঙ্গমালা তাকে তুলে-তুলে আছাড় দিতে লাগল। একবার নৌকার গতিই বদলে গেল এবং তীব্র বায়ু পালগুলোকে মাল্লাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেল।

নৌকার একটা পাশ এতখানি ঝুঁকে গেল যে, মনে হলো, যেন ওই দিকটা পানির মধ্যে তলিয়ে গেছে। একটা কিশোরী মেয়ে– যে ওই দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিল– নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো এবং নদীতে ছিটকে পড়ল। মেয়েটার ডুবে মরা নিশ্চিত– বাঁচার কোনো উপায় নেই।

মেয়েটার পিতাও তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু আমার মেয়েটাকে বাঁচাও বলে হাঁক-চিৎকার, কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় করা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না।

আওসামার স্বভাবে ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার মতো উপাদান ছিল। সেইসঙ্গে ছিল মানবীয় সহমর্মিতার চেতনা। সে সাত-পাঁচ কিছুই ভাবল না এবং মেয়েটার পেছনে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঊর্মিমালা মেয়েটাকে তুলে-তুলে ছুড়ে মারছিল এবং সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

আওসামা টগবগে যুবক ছেলে। শরীরে অপার শক্তি আছে। সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী তার মানবপ্রেমের চেতনা। সে নিজের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে সাঁতরাতে-সাঁতরাতে এগিয়ে গেল। স্রোত তাকে একাজে সহযোগিতা করছিল।

মাঝি নৌকা থামাল না। তারা পালগুলোকে কাবুতে রেখে নৌকাটা মাঝনদী থেকে বের করে নিয়ে গেল। আওসামা মেয়েটার কাছে পৌঁছে গেল এবং তাকে নিজের পিঠে তুলে নিল। এবার ঘটনার একটি যারপরনাই ঝুঁকিপূর্ণ পর্ব শুরু

হলো। তা হলো প্রবল জোয়ারের তোড় থেকে বেরিয়ে আসা। অনেক দূরে গিয়ে আওসামা ঢেউয়ের কবল থেকে বেরিয়ে এল এবং সম্মুখের কূলে গিয়ে ভিড়ল। সে আরও কিছু সময় সাঁতরাতে পারত। কিন্তু মেয়েটা পিঠে থাকায় তার বাহুদুটো অবশ হয়ে আসছিল। তার ও মেয়েটার সৌভাগ্য যে, ইতিমধ্যেই তারা কূলে এসে পড়েছে। আওসামা মেয়েটাকে নীলের মুখ থেকে বের করে নিয়ে এল।

নদীর কূল ঘেঁষে-ঘেঁষে ছোট-ছোট ডিঙি নৌকা চলছিল। তারই একটাতে করে আওসামা মেয়েটাকে দ্বীপে নিয়ে গেল। ওখানে গিয়েই মেয়েটার পিতাকে পাওয়া গেল। তিনি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন, মেয়ে তার পানিতে ডুবে মরে গেছে। এখন মেয়েকে চোখের সামনে দেখে আওসামাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, তুমি ব্যবিলনে আমার বাড়ি এসো। আওসামা মনিবের কাজ সেরে তাদেরই সঙ্গে ব্যবিলন ফিরে এল।

আওসামা প্রথমবার মেয়েটির ঘরে এলে তাকে তারা সাদরে বরণ করে নিল। মেয়েটি তো যেন তার জন্য জীবনই দিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটিকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। আওসামা সদ্য যুবক ও অবিবাহিত। হৃদয়ে তার মেয়েটির এমন একটি ভালবাসা তৈরি হয়ে গেল, যা মানুষকে অপারগ ও অক্ষম করে তোলে এবং আপন পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেয়। এখান থেকে দুজনের যোগাযোগ ও সাক্ষাতের ধারা শুরু হয়ে গেল।

থাকার জন্য আওসামার মনিব তাকে ছোট্ট একটা ঘর দিয়েছিল। মেয়েটি তার কাছে ওখানে চলে যেত। একদিন আবেগের আতিশয্যে আওসামা মেয়েটিকে বলে ফেলল, তোমাকে আমি আরব নিয়ে যাব। মেয়েটি পরম বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করল, আরব যাবে কেন?

আওসামা নিজেকে তার কাছে খ্রিস্টান পরিচয় দিয়েছিল।

মেয়েটির প্রশ্নে আওসামার সম্বিৎ ফিরে এল। সহসা থতমত খেয়ে বলল, না; মানে এমনিতেই বললাম আর কি। সে এদিক-ওদিককার অনেক কথা বলল। কিন্তু বলা কথা ফিরিয়ে তো আর আনা যায় না। বুদ্ধিমতী মেয়েটির মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গেল, আওসামা মূলত অন্য কিছু। একটি খ্রিস্টান মেয়ের কাছে মুসলিম গোয়েন্দা আওসামার গোপনীয়তা ধরা খেয়ে গেল।

মেয়েটির রূপ আর বয়স এমনই ছিল; আবার সে এমন কিছু কথাও বলল যে, আওসামাকে তার রহস্য ফাঁস করতেই হলো। দুজনের ভালবাসা এমনই যে, মেয়েটি ধোঁক দেবে এমন কোনো সংশয় আওসামার মনের ধারে-কাছেও ছিল

না। মেয়েটি তাকে শপথ করে বলল, তোমার এই রহস্য আমি আমার বুকের মাঝে দাফন করে ফেলব।

আওসামা খোলামেলা সব কথা বলে দিল। মেয়েটি প্রতিশ্রুতি দিল, আমি মুসলমান হয়ে যাব এবং তোমার সঙ্গে আরব চলে যাব। তার অন্তরে এমন এক নদীভীতি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, প্রবহমান পানি দেখেও ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। আওসামাকে সে নিজের রক্ষী ভাবতে শুরু করেছিল।

মেয়েটির উপর আওসামার আস্থা ছিল বটে; কিন্তু একটি অনুভূতি তাকে অস্থির করে রাখছিল যে, সে নিজের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিল! মেয়েটিকে নিজের কাবুতে রাখতে আওসামা তার মনে রোমানদের প্রতি ঘৃণা তৈরির চেষ্টাও করেছিল। সম্রাট হেরাক্‌ল ও তার ধর্মযাজক কায়রাস কীভাবে কিবতি খ্রিস্টানদের গণহারে হত্যা করেছিল, তারও রোমহর্ষক বিবরণ শোনাল। মেয়েটিকে সে বোঝাতে চেষ্টা করল, রোমানদের রাজত্ব অটুট থাকলে এখানকার একজন কিবতিকেও তারা জীবিত রাখবে না। বিপরীতে যদি মুসলমানরা জয়ী হয়, তা হলে সব নাগরিক আপন-আপন ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করবে।

কিবতি খ্রিস্টানদের উপর রোমানদের নির্যাতন-নিপীড়নের কাহিনী মেয়েটির ভালোভাবেই জানা ছিল। কিন্তু বয়সটা তার কাঁচা। বুদ্ধিও অপরিপক্ব। থিওডোর তার নিষ্পাপতা ও সরলতার সঙ্গে খেলতে গিয়ে কথার তুরুপ ছাড়ল, আমি তোমাকে মিশরের রানি বানাব। অমনি মেয়েটি তার মুঠোয় চলে গেল। থিওডোর যখন মিশর ও মুসলমানদের কথা তুললেন, তখন মেয়েটি বোকামিবশত আওসামার পরদা উন্মোচিত করে দিল।

* * *

আওসামা তার ঘরে একা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে জানে না, এরাত তার জীবনের শেষ রাত। আবেগতাড়িত হয়ে যে-ভুলটা সে করে ফেলেছে, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তি মূলত আওসামার মাকে ভুগতে হবে। স্বামী শহীদ হয়েছেন। বড় ছেলেও একই পথের পথিক হয়েছে। আছে এখন শুধু এই ছোট ছেলেটা, যে কিনা রাত পোহাবার আগেই থিওডোরের জল্লাদের হাতে প্রাণ দিতে যাচ্ছে! পেছনে শাস্তি ভোগ করতে রয়ে যাচ্ছেন মা। এখানেও মা তার সঙ্গে আছেন এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নির্দেশে অন্যান্য মহিলাদের সাথে নামায পড়ছেন আর মুজাহিদদের বিজয় ও সাফল্যের দু'আ করছেন। তিনি জানেন না, একমাত্র ছেলেটা তাঁর নগরীর অভ্যন্তরে শত্রুর ফাঁদে আটকে গেছে!

ঠিক সেরাতে এবং সেই সময়, যখন মেয়েটি থিওডোরকে অবহিত করছিল, আমি একজন মুসলমান গোয়েন্দাকে ধরিয়ে দিতে পারি আর থিওডোর বলছিলেন, ওকে ধরে এনে আমি তোমার চোখের সামনে হত্যা করাব মুজাহিদগণ সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় সকল বাধা উপেক্ষা করে ব্যবিলন দুর্গের পরিখা অতিক্রম করছিলেন।

দুর্গের পাঁচিলের উপর উঠতে দড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করা যেত। পাঁচিল যদি দুর্বল হতো, তা হলে তাতে ছিদ্রও করা যেত। কিন্তু ব্যবিলন দুর্গের পাঁচিলগুলো খুবই মজবুত এবং অন্যান্য পাঁচিলের তুলনায় বেশি চওড়া ও উঁচু। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুজাহিদগণ উপরে উঠতে দুটা সিঁড়ি বেঁধে নিলেন।

অবরোধের বয়স এখন আট মাস। অবরোধ দীর্ঘ করা আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর নীতি ছিল না। একটা নগরীকে তিনি দিনকতক অবরোধে রেখে আক্রমণ চালাতেন। কিন্তু ব্যবিলনের ব্যাপারটা অন্যান্য দুর্গের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। ভেতরে রোমান সৈন্যদেরই নয় শুধু; বাহিনীর সেনাপতিরা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল, মুসলমানরা পরিখা পার হতে পারবে না। তারা বলাবলি করছিল, যদি পরিখা অতিক্রম করা সম্ভব হতো, তা হলে এই আরব মুসলমানরা একটা দিনও বিলম্ব করত না।

রোমানদের এই বিশ্বাস অযৌক্তিক ছিল না। পরিখাগুলোকে তারা যেভাবে অভেদ্য করে রেখেছিল, তাতে সেগুলো অতিক্রম করা কোনো মানুষের সাধ্যে কুলোনোর কথা ছিল না। এমন কোনো উপায়-উপকরণও ছিল না, যার সাহায্যে পরিখা অতিক্রম করা যায়। এই নিশ্চয়তা-ই রোমান সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকদের রাতে নির্ভাবনায় ঘুমোতে সাহায্য করেছিল। পাঁচিলের উপর পাহারাও তারা বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছিল। টহল সেনারা গতানুগতিক দু-চারটা চক্কর লাগিয়েই ফিরে যেত। বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল থিওডোরের উপরও অমনোযোগিতা ও নির্ভাবনার মুড তৈরি হতে শুরু করেছিল। তিনিও নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত, শত্রুর দিক থেকে আপাতত কোনো আশঙ্কা নেই।

থিওডোর তো পুরোপুরিই আশাবাদী ছিলেন যে, মিশরের ভেতর থেকেই তার জন্য সহযোগী বাহিনী আসছে। আর এসেই তারা পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে। তিনি তার অফিসারদের শুধু বলেনইনি; বরং নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছিলেন, ব্যবিলনের বাইরে পরিখা থেকে খানিক দূরের মাটি মুসলিম বাহিনীর সমাধিতে পরিণত হবে।

রাত অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেছে। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) সবার আগে গাছের গুঁড়িতে পা রেখে ডাল ধরে-ধরে সতর্কতার সাথে এগুতে

শুরু করলেন এবং পরিখা পার হয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন এবং পরিখা থেকে খানিক দূরে গিয়ে মুজাহিদদের নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

'আমার বন্ধুগণ!'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'আমাকে পরিখা পার হতে এবং পুনরায় ফিরে আসতে দেখে মনে করো না, এটি কোনো সহজ কাজ। তোমরা দেখেছ, গাছের ডালগুলো তারের গোছা ও চোখা শলাকার উপর রাখা হয়েছে। শরীরের ভার রেখে এগুতে গেলে সেগুলো ডানে-বাঁয়ে দুলতে শুরু করে এবং খানিক নিচেও বসে যায়। তখন ডালের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু মনে রেখো, কোনো দুর্বল ডাল হাতে এসে পড়লে সেটি ভেঙেও যেতে পারে এবং ডালগুলো নড়ার কারণে নিজের ভারসাম্যও হারিয়ে যেতে পারে। তখন ফলাফল দাঁড়াবে, যদি কেউ পড়ে যায়, তা হলে চোখা শলাকা তার দেহে বিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর পরিখা থেকে তার লাশটা-ই শুধু তুলে আনা যাবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেব। বিজয় ও সাফল্য শুধু তারা-ই লাভ করে, যারা মাথাটাকে উপস্থিত রেখে ঝুঁকি বরণ করে নেয়। ভুলে যেয়ো না, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহও প্রতিশ্রুতিও মনে রেখো যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের সাহায্য করব।...

'কাজেই আমাদের অতি সাবধানে– নিরতিশয় সতর্কতার সঙ্গে পরিখা অতিক্রম করতে হবে। যখন আমরা পরিখার ওপারে চলে যাব, তখন আমরা আরেকটা সমস্যার সম্মুখিন হব। হতে পারে মাঠ একদম পরিষ্কার। হতে পারে একটা সমস্যাও আমাদের অপেক্ষায় ওঁত পেতে আছে। এই যে ঘন বৃক্ষরাজি পরিখা থেকে শুরু করে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে; হয়তবা সেগুলোর আড়ালে বা কোনো গাছের উপরে কিছু রোমান সৈন্য লুকিয়ে আছে। রাতও অন্ধকার। তখন আমরা তাদের তিরের আক্রমণের শিকার হব। তা-ই যদি হয়– মানে যদি কোনো গাছ থেকে একটাও তির আসে, তা হলে পালটা অভিযান চালিয়ে আমরা এই শঙ্কা দূর করে ফেলব। মানে যেকোনো মূল্যে হোক এই অভিযান আমাদের অব্যাহত রাখতেই হবে।'

এসব নির্দেশনার পর সালার যুবাইর (রাযি.) কয়েকজন মুজাহিদকে আলাদা করে বললেন, চার-চারজন কিংবা পাঁচ-পাঁচজন লোক এক-একটা সিঁড়ি বহন করে পরিখা পার হয়ে যাও। মুজাহিদগণ সঙ্গে-সঙ্গে সেনাপতির আদেশ তামিল করলেন এবং তিনটি সিঁড়ি নিয়ে পরিখার দিকে এগুতে লাগলেন। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম সবার আগে-আগে পরিখা অতিক্রম করতে শুরু করলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ডালের উপর পা রেখে ধীরে-ধীরে এগুতে থাকলেন। আল্লাহ তাদের পরিখা পার করিয়ে দিলেন। ওপারে গিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে

গেলেন। যুবাইর (রাযি.) দুজন মুজাহিদকে সামনে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাগানে কোনো রোমান সৈনিক লুকিয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করা। যদি থাকে, তা হলে তারা এদের ধরতে চেষ্টা করবে কিংবা গাছের উপর থেকে তির ছুড়বে।

বিষয়টি যাচাই করতে দুজন মুজাহিদের কুরবানি পেশ করা হলো।

তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন এবং কিছু সময় বৃক্ষরাজির তলে-তলে ঘোরাফেরা করে নিরাপদে ফিরে এলেন। তাতে নিশ্চিত হওয়া গেল, পথ পরিষ্কার। তার মানে এই বাগান ও বৃক্ষমালা মুজাহিদদের সহযোগী হয়ে গেছে। গাছগুলো চমৎকার একটা আড়াল তৈরি করছে, যা প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান রোমানদের দেখতে দিচ্ছে না, কেউ প্রাচীরের দিকে এগিয়ে আসছে। রাত অন্ধকার ছিল বটে; কিন্তু ছায়ার মতো হলেও তো মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়তে পারে।

সিঁড়িগুলোকে পরিখার ওপারে কূলের এক ধারে রেখে যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর জানবাজ ইউনিটটিকে ইঙ্গিত দিলেন, এবার তোমরা এসে পড়ো। সংকেত পেতেই গোটা ইউনিট একজন অপরজনের পেছনে পরিখা পার হয়ে এল। সেনাপতি যুবাইর তাঁদের জনাকয়েক জানবাজকে আলাদা করে বললেন, তোমরা সিঁড়িগুলো তুলে দুর্গের পাঁচিলের কাছে নিয়ে যাও। অবশিষ্ট ইউনিটগুলোকে তিনি ওখানেই থাকতে বললেন এবং পূর্বপ্রদত্ত একটি নির্দেশনা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'আরেকবার শুনে নাও'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন– 'আমরা যখন উপরে উঠে যাব, তখন একবার তাকবিরধ্বনি উচ্চকিত হবে। সেই ধ্বনির পর আমার সঙ্গে যে-মুজাহিদরা যাচ্ছে, তারা উপরে উঠে যাবে। তারপর সবাই মিলে সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলব আর তোমরা সবাই; মানে গোটা বাহিনী দৌড়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসবে।'

পরিখা অতিক্রম করার আগে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে এই তাকবিরধ্বনিগুলো সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যখন তৃতীয়বার তাকবিরধবনি উচ্চকিত হবে, তখন অবশিষ্ট ইউনিটগুলো উপরে উঠে আসবে এবং এই ইউনিটটি আরও সিঁড়ি নিয়ে আসবে, যাতে সবার পাঁচিলে উঠতে বেশি সময় না লাগে। তারপর সিদ্ধান্ত হলো, এই ইউনিটটি যদি নিচে নামতে সফল হয়, তা হলে দুর্গের দু-তিনটা ফটক খুলে দিতে চেষ্টা করবে আর অবশিষ্ট বাহিনী ফটকের পথে ভেতরে চলে আসবে।

এই তাকবিরধ্বনি নিজেই একটা বিপদ ছিল। প্রথম ধ্বনিতেই রোমান বাহিনী সজাগ হয়ে উপরে চলে আসতে পারে। সে-সময় যেকজন জানবাজ মুজাহিদ উপরে থাকবার কথা, বিপুলসংখ্যক রোমান সৈন্য এসে তাদের কেটে পাঁচিলের বাইরে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি বরণ করে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

* * *

তিনটা সিঁড়ি কাছাকাছি প্রাচীরের সঙ্গে লেগে গেল। সেগুলোর দৈর্ঘ্য প্রাচীরের উচ্চতার সমান। এই অভিযানে নীরবতা রক্ষা করা আবশ্যক ছিল, যা সিঁড়ি লাগাতে গিয়ে ভেঙে গেল। সিঁড়ি শব্দ তুলল বটে; কিন্তু উপরে কোনো নড়চড় পরিলক্ষিত হলো না। সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম হাতদুটো উপরে তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ! আমার এই কুরবানিকে তুমি ইসলামের সৈনিকদের বিজয়ের কারণ বানাও।

এই দু'আর পর তিনি সিঁড়িতে পা রাখলেন এবং যেকজন মুজাহিদকে তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার কথা তাঁদেরও উঠে আসতে সংকেত দিলেন। সবার আগে তিনি পাঁচিলের উপর উঠে গেলেন এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। কোনো নড়চড় চোখে পড়ল না। মুজাহিদগণ সিঁড়ি বেয়ে একজন-একজন করে উঠে তাঁর পাশে দাঁড়াতে লাগলেন। সবাই একসঙ্গে আল্লাহু আবার ধ্বনি তুললেন। এবার আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করার জো নেই। সবার আগে দেখতে হবে, ধ্বনি শুনে রোমানরা জেগে ওঠে কিনা।

রোমানরা এতটা উদাসীন তো আর নয় যে, রাতের নীরবতায় এমন উচ্চ ধ্বনিতেও তাদের ঘুম ভাঙবে না। পাঁচিলের উপর যেসব সৈন্যের পাহারা ছিল, তারা টাওয়ারের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। পালাক্রমে সজাগ হতো আর দু-একটা হালকা চক্কর লাগিয়ে ফিরে যেত। এই উচ্চ তাকবিরধ্বনি তাদের জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট ছিল। তারা বর্শা ও তরবারি হাতে নিয়ে ছুটে এল। পাঁচিল বেশ চওড়া ছিল। দুপক্ষে ছোটাছুটি করে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট পরিসর ছিল।

রোমান সৈন্যরা কাছে আসতেই জানবাজ মুজাহিদরা তাদের ঝাঁপটে ধরলেন। তাদের একটা দুর্বলতা ছিল, মুসলমানরা এমন উঁচু প্রাচীরের উপরে কীভাবে উঠে এল ভাবতেই তাদের গা শিউরে উঠেছিল। আরেকটা দুশ্চিন্তা তাদের গ্রাস করে নিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা নিশ্চয় অনেক বেশি হবে। তাতে তাদের ভয় আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না, মুজাহিদরা এ কজনই, যাদের এ মুহূর্তে পাঁচিলের উপরে দেখা যাচ্ছে এবং এদের আসল শক্তি হলো, এরা জীবনের বাজি লাগাতে এবং শাহাদাত বরণ করতে এসেছেন। অবশ্য

তারপরও রোমানরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল। তার একটা কারণ হলো, তারা পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। বাইরে থেকে কেউ পাঁচিলে উঠে আসে কিনা দেখা তাদের কর্তব্য ছিল। যদি মোকাবেলা না করে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়, তা হলে এই অপরাধে তাদের জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে যে, তোমরা কর্তব্য পালন করনি। ফলে লড়াই করেই জীবন দান করা তারা শ্রেয় মনে করল।

এটি একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল। মুজাহিদগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করে লড়াই করছিলেন। তাঁরা সংঘাতে আসা সব কজন রোমান সৈন্যকে টুকরো-টুকরো করে ফেললেন। নিচে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর অবিশষ্ট মুজাহিদগণ তাকবিরধ্বনি শুনে পাঁচিলের কাছে চলে এসেছেন। তাঁরা সবাই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলেন।

এদিকে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) আদেশ দিলেন, সবগুলো সিঁড়ি পরিখার ওপারে নিয়ে যাও এবং আরও তিন-চারটা ইউনিট পরিখা পার হয়ে যাও। আমর ইবনে আস (রাযি.) পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক ছিলেন এবং তাকবিরধ্বনির অপেক্ষায় ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হচ্ছিলেন। তিনি তৃতীয় তাকবিরের অপেক্ষা না করেই আরও দু-চারটা ইউনিট সম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন। দুর্গের পাঁচিলের সঙ্গে কয়েকটা সিঁড়ি লেগে গেল। পাশাপাশি দুটি করে সিঁড়ি বাঁধা হলো। এবার আর নীরবতা বজায় রাখা সম্ভব হলো না। নীরবতার প্রয়োজনও ছিল না। মুজাহিদগণ খুবই দ্রুত সিঁড়ি বইতে শুরু করলেন। ততক্ষণে সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর আদেশে তৃতীয় ধ্বনি উচ্চকিত হলো।

গগনবিদারী এই আল্লাহু আকবার ধ্বনি কবরে শায়িত মৃতদেরও জাগিয়ে তুলে থাকবে। নিচে নগরীতে ঘুমন্ত রোমান বাহিনী তো ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছে নিশ্চয়। থিওডোর তরুণী মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে নিমগ্ন। এই গভীর নিশীথে বাইরে কীসব প্রলয় ঘটে যাচ্ছে সেসবের কোনোই খবর তার কাছে নেই। কক্ষের দরজায় দু-তিনটা করাঘাত পড়লে তার চোখ খুলল। শুয়ে-শুয়েই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এত রাতে দরজাটা ভেঙে ফেলছ? তার শয্যাসঙ্গিনী মেয়েটিও জেগে উঠে বসল।

'আরব বাহিনী পাঁচিলের উপর উঠে এসেছে!'– বাইরে থেকে ভয়ার্ত কণ্ঠের আওয়াজ এল– 'উপরে ঘোরতর লড়াই চলছে!'

লোকটা থিওডোরের রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার। থিওডোর রাগে কাঁপতে-কাঁপতে কী যেন বলতে-বলতে বেরিয়ে এল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, খবরটা তিনি

জাগরিত অবস্থায় শুনছেন। তার বোধহয় মনে হচ্ছিল, তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। তার তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পাঁচিল তো দূরের কথা; কোনো মানুষ পরিখাও অতিক্রম করতে পারবে না।

রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার তাকে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিল। তিনি কিছু শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন। এবার তার প্রাসাদোপম ভবন থেকে বেরিয়ে এলে প্রলয়ের শোর ও হাঁক-চিৎকার শুনতে পেলেন। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আগেই জেগে উঠেছে। তিনি দৌড়ে কক্ষে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। তার উপর বর্ম আর মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে তরবারিটা হাতে তুলে নিলেন। তারপর সারাটা রাত যে-রূপসী মেয়েটিকে নিয়ে আমোদ করলেন, তার পানে পলকমাত্র না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অপরাপর সেনাপতিরাও জেগে উঠেছে। হইচই শুনে বাদবাকি অফিসারদের ঘুম ভেঙে গেছে আগেই। তারা আপন-আপন ইউনিটগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ততক্ষণে পাঁচিলের উপর মুজাহিদদের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভেতর থেকে পাঁচিলে উঠতে কয়েক জায়গায় পাকা সিঁড়ি ছিল। মুজাহিদগণ উপরে সেই সিঁড়িগুলোর ডানে-বাঁয়ে ওঁৎ পেতে বসে গেলেন। যেইমাত্র কোনো রোমান সৈনিক উপরে উঠতে চেষ্টা করছে, অমনি আক্রমণ চালিয়ে তাকে যমের হাতে তুলে দিচ্ছেন। পরিস্থিতি আঁচ করে কয়েকজন সেনা পেছনে কেটে পড়ে চরম ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় সংবাদ ছড়িয়ে দিল, মুসলমানদের গোটা বাহিনী পাঁচিলের উপর উঠে এসেছে এবং নিচে নেমে এসে তারা আমাদের সব কটাকে শেষ করে ফেলবে। এভাবে তারা নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল, যার ফলে শহরময় হুলস্থুল ও বাঁচাও-বাঁচাও পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল।

ভেতর থেকে উপরে উঠার সিঁড়িগুলো রোমান সৈন্যদের লাশে ভরে গেল। ফলে না কেউ নিচ থেকে উপরে উঠতে পারছিল, না উপর থেকে নিচে নামতে পারছিল। নিচে স্থানে-স্থানে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। সেগুলোর আলোতে যখন সৈন্য ও জনতা দেখল, সিঁড়িগুলো থেকে রক্ত বেয়ে নিচে গড়াচ্ছে, তখন তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে গেল। তারা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল।

ইসলামের সৈনিকগণ অসম্ভবকে সম্ভব বানিয়ে ইতিহাস তৈরি করলেন। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা না করে পারেননি যে, এ একটি অলৌকিক ব্যাপার ছিল, যা কিনা মুসলমানরা মিশরের মাটিতে করে দেখিয়েছে।

এ ছিল সেনাপতি যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর দু'আর ফসল যে, তিনি মহান আল্লাহর দরবারে কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন, আমার এই কুরবানিকে তুমি ইসলামের বিজয়ের কারণ বানাও।

এটি সেই মুসলিম নারীদের দু'আরও ক্রিয়া ছিল, যাঁরা পরিখার খানিক দূরে তাঁবুতে নফল নামায পড়ে-পড়ে আল্লাহর সমীপে অনুনয়-বিনয় করছিলেন। তাঁদের মাঝে আওসামা ইবনে আযহারির মা-ও ছিলেন, যিনি শুধু নিজের সন্তানের জন্যই দু'আ করছিলেন না, বরং তাঁর মুখে আকুতি ছিল, হে আল্লাহ! তোমার এই জানবাজদের তুমি বিজয় দান করো। কিন্তু যেইমাত্র নিজের ছেলের কথা মনে পড়ল, অমনি তাঁর দুচোখে অশ্রু নেমে এল। শুধু একবার বললেন, হে আল্লাহ! আমার একটা-ই পুত্র বেঁচে আছে। তাকেও আমি তোমার নামে কুরবানির জন্য পেশ করেছি। এখন আমি শুধুই একা।

এই দু'আগুলোও বিফল যেতে পারে না।

হই-হুল্লোড় শুনে আওসামারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। জনতার কাছ থেকে শুনল, মুসলিম সৈন্যরা প্রাচীরের উপরে উঠে এসেছে এবং কোনো রোমান সৈন্য উপরে যেতে পারছে না। নিচে যখন বাতি জ্বলে উঠেছিল, তখন উপরেও মুজাহিদরা বাতি জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। তার ফলে নিচের লোকেরা আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠল।

আওসামার জানা ছিল না, রোমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থিওডোরের সিদ্ধান্ত অনুসারে এটিই তার জীবনের শেষ রাত। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত পৃথিবীবাসীর সকল সিদ্ধান্তকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল। আওসামার মা আল্লাহর দরবারে আকুতি জানিয়েছিলেন, আওসামা ছাড়া জগতে আমার আর কেউ নেই। তুমি যদি ওকে নিয়ে যাও, তা হলে আমাকে দেখার মতো কেউ আর থাকল না। দয়াময় আল্লাহ তার এই ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন।

আওসামার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন যে-থিওডোর, এখন তিনি নগরীর অভ্যন্তরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো ঘুরে ফিরছেন। নিজের বাহিনীর উপর তার কমান্ড শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কেউ তার কথা শুনছে না। চিৎকার দিয়ে ডেকে-ডেকে তিনি তার সেনাপতি ও অফিসারদের খুঁজে চলছেন। তারই বাহিনীর পলায়নপর সৈনিকরা এবং জনসাধারণ তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। কেউ দেখার গরজ বোধ করল না, ইনিই তার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং গভর্নর মুকাওকিসের জায়গায় এখন মিশরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

আওসামা উপরে গিয়ে তার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছে। কিন্তু উঠবে কীভাবে? সিঁড়িগুলো যে সব লাশে ভরা! কোথাও পা রাখার জায়গাটুকুও নেই! কিন্তু তারপরও তাকে উঠতেই হবে। একটা সিঁড়িতে লাশের উপর পা রেখে-রেখে সে পাঁচিলের উপর উঠে গেল। দু-তিনজন মুজাহিদ তরবারি উঁচু করে তার দিকে ছুটে এল। সে দুহাত হাত উপরে তুলে বলল, আমি তোমাদেরই লোক। আমি আওসামা ইবনে আযহারি।

আওসামা সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে খুঁজতে লাগল। এবার সে এই দুর্গবন্ধ বৃহৎ নগরীর গাইড হতে হচ্ছে। এখানকার খুঁটিনাটি সবই তার জানা। অস্ত্রাগার কোথাও, কোষাগার কোনখানে জানে আওসামা। এরকম প্রয়োজনীয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চিনে রেখেছে মুসলিম বাহিনীর এই বিচক্ষণ তরুণ গোয়েন্দা। এই সবগুলো জায়গা সিপাহসালার আমর ইবনে আসকে দেখিয়ে দিতে হবে তার।

* * *

এখন ব্যবিলন নগরীর দুর্গপ্রাচীরের চার দিকে মুজাহিদদের জয়কার ও তাকবিরধ্বনি উচ্চকিত হচ্ছে এবং এই শোর ক্রমান্বয়ে উচ্চ-থেকে-উচ্চতর হতে চলছে। সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, রোমান বাহিনীর দম খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এ তো হওয়ারই ছিল। সেনাবাহিনী ও নগরবাসীর উপর যে-কারণে বেশি আতঙ্ক বিস্তার করেছিল, তা হলো, সেনাপতিরা পর্যন্ত তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, এখন মুসলমান কেন; জগতের কোনো শক্তি-ই পরিখা অতিক্রম করতে পারবে না। বাহিনী ও জনতা সবাই বিস্ময়ে হতবাক, মুসলমানরা এল কোন পথে, কী করে!

মুজাহিদদের সম্পর্কে রোমান সৈন্যদের বলতে শোনা যাচ্ছিল, ওদের কাছে জিনের শক্তি আছে কিংবা জিনরা ওদের সঙ্গে থাকে অথবা ওরা আদতেই জিন–মানুষ নয়। এমন প্রতিক্রিয়া মুজাহিদদের প্রথম দিককার বিজয়গুলো থেকে তৈরি হয়েছিল। এখন চাক্ষুষ দেখার পর ব্যবিলনের সৈনিকরা ব্যাপারটা শতভাগ বিশ্বাস করে নিল, মুসলমানদের সঙ্গে জিন আছে; কাজেই ওদের সঙ্গে টক্কর লাগাতে যেয়ো না।

কয়েকজন সৈনিক দুর্গের নদীর দিককার ফটকের দিকে চলে গেল। তারা ফটক অতিক্রম করে পালাতে চাচ্ছিল। আশা ছিল, ওপথে দুর্গ থেকে বের হতে পারলে নৌকায় করে রাওজা দুর্গে চলে গিয়ে জীবন বাঁচাবে। কিন্তু ফটক খোলা সম্ভব হলো না। ওখানে যেসব রোমান সৈনিক পাহারায় নিয়েজিত ছিল, তারা বলল, ফটক খুললে এ পথে আরও মুসলমান ভেতরে ঢুকে পড়বে। কাজেই ফটক

খোলা যাবে না। মুসলিম বাহিনী দুর্গের পাঁচিলের উপর উঠে আসার পর যখন অবস্থা বেগতিক হয়ে গেল, তখন রোমান বাহিনীর সেনাপতিরা ঘোষণা করে দিয়েছিল, কেউ ফটক খুলবে না; অন্যথায় তাকে হত্যা করে ফেলব।

ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন, জেনারেল থিওডোরের আদেশে নিচে ঘোষণা করে দেওয়া হলো, তিনি মোকাবেলা করবেন না এবং সন্ধির ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন। ভয়ে কোনো দূত উপরে যাচ্ছিল না। তাবারির ভাষ্যমতে সিপাহসালার আমর ইবনে আসও উপরে উঠে এসেছিলেন। থিওডোরের ঘোষণা শুনে তার জবাবে তিনি ঘোষণা করিয়ে দিলেন, সেনাপতিকে উপরে এসে আমাদের সাথে কথা বলতে বলো।

'এখানকার সমস্ত ধনভাণ্ডার আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব'– থিওডোর নিচে থেকেই ঘোষণা দিলেন– 'এগুলো নিয়ে তোমরা বাইরে সেভাবে নেমে যাও, যেভাবে উপরে উঠে এসেছিলে; তারপর পরিখার সীমানা থেকে বেরিয়ে যাও। এ ছাড়া যদি আরও কিছু দরকার মনে কর আমি তোমাদের তা-ও দেব।'

'আমাদের যা কিছু দরকার নিজেরাই নিয়ে নেব'– আমর ইবনে আস (রাযি.) উপর থেকে ঘোষণা করালেন– 'আমরা পাঁচিলের বাইরে নয়– ভেতরে অবতরণ করব। তোমরা দু-তিনজন সেনাপতি উপরে উঠে আস।'

পাশাপাশি আমর ইবনে আস কয়েকজন মুজাহিদকে আদেশ দিলেন, তোমরা প্রাচীরের চার দিকে ঘোষণা করে দাও, কোনো নাগরিক যেন নগরী ছেড়ে না পালায়। আমরা তাদের জীবন ও সম্পদের পুরোপুরি নিরাপত্তা দেব। আমাদের বাহিনীর কোনো সদস্য কারুর ঘরে প্রবেশ করবে না এবং সকলের সম্মান ও মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করা হবে।

'ঠিক আছে; আমরা উপরে উঠে আসছি'– জেনারেল থিওডোর উচ্চৈঃস্বরে বললেন– কিন্তু তোমরা আমাদের হত্যা বা গ্রেফতার করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?'

'তোমাদের গ্রেফতার কিংবা হত্যা তো আমরা নিচে গিয়েই করতে পারি'– সিপাহসালার আমর ইবনে আস কারও মাধ্যমে না বলিয়ে এবার নিজেই মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে তাকালেন এবং বললেন– ' আমাদের থেকে তোমাদের বাঁচানোর মতো কেউ আছে কি এখন? আমরা মুসলমান। আমরা করি তা, যা আমরা মুখে বলি। আমরা প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করি না। তোমরা নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় উপরে উঠে এস।'

জেনারেল থিওডোর সেই জায়গাটায় দাঁড়ানো ছিলেন, যেখান থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে আমর ইবনে আস তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। থিওডোর সেনাপতি জর্জকে সাথে নিয়ে পাশের সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠতে শুরু লাগলেন। কিন্তু সিঁড়ি মরদেহে পরিপূর্ণ। মৃত কাতলা মাছের মতো লাশগুলো লাগালাগিভাবে পড়ে আছে। পা রাখার মতো একটুও খালি জায়গা কোথাও নেই। থিওডোর তার রক্ষীবাহিনীকে বললেন, এই লাশগুলো টেনে নিচে ফেলে দাও। তারপর সেনাপতিদ্বয় উপরে উঠে গেলেন। সন্ধির শর্ত ঠিক করার জন্য আমর ইবনে আস (রাযি.) রোমান সেনাপতিদের সঙ্গে মুজাহিদদের থেকে দূরে সরে গেলেন।

'এবার বলো কী চাই তোমাদের?'– আমর ইবনে আস জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমাদের বাহিনী লড়াই না করে পালাবার পথ খুঁজছে এ বিষয়টা মাথায় রেখে শর্ত আরোপ করো।'

'তিন দিন সময় চাই'– থিওডোর বললেন– 'এ-সময়ের মধ্যে আমরা দুর্গ খালি করে দেব। তারপর দুর্গটা আপনারা বুঝে নেবেন।'

'ঠিক আছে; মঞ্জুর করলাম'– আমর ইবনে আস বললেন– 'তৃতীয় দিন সূর্যাস্তের পর যেসব সৈন্যকে দুর্গে পাওয়া যাবে, তাদের হত্য করে ফেলব কিংবা যুদ্ধবন্দি বানিয়ে নেব।'

ইতিহাসে এসেছে, আমর ইবনে আস (রাযি.) যখন থিওডোরের এই শর্ত মঞ্জুরির ঘোষণা দিলেন, তখন সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর একটা বাহু ধরে ফেললেন এবং টেনে একধারে নিয়ে গেলেন।

'আল্লাহর কসম সিপাহসালার!'– যুবাইর ইবনুল আওয়াম বললেন – 'আর অল্প কিছু সময় অপেক্ষা করুন। এদের কোনো কথা-ই এখন রাখা যাবে না। আমাকে নিচে যেতে দিন। আগে আমি দুর্গ ও তার রাজমহল দখল করে নিই। তারপর বুঝে-শুনে আমরা তাদের উপর শর্ত আরোপ করব। এই যে তারা তিন দিন সময় চাইল, এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। তাদের সঙ্গে এখনই কোনো সন্ধি করা যাবে না। আপনি তাদের নিচে পাঠিয়ে দিন; আমরা নিজেদের মতো করে যথারীতি দুর্গের দখল বুঝে নেব। হতে পারে, আমরা বলব, তোমাদের অর্ধেক বা তারও অধিকসংখ্যক সৈন্য আমাদের বন্দিত্বে দিয়ে দাও আর বাকিরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাও।'

'না যুবাইর ইবনুল আওয়াম!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমি তোমার এই পরামর্শ ভালো করেই বুঝি। তুমি যা বলেছ, হওয়া উচিত তা-ই। কিন্তু আমি আমীরুল মুমিনীনের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। আমীরুল মুমিনীন নির্দেশ

দিয়েছেন, শত্রু যদি তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, কালবিলম্ব না করে তা গ্রহণ করে নেবে। আরেকটি ব্যাপার হলো, আমরা যদি অধিক রক্তপাত ছাড়া লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হই, তা হলে অযথা কেন আমরা রক্ত ঝরাতে যাব। মুজাহিদদের জীবন ও রক্ত আমাদের বাঁচানো দরকার। দুর্গ তো আমরা পেয়েই গেছি।'

সিপাহসালার আমর ইবনে আস ও সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম পরস্পর শলা-পরামর্শ করে সন্ধির শর্তগুলো ঠিক করে নিলেন, যেগুলো মেনে নিতে রোমানদের বাধ্য করা হবে। তারপর দুজন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'দুর্গ খালি করতে আমরা তোমাদের তিন দিন সময় দিচ্ছি'– আমর ইবনে আস (রাযি.) থিওডোরকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সে পর্যন্ত তোমরা দুজন এখানে আমাদের কাছে পণবন্দি থাকবে। দুর্গে যেসব অস্ত্র আছে, রাজভাণ্ডার ও অন্যান্য মাল-সম্পদ আছে কিছুই তোমরা নিতে পারবে না। এগুলো আমাদের গনিমত। বাহিনী নিরস্ত্র অবস্থায় খালি হাতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবে।'

উভয় সেনাপতি কোনো উচ্চবাচ্চ না করে শর্তগুলো মেনে নিলেন। তাতেই বোঝা গেল, তারা কত অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা জীবন বাঁচানো।

আমর ইবনে আস বললেন, তোমরা এখান থেকেই নিচে আদেশ পাঠিয়ে দাও, পরিখার উপর যেন পুল স্থাপন করে দেওয়া হয়। থিওডোর উপর থেকেই আদেশটা পৌঁছিয়ে দিলেন। অনতিবিলম্বে তার আদেশ পালিত হলো। মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক মুজাহিদ এখনও পরিখার ওপারে রয়ে গেছেন। তাদের আনতেই সিপাহসালার এই ব্যবস্থাটা করলেন। এবার সমস্ত মুজাহিদ অত্যল্প সময়ের মধ্যে পরিখা অতিক্রম করে এলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) উপর থেকেই আদেশ জারি করলেন, তোমরা পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকো।

আমর ইবনে আস রোমান সেনাপতিদ্বয়কে বললেন, তোমাদের দূতদের উপরে ডেকে আনো এবং আদেশ দাও, যেন নগরীতে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে; সৈনিকরা অস্ত্র রেখে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নাও। এ-ও বলা হলো, কোনো সৈনিক বা নাগরিক মূলবান কোনো সম্পদ যেন সাথে করে না নেয়।

পাঁচিলের উপর ঘুরে-ঘুরে তিন-চারজন মুজাহিদ ঘোষণা করে ফিরছিলেন, জনসাধারণ পালাবার চেষ্টা করো না। আমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেব।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস নদীর দিককার ফটকের উপর কয়েকজন মুজাহিদকে নিয়োজিত করে দিলেন। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তোমরা বাইরে গমনকারী সৈনিক ও জনসাধারণের তল্লাশি নিয়ে তবেই তাদের যেতে দাও। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, রোমান বাহিনীর নগরীত্যাগ পরিপূর্ণ হলেই তবে মুজাহিদরা নগরীতে প্রবেশ করবে। তারপর এই দুই সেনাপতিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

* * *

ব্যবিলন নগরীর পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল একটি শহর। মিশরে যখনই যিনি রাজত্ব পেয়েছেন, তিনিই এই নগরীটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর বসতি বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। সেই গুরুত্ব তখনও অবধি বহাল ছিল। নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও ছিল বেশ চমৎকার। মিশরের রাজধানী ছিল এস্কান্দারিয়া। কিন্তু ব্যবিলনের মর্যাদা ছিল তারও চেয়ে বেশি।

দুর্গটা ছিল নগরীর একধারে। তার উপরে ছোট-বড় অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ছিল। সমগ্র নগরীর চার পাশে পাঁচিল তোলা ছিল। পাঁচিলেরও উপর স্থানে-স্থানে অনেকগুলো টাওয়ার নির্মিত ছিল। মুসলিম বাহিনী ও তার সিপাহসালার এখনও দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁরা পুরো নগরী দেখেননি। সিপাহসালার আদেশ জারি করে দিয়েছেন, নগরী খালি করে দাও। কিন্তু নগরী কীভাবে খালি হচ্ছে এবং মানুষজন কী করছে তা তিনি দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। রোমান বাহিনীর নগরীত্যাগ শুরু হয়ে গেছে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালারের জন্য এটিই ছিল বিরাট সুখকর বিষয়। রোমান বাহিনীর বেরিয়ে যাওয়ার পরই কেবল নগরীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হতে পারে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস দেখে নিয়েছেন, রোমান বাহিনীর বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তারা দলে-দলে নগরী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু হাতভাগা এই রোমানরা যাওয়ার সময় নগরীর কিছু মানুষের রক্তও যে ঝরিয়ে গেছে, তা তিনি দেখতে পাননি। এই তথ্য তিনি জানতে পেরেছেন তখন, যখন মুসলিম বাহিনী নিচে অবতরণ করেছিল এবং তারা ভেতরে গিয়ে নগরীর উপর নিজেদের দখল বুঝে নিয়েছিল।

ঘটনাটা ঘটল এই যে, রোমানরা হাজার-হাজার কিবতি খ্রিস্টানকে বন্দি করে রেখেছিল। এ ছিল স্রেফ বাড়াবাড়ির বহিঃপ্রকাশ। মূলত তাদের কোনো অন্যায় ছিল না। কিবতিরা হেরাক্ল-এর খ্রিস্টবাদকে মেনে নিতে রাজী ছিল না এবং তার বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত ছিল। এটিই ছিল তাদের অপরাধ। ফলে বিনাবিচারে তাদের আজীবনের জন্য কয়েদখানায় ফেলে রাখা হয়েছিল। কারাগারের আমলারা ছিল সবাই রোমান। তারা যখন আদেশ পেল, নগরী খালি করতে হবে এবং তাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, তখন একে তারা বিরাট একটা চোট মনে করল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তো তারা কোনো অভিযান চালাতে পারল না; ঝালটা মেটাল এই নিরীহ কিবতি বন্দিদের উপর। অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মমভাবে সব কজন বন্দির হাত কেটে দিল এবং নিজেরা ওখান থেকে চলে গেল।

এ ঘটনাটা ঘটেছে কারাগারে; বাইরের মানুষ যার কোনো খবরই জানতে পারেনি। নগরীর অভ্যন্তরে রোমান সৈন্যরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল মিশরি খ্রিস্টানদের থেকে। তারা ঘরে-ঘরে ঢুকে মহিলাদের ইজ্জত লুট করল। কেউ প্রতিরোধ করতে চাইলে তাকে হত্যা করে ফেলল। অনেক কিবতি খ্রিস্টান তাদের হাতে আহত হলো। রোমানরা লুটতরাজও করল। কিন্তু কোনো বস্তু তারা বাইরে নিতে পারেনি।

এখানে ছোট-খাট আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল। যেকজন মুজাহিদকে নদীর দিককার ফটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মাঝে আওসামা ইবনে আযহারিও ছিল এবং তার তিন-চারজন গোয়েন্দা সহকর্মীও ছিল।

রোমান সৈন্যরা বেরিয়ে যাচ্ছিল আর প্রত্যেকের অনুসন্ধান নেওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ সৈন্যদের একটা ঢেউ ফটকে এসে আছড়ে পড়ল, যাকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে গেল। মুজাহিদরা তাদের ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে একজন-একজন করে যেতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেখানে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। এরই মধ্যে আওসামার কানে আওয়াজ এল, যেন একটা নারীকণ্ঠ তাকে ডাক দিয়েছে। সে উৎকর্ণ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। মেয়েলি কণ্ঠটা তাকে আবারও ডাকল।

এবার আওসামা শব্দটা যেদিক থেকে এল সেদিকে তাকাল। দেখল, যে-মেয়েটার সঙ্গে আওসামার সম্পর্ক ও হৃদ্যতা ছিল এবং গত রাতটা সে জেনারেল থিওডোরের কাছে কাটিয়েছে, দুজন রোমান সৈনিক তাকে ধরে টেনে একদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বিশৃঙ্খলার কারণে ব্যাপারটা কারও চোখে ধরা পড়ছিল না।

আওসামা তার এক গোয়েন্দা সহকর্মীকে সাথে নিয়ে ভিড় ঠেলে মেয়েটার কাছে চলে গেল। দেখে সৈনিকদ্বয় তাকে ছেড়ে দিয়ে সটকে যেতে লাগল। কিন্তু আওসামা ও তার সাথী দুজনে মিলে তাদের ধরে ফেলল। মেয়েটা হাউমাউ করে কাঁদছিল। আওসামা তাকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? তুমি এভাবে কাঁদছ কেন? আমাকেইবা ডাকলে কেন? এরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল?

'এরা আমার মাকে ও পিতাকে হত্যা করে ফেলেছে'– মেয়েটি কান্নাজড়িত গলায় বলল– 'তারপর আমাদের ঘরে যত স্বর্ণালঙ্কার ছিল সব তুলে এনেছে এবং আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।'

রোমান সৈনিকদ্বয়ের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না যে, লড়তে যাবে। ইসলামি বাহিনীর সিপাহসালারের আদেশে সমস্ত সৈন্যকে নিরস্ত্র করে তোলা হয়েছে। আওসামা ও তার সাথী তাদের ধাক্কা দিয়ে ভিড়ের মধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। কাছেই পুরোনো ছোট একটি ঘর ছিল, যার প্রবেশদ্বার খোলা ছিল। আওসামারা ধৃত সৈন্যদের সেই ঘরটাতে নিয়ে গেল। ঘরে দুটা কক্ষ ছিল এবং দুটাই শূন্য ছিল।

একটা কক্ষে নিয়ে সৈনিকদ্বয়কে তল্লাশি নেওয়া হলো। তাদের পোশাকের তল থেকে একটা থলে বেরিয়ে এল, যার মধ্যে অনেকগুলো অলংকার। এগুলোই এরা মেয়েটার ঘর থেকে তুলে এনেছে। সৈনিকদ্বয় কুটিল হাসি হেসে বলল, মেয়েটা এতই রূপসী যে, আমরা ভেবেছিলাম, একে সাথে করে নিয়ে যাব। তোমরা অলংকারগুলো রেখে দাও আর মেয়েটাকে আমাদের সাথে যেতে দাও।

'এর পিতামাতাকে তোমরা হত্যা করেছ'– আওসামা বলল– 'এই রক্তের দায়ও কি তোমাদের ক্ষমা করে দেব? অল্প বয়সের একটা মেয়েকে তোমরা এতিম ও অসহায় বানিয়ে দিয়েছ!'

'এখানে তো অনেকগুলো মানুষ খুন হয়ে গেছে'– এক সৈনিক বলল– 'সেইসঙ্গে এর পিতামাতাও গেছে তাতে এমন কী প্রলয়টা ঘটে গেল?'

আওসামা তার সাথীর পানে তাকাল। এত কথা এখানে বলা যাবে না। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে ফেলতে হবে। দুজন চোখাচুখি করে সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিল। দুজনই একসঙ্গে খঞ্জর বের করে হাতে নিল। পরমুহূর্তেই দুটা খঞ্জর দুই রোমান সৈনিকে পেটে ঢুকে গেল। দুজনই ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। মুজাহিদদ্বয় মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

'আমি এখন কোথায় যাব?'– মেয়েটা কান্নাবিজড়িত হাতশ কণ্ঠে আওসামার পানে তাকিয়ে জানতে চাইল– 'ঘরে তো আমার কেউই রইল না!'

'এটাও কি একটা জিজ্ঞাসা করার মতো কথা হলো?'– আওসামা অলংকারের থলেটা মেয়েটার হাতে দিতে-দিতে বলল– 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না? আমার সঙ্গে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে মনে নেই?'

'দিয়েছিলাম বটে'– মেয়েটি বলল– 'কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, যার জন্য আমি খুবই লজ্জিত।'

'বিশ্বাসঘাতকতা! কীভাবে?' আওসামা অপার বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল।

গত রাতে থিওডোরের শয়নকক্ষে যা কিছু ঘটেছিল, মেয়েটি আওসামাকে তার বিবরণ দিল। কিছুই গোপন রাখল না। শেষে বলল, সেনাপতি আমার মাথাটা ওলটপালট করে দিয়েছিল আর আমি কল্পনায় মিশরের রানি হয়ে গিয়েছিলাম।

'এবার আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে, তোমাদের খোদা-ই সত্য'– মেয়েটি বলল– 'তোমাদের ধর্মই সঠিক। তা-ই যদি না হতো, তা হলে এই মুহূর্তে তুমি জীবিত থাকতে না। আমি তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার এই অপরাধ যদি ক্ষমা করতে পার, তা হলে তুমি আমাকে মুসলমান বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।'

'আমি তোমার পিতামাতাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না'– আওসামা বলল– 'এই অলংকারগুলো তোমার; এগুলো আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। যদি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভালোভাবে বুঝে থাক, তা হলে আমার সঙ্গে এসে পড়ো। গিয়ে যেকোনো মুসলমানের পাশে বসবে, অল্প সময় পরই বলতে বাধ্য হবে, ইনি আমার সেই পিতা, যাকে রোমানরা হত্যা করেছিল। মুসলমানদের মাঝে লুটেরা থাকে না। তাদের কাছে থাকে মমতা আর মানবপ্রেম। আমি তোমাকে আমাদের সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাব। তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে, আমি তোমাকে জোর করে আনিনি; তুমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে চাচ্ছ।'

আওসামা আল্লাহর শোকর আদায় করলেন, যে-সেনাপতি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছিল, এই মুহূর্তে সে মুসলমানদের হতে পণবন্দি আর নিজে বিজয়ীর বেশে মাথা উঁচু করে তারই দুর্গে ঘোরাফেরা করছে এবং নিজের সিপাহসালারের আদেশ পালন করাচ্ছে।

আওসামা মেয়েটাকে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁকে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনাল। সিপাহসালার মেয়েটিকে দু-চারটি কথা জিজ্ঞেস করে তাকে নারীক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। তার অলংকারগুলো তারই কাছে থাকতে দিলেন।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস এখনও জানতে পারেননি, রোমান বাহিনী নগরীর একাংশে ব্যাপক রক্তপাত ঘটিয়ে গেছে। এই মেয়েটারও ব্যাপারটা জানা ছিল না। নাহয় এর কাছে অবশ্যই তথ্য পাওয়া যেত। নিজের চোখের সামনে আপন পিতামাতার জীবনহানির ঘটনা প্রত্যক্ষ করায় আশপাশের কোনোই খবর তার কাছে ছিল না।

***

রোমান বাহিনী দুদিনেই দুর্গ খালি করে চলে গেল। সিপাহসালার আমর ইবনে আস তাঁর সালারদের নিয়ে এ-ই প্রথমবার নিচে নামলেন। সেনাপতি থিওডোর ও জর্জ তাঁর সঙ্গে। তিনি সবার আগে থিওডোরের প্রাসাদোপম বাসভবনে গেলেন। সমস্ত ধনভাণ্ডার বের করালেন। শেষে তাদের বললেন, এবার আপন-আপন স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে নগরী থেকে বেরিয়ে যাও।

নগরীর ফটক খুলে দেওয়া হলো। মুজাহিদগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে শ্লোগান দিতে-দিতে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তখন আমর ইবনে আস (রাযি.) বাইরে দণ্ডায়মান ছিলেন, যেন নিজেরই বাহিনীটিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। একদিক থেকে দু-তিন শো নাগরিকের একটা দল মিছিলের আকারে সিপাহসালারের দিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। দলে বেশ কজন নারীও আছে। মনে হলো, যেন লোকগুলো বিলাপ করতে-করতে আসছে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে, কয়েকজনের পোশাকে রক্তের বড়-বড় দাগ। আমর ইবনে আস এক সালারকে বললেন, গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করো, ওরা কেন এদিকে আসছে।

সালার ছুটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন। তারা জানাল, রোমান বাহিনী আমাদের শেষ করে দিয়ে গেছে। আমরা অভিযোগ জানাতে মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালারের কাছে এসেছি।

সালার ফিরে এসে ব্যাপারটা আমর ইবনে আসকে অবহিত করলেন। তিনি ওদের নিজের কাছে ডেকে আনার পরিবর্তে নিজেই তাদের কাছে দৌড়ে গেলেন। তারা সিপাহসালারকে রোমান বাহিনীর নিপীড়নের বিবরণ শোনাল।

'আমরা এ-বিষয়টিই আপনাকে অবহিত করতে এসেছি'– এক প্রবীণ ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে বলল– 'কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় হলো, যা ঘটেছে, তার তো কোনো প্রতিকার নেই। রোমানরা আমাদের বেশ কিছু নারী-পুরুষকে হত্যা করে গেছে আর এখন আপনারা আমাদের ঘর-বাড়ি লুট করতে এসেছেন। বলুন, আমাদের অপরাধ কী, যার কিছু শাস্তি আমরা পেয়ে গেছি আর বাকিটা আপনারা দিতে এসেছেন?

'কেন? তোমরা কি আমাদের ঘোষণা শোননি?– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমরা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলাম, কোনো নাগরিক যেন পালাতে চেষ্টা না করে, আমরা নগরবাসীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেব, আমরা লুট করতে আসিনি ইত্যাদি। রোমানরা যখন তোমাদের বাড়ি-ঘরে লুট-তরাজ করছিল, তোমাদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছিল, তখন যদি ব্যাপারটা আমাদের জানাতে, তা হলে ওদের একজনকেও আমরা জীবন নিয়ে যেতে দিতাম না। যাহোক, এবার বলো, তোমাদের উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে।'

জনতা রোমান বাহিনীর নিপীড়নের বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করল। একজন বলল, ওরা আমার মেয়ের শ্লীলতা নষ্ট করেছে। একজন বলল, ওরা আমার পরিবারের দুজন লোককে হত্যা করেছে। কারণ, ওরা ঘরের মেয়েদের প্রতি হাত বাড়ালে তারা প্রতিবাদ করেছিল। এই দলের মধ্যে– যার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল– কয়েকজন জখমিও ছিল। কয়েকজনের জখম খুব গভীর ছিল। তারা আরও জানাল, আমরা সবাই মিশরি ও কিবতি খ্রিস্টান।

তাদেরই মধ্য থেকে একজন বলল, আমি জানতে পেরেছি, কারাগারে যেসব কিবতি খ্রিস্টান আটক ছিল, রোমানরা তাদের সবার হাত কেটে দিয়ে গেছে। তথ্যটা শুনে আমর ইবনে আস (রাযি.) হঠাৎ চমকে উঠলেন। তখনই তিনি কয়েকজন মুজাহিদকে কারাগারের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে একজন কর্মকর্তাকেও পাঠালেন, যিনি কারাগারের দায়িত্ব বুঝে নেবেন।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর এক সালারকে আদেশ দিলেন, নগরীতে যত আহত লোক আছে, অতি সত্বর সবার চিকিৎসা ও পানাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করো। একজন আহত ব্যক্তিও যেন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না থাকে, রোমানদের হাতে নিগ্রহের শিকার একজন নাগরিককেও যেন এক বেলা উপোস কাটাতে না হয়। এই আদেশ জারি করেই তিনি কারাগারের দিকে ছুটে গেলেন।

ওখানকার মানুষগুলোর দুর্গতি দেখে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আমর ইবনে আস কেঁপে উঠলেন। সব কজন বন্দির হাত কেটে ফেলা হয়েছে! রক্ত ঝরছে। অধিক রক্তক্ষরণের ফলে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। বাকিরা অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে এবং একজন-একজন করে মরে যাচ্ছে। ঘটনাটা ঘটেছে এক দিন আগে। যাদের দেহে তখনও প্রাণ ছিল, সিপাহসালারের আদেশে তাদের তুলে আনা হলো এবং তৎক্ষণাৎ ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। তাদের

মধুমেশানো দুধ পান করানো হলো। এভাবে তাদের কয়েকজন লোককে বাঁচিয়ে তোলা হলো।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) কারাগার থেকে ফিরে আসতে সালারদের বললেন, এই নিরস্ত্র নাগকিরদের উপর রোমান বাহিনী যে-নিপীড়নটা চালাল, তা খুবই মর্মান্তিক ও শোকাবহ। এই বিপদের মুহূর্তে তাদের সঙ্গে আমাদের সমবেদনা ও সহমর্মিতামূলক আচরণ ও আন্তরিক ভালবাসা দেখাতে হবে, যা কিনা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। তা হলে তাদের অন্তরে রোমানদের ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং এই ক্ষোভ তাদের মনে জাগরূক থাকবে।

'আমাদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারকও আছে'– আমর ইবনে আস বললেন– 'তাদের বলে দাও, তারা ওদের মনোরঞ্জন করুক এবং ওদের যেমন সহযোগিতা দরকার দিক। তারপর বলুক, এবার তোমরা ইসলামের বরকত ও রহমত দেখো।'

সিপাহসালার ওখান থেকে আবারও মিশরের গভর্নর হাউজে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে চার-পাঁচজন সালার এবং জনাকয়েক মুজাহিদ। এবার তিনি পুরোটা ভবন ঘুরে-ফিরে দেখলেন। এমন রাজকীয় বাসভবন, এমন মহামূল্যবান সরঞ্জাম, ফার্নিচার, গালিচা ইত্যাদি দেখে আরবের এই মুজাহিদগণ বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন।

'মনোযোগ দিয়ে দেখো আর শিক্ষা গ্রহণ করো'– সালার যুবাইর ইবনুল আওয়াম মুজাহিদদের উদ্দেশ করে বললেন– 'যদি এই রাজসিক জীবনধারা আমাদেরও বাটে আসত, তা হলে আমরা ব্যবিলন দুর্গের পরিখা অতিক্রম করার চিন্তাও করতে পারতাম না। এই শাহানা জীবনই রোমানদের পরাজিত করেছে। দেখে রাখো, এত বিপুল ধনরাশি, এমন রাজকীয়তা এখানে পড়ে রইল আর যারা এখানে বাস করত, সেই লোকগুলো স্রেফ পরিধানের পোশাকে এখান থেকে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেল! যারা দুনিয়াতে জান্নাত তৈরি করে, আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের জাহান্নাম দেখিয়ে দেন।'

'আরও শুনে রাখো'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন – 'তারা নিরপরাধ যে-কয়েদিগুলোর হাত কেটে নিয়েছে এবং আরও যাদের উপর নিপীড়ন চালিয়ে গেছে, তাদের অভিশাপ এখন ওদের জাহান্নামের আযাব না দেখিয়ে ছাড়বে না। জয় ঈমানওয়ালাদেরই ভাগে আসে আর তাদের, যারা মানুষকে ভালবাসে।'

রোমান বাহিনী ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল ব্যবিলন নগরী খালি করে দিল এবং মুসলমানরা তার উপর নিজেদের দখল পরিপূর্ণ করে নিল।

আমর ইবনে আস (রাযি.) ওখানেই বসে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর নামে বার্তা লেখালেন। সেই বার্তায় তিনি আমীরুল মুমিনীনকে এই বিশাল জয়ের সুসংবাদ জানালেন এবং লেখালেন, এই জয়ের কৃতিত্ব পুরোটা-ই আওয়ামের পুত্র যুবাইর-এর। তারপর তিনি অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করলেন। অবশেষে লেখালেন, এবার আমি মিশরের রাজধানী এস্কান্দারিয়া দিকে অগ্রযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করছি। এই অনুমতি আমাকে শীঘ্র পেতে হবে, যাতে রোমান বাহিনী দম নেওয়ার সময় না পায়। তার আগেই আমি ওখানে গিয়ে ওদের ঝাঁপটে ধরতে চাই। বার্তাটা লেখিয়ে তিনি দূতের হাতে দিয়ে বললেন, যত দ্রুত সম্ভব মদিনা পৌছে যাও এবং এর উত্তর নিয়ে জলদি ফিরে এসো।

ব্যবিলনের বিজয় সাধারণ কোনো জয় ছিল না। এই এত বিশাল নগরী আর এমন মজবুত দুর্গ জয় করে নেওয়ার মাধ্যমে মিশরে মুজাহিদদের জয়ের একটি পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁরা আধা মিশর জয় করে নিলেন, যার মধ্যে ব্যবিলন একটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। মহান আল্লাহ মুসলমানদের তাঁর শত্রুগোষ্ঠীর সেই সবুজ-শ্যামল অঞ্চল ও বিপুল ধনরাশির ভাণ্ডারের কাছে পৌছিয়ে দিলেন, যার কল্পনাও তারা কখনও করেনি। বস্তুতই ব্যবিলন মুসলমানদের জন্য আল্লাহপাকের বিশাল একটি পুরস্কার ছিল।

মিশরের ইতিহাস পড়ুন; জানতে পারবেন, এই অঞ্চলটি ফেরাউনদের প্রিয় ভূমি ছিল। দুর্গের পাঁচিলগুলোর উপর দাঁড়ালে আবুলহাওল ও ফেরাউনদের পিরামিডগুলো চোখে পড়ে। নীলনদের আকর্ষণ; সে তো এক আলাদা ব্যাপার। ব্যবিলন নগরীটা ফেরাউনরাই আবাদ করেছিল। হযরত মূসা (আ.) এখানেই কোনো এক স্থানে ফেরাউনের জাদু সামেরিকে লাঠির আঘাতে ভেঙেছিলেন। এখানে স্থানে-স্থানে ফেরাউন আমলের নিদর্শন চোখে পড়ত এবং সেসব সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

ব্যবিলন-জয়ের মাধ্যমে রাওজা দুর্গটাও মুসলমানদের আধিপত্যে এসে পড়ল। আমর ইবনে আস (রাযি.) আদেশ জারি করলেন, ব্যবিলনের নদীর দিককার ফটক থেকে দ্বীপ পর্যন্ত নৌকর পুল তৈরি করে দাও। সঙ্গে-সঙ্গে আদেশের তামিল শুরু হয়ে গেল। নগরীর অধিবাসীরা দেখল, মুসলমানরা তাদের বাড়ি-ঘরের পানে চোখ তুলেও তাকালেন না এবং তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় যখন নৌকার পুল তৈরি হতে শুরু হলো, তখন নগরবাসী ছুটে গিয়ে একাজে মুজাহিদদের সাহায্য করতে লাগল।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সমস্যাটা ছিল, তার বাহিনীর লোকসংখ্যা অপ্রতুল। এই অল্প কজন লোক দ্বারা-ই তাকে রাষ্ট্রও চালাতে হবে আবার নগরীর শৃঙ্খলাও পুনর্বহাল করতে হবে। নৌকার পুল তৈরি করা ছাড়া আরও কটা কাজ তাৎক্ষণিকভাবে আঞ্জাম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। মুজাহিদদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, যদি তাদের এসব কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে সামরিক কাজগুলো করার আর লোক অবশিষ্ট থাকে না। তারই প্রতিকার হিসেবে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হলো যে, রোমানদের শাসনামলে যেসব কিবতি খ্রিস্টান প্রশাসনে চাকরি করত, তাদের অপসারণ না করে স্ব-স্ব পদে বহাল রাখা হলো। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) চিন্তা করলেন, যদি কিবতিদের আস্থায় এনে গুরুত্ব প্রদান করি, তা হলে ওরা আর বিদ্রোহের ভাবনা মাথায় আনবে না।

পুলিশ বিভাগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কিবতি খ্রিস্টানদের। আমর ইবনে আস এই বিভাগটিকে তাদেরই হাতে রেখে দিলেন এবং লোকসংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলেন। এই বিভাগে কিছু মুজাহিদকেও নিয়োগ দিলেন, যাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

কিছুদিন পর সিপাহসালার রিরোর্ট পেলেন, পুলিশ বিভাগে যেসব কিবতি আছে, তারা মুসলমানদের ভালো চোখে দেখে না। বরং কতকতে বলতে শোনা গেছে, আমরা আরবের এই পশ্চাদপদ মুসলমানদের অধীন হয়ে থাকতে পারি না।

ব্যবিলনে কিবতিদের বিদ্রোহের আলামত চোখে পড়তে শুরু করল।

৩য় খণ্ড সমাপ্ত

design : shakir ahsanullah

ISBN : 978-984-91933-5-7

978 984 91933 5 7

অনিঃশেষ আলো-৩

আলতামাশ

Anisshesh Alo-3

Altamash

www.boighorbd.com